৪ অক্টোবর ১৯৮৯ □ আনন্দবাজার প্রকাশন □ সাত টাকা

আনন্দমেলা

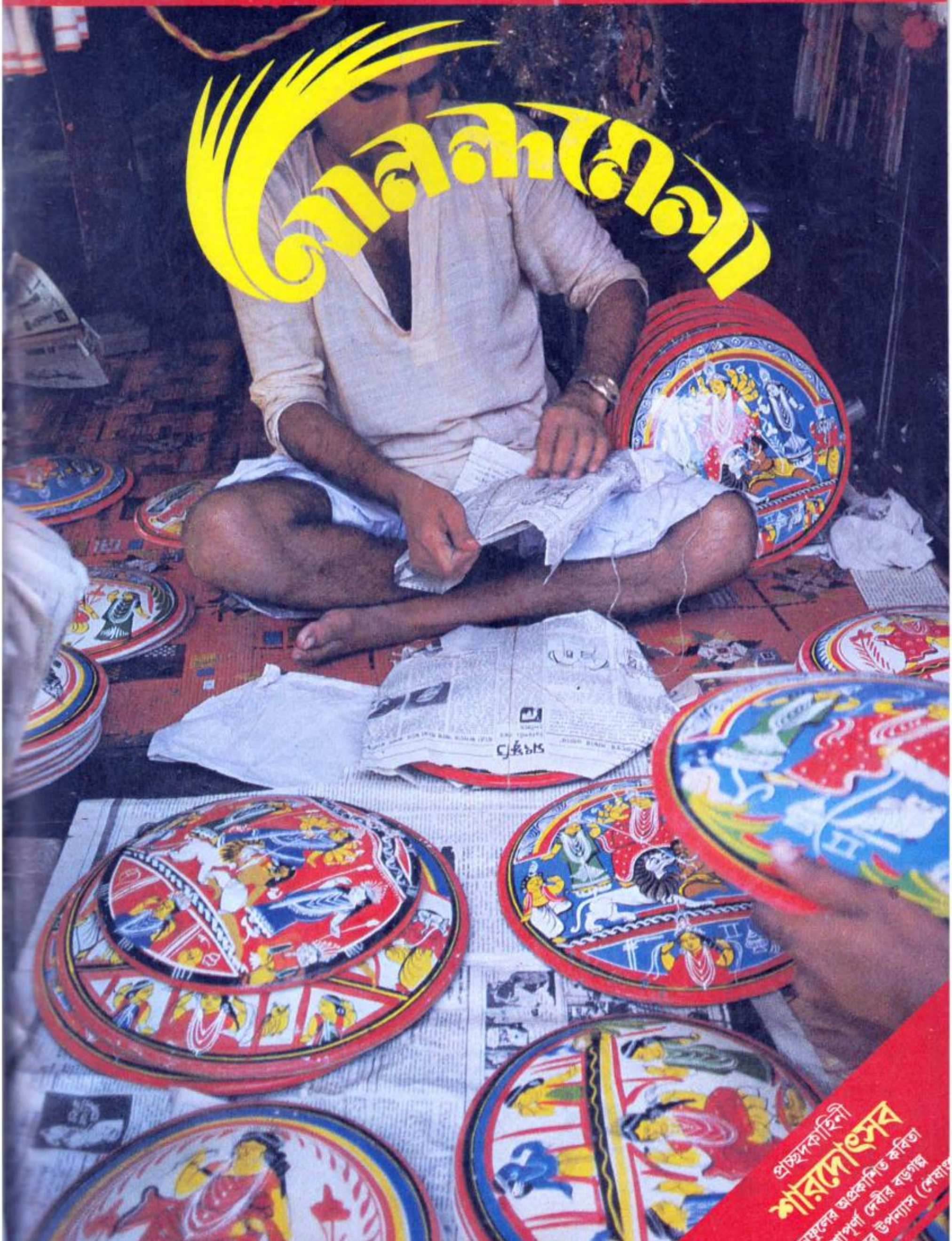

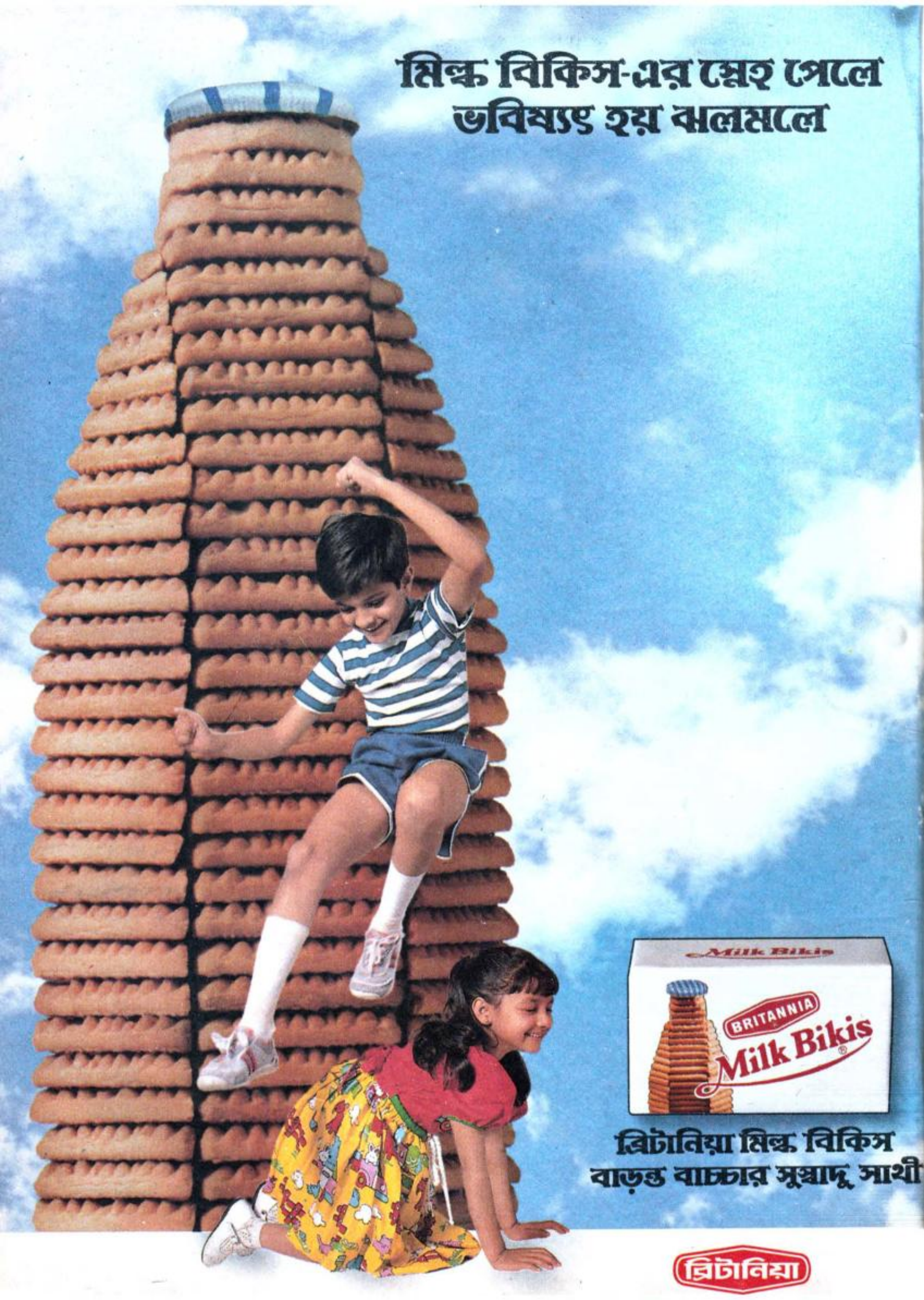
মিল্ক বিকিস-এর স্নেহ পেলে
ভবিষ্যৎ হয় ঝলমলে
Milk Bikis
BRITANNIA
Milk Bikis
ব্রিটানিয়া মিল্ক বিকিস
বাড়ন্ত বাচ্চার সুস্বাদু সাথী
ব্রিটানিয়া

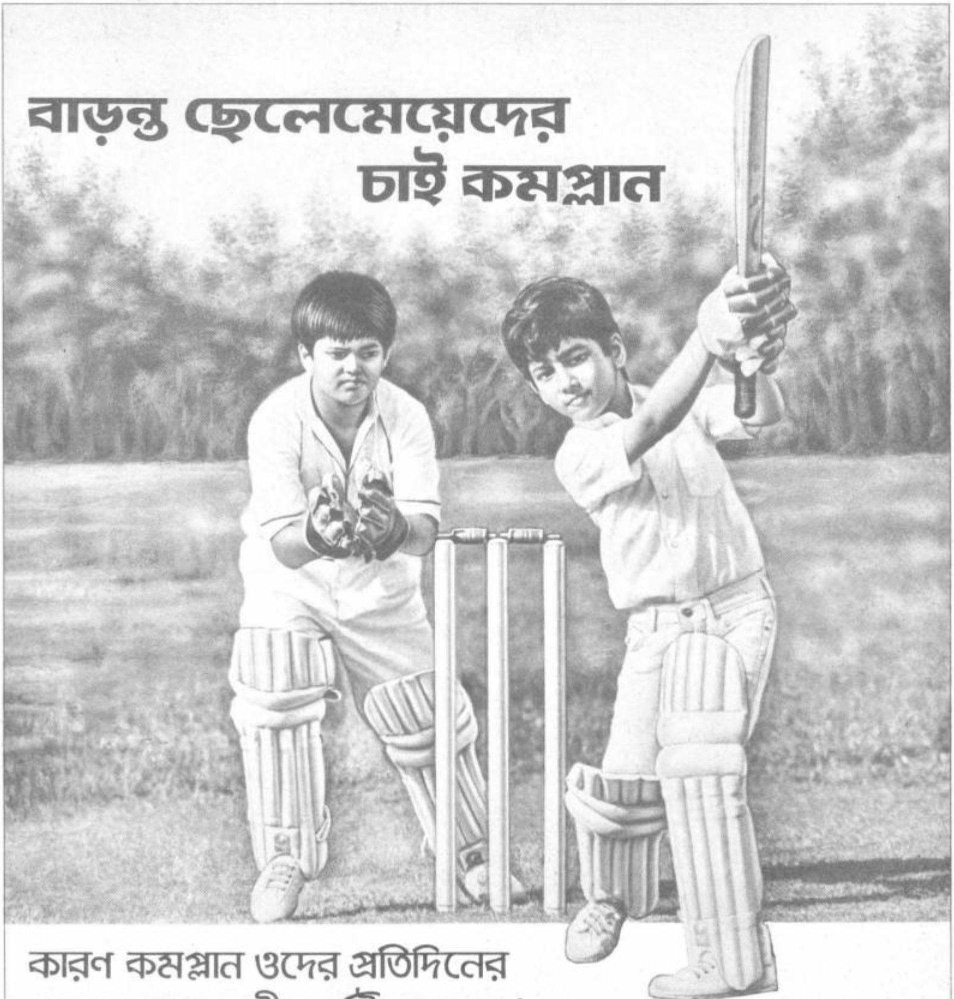

কারণ কমপ্লান ওদের প্রতিদিনের একান্ত প্রয়োজনীয় পুষ্টি যোগায়।

সাধারণত ১৫/১৬ বছর পর্যন্তই ছেলেমেয়েদের বেড়ে ওঠার বয়েস।
প্রোটিন হোল এমন এক পুষ্টিকর উপাদান, যা বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের দৈহিক গঠনে সরাসরি কাজ দেয়। তাই এখন থেকে আপনার ছেলেমেয়েদের জন্যেও চাই কমপ্লান।
কমপ্লান-এ আছে সেরা প্রোটিন অর্থাৎ দুধের প্রোটিন (২০%)।
এছাড়া আছে আরো ২২ রকমের একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্যগুণ।
কমপ্লান বিভিন্ন মুখরোচক স্বাদগন্ধে পাওয়া যায়।

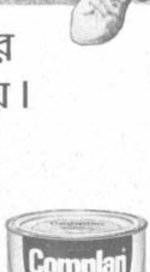

23
সুপরিকল্পিত মাত্রায়,
২৩টি একান্ত
প্রয়োজনীয় খাদ্যগুণ
দুধ মেশানোর প্রয়োজন নেই।

কমপ্লান®

সুপরিকল্পিত সম্পূর্ণ আহার

GX/38/244 BEN

আনন্দমেলা

বড়গল্প

ভূত নয় তো কী আশাপূর্ণা দেবী ৩২

সম্পূর্ণ উপন্যাস (শেষাংশ)

পান্না-পাথরের বুদ্ধমূর্তি অদ্রীশ বর্ধন ৭০

প্রচ্ছদকাহিনী

শারদোৎসব ১২

প্রতিমার বদলে সেবার ঘটপুজো সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ১৩

আমাদের সেই দুর্গাপুজো শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ১৬

পটের পুজো অশোককুমার কুণ্ডু ১৮

ধারাবাহিক উপন্যাস

উদাসী রাজকুমার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৮

সোনার গণপতি হিরের চোখ ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় ৬৫

পুজোর কবিতা

আগমনী গানে গানে বনফুল ৭

পুজোর ছুটি অশোককুমার মিত্র ২০

থাকব পুজোয় গ্রামে হিমাংশু জানা ২০

বাদ্যি বাজে বুকের কাছে শ্যামলকান্তি দাশ ২১

এই কটা দিন রতনতনু ঘাটী ২১

বিজ্ঞানবিচিত্রা

বিজ্ঞান : যেখানে যা হচ্ছে ১১

অপু-দুর্গারা ···· গৌতম চক্রবর্তী ২৭

উইলহেম কনরাড রন্টজেন চঞ্চল পাল ৫৯

জীবাণুর সাহায্যে ···· শৌর্যেন্দ্রনাথ সরকার ৮৫

কমিক্স

টারজান ৩১, গাবলু ৬৯, রোভার্সের রয় ৮৩, টিনটিন ৮৭, পক্ষরাজ ৮৯

এই দেশ এই বিশ্ব

প্রাগৈতিহাসিক মানুষের গুহাচিত্র কমলেন্দু সরকার ২৩

কেরিয়ার গাইড

মেডিকেল পড়তে হলে অমর দাশ ৬১

খেলাধুলো

নেহরু কাপ মিনি বিশ্বকাপ ···· তানাজি সেনগুপ্ত ৫৩

মাঝমাঠের লড়াই গৌতম সরকার ৫৪

আমি কৃশানু দে ৫৫

বিদায় ক্রিস কিশোর রায় ৫৬

খেলার খবর ৫৭

স্টেফি গ্রাফ ও মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা ৪৯

স্টেফান এডবার্গ ৫২

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিচাপাটি ৬, ডাকটিকিট ১০, আকাশে ওড়ার কথা ৪৭, কিওকুশিন ক্যারাটের ক্লাস ৫৮, শব্দসন্ধান ৮১, কে প্রথম ৮৬, চেনা না-চেনা ৯১, কুইজ ৯২, নিজের হাতে বানাও ৯৫, নানারকম ৯৬, বইয়ের খবর ৯৮

প্রচ্ছদ

সোমনাথ ঘোষ

সহকারী সম্পাদক □ দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদকীয় বিভাগ □ সিদ্ধেশ্বরনাথ ভার্মা, সাধনা মুখোপাধ্যায়, শ্যামলকান্তি দাশ, রতনতনু ঘাটী, বাদল ঘোষ, বিমলকুমার পাল

শিল্প নির্দেশক □ অমিয় ভট্টাচার্য

সহযোগী □ প্রবীর সেন, দেবাশিস সেনগুপ্ত

২৩

মানুষ ছবি আঁকতে শিখল কবে? তখনও ঘরবাড়ি বানাতে শেখেনি ওরা। বাস করত পাহাড়ের গুহায়। আর তখনই ছবি আঁকত সেইসব গুহার গায়ে। আদিম মানুষের প্রথম

১২

শরৎকাল এলেই আমাদের প্রতিদিনের চেনা পৃথিবী নতুন সাজে সাজতে থাকে। উৎসবের সাজসজ্জার মধ্যে লাগে তারই ছোঁয়া। এই উৎসবে সবারই নিমন্ত্রণ। সবারই অংশগ্রহণের অধিকার। তাই আমরা সবাই, যে যতটুকু পারি, এই আনন্দের হাটে নিজেদের মিলিয়ে দিই। নিজেদের নতুনভাবে আবিষ্কার করি। আর, বাঙালি-জীবনে সবচেয়ে বড় উৎসবের রঙের ছোঁয়া লাগে দুর্গাপুজোয়। এবারের প্রচ্ছদকাহিনীতে প্রখ্যাত লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন এই পুজোর স্মৃতিকথা। বীরভূমের হাট-শেরাণ্ডি গ্রামের পটে আঁকা দুর্গা নিয়ে আছে আলাদা একটি নিবন্ধ।

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে মুদ্রিত ও

গুহাচিত্র আবিষ্কৃত হয়েছিল স্পেনের আলতামিরায় । আর আমাদের ভারতবর্ষেও পাওয়া গিয়েছে এরকম কিছু গুহাচিত্র । কালজয়ী এই শিল্পকলার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল আধুনিক প্রজন্মের ।

৩২

রাস্তার ছেলেটা ছদ্মবেশী রাজপুত্তুর-টুত্তুর কি না তা জানার চেষ্টা চলছে । খাওয়ার ধরন আর অভ্যাস দেখলে তো অনেকটাই বোঝা যায়, এ কোন ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছে । কিন্তু এরই মধ্যে আবার ভূতের কথা কেন ? সত্যিই ভূত কি না জানা যাবে আশাপূর্ণা দেবীর গল্পে ।

২৭

আগামী দশকে তৈরি হওয়ার কথা মহাকাশস্টেশন 'ফ্রিডম' । তবে কি আগামী দিনের অপু-দুর্গারা যাবে মহাকাশের উপনিবেশে ?

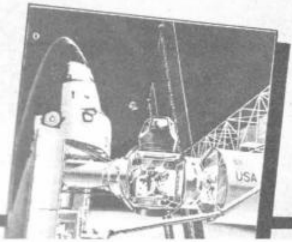

৫৩

রিলায়েন্স বিশ্বকাপের পর আবার ভারতে বসছে এক দিনের ক্রিকেটের জমজমাট আসর । ওয়েস্ট ইন্ডিজ, পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, ইংল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কার অংশ নেওয়ার কথা এই বিশ্বকাপে । কার শক্তিসামর্থ্য কেমন ? জেতার সম্ভাবনা কোন দলের বেশি ? না কি কোনও অঘটন ঘটবে ?

আগামী সংখ্যায়

বিমল বসুর প্রচ্ছদকাহিনী

নীল গ্রহ নেপচুন

শৈলেন ঘোষের সম্পূর্ণ নাটক

আলোর চমক

তুলসী সেনগুপ্ত ও অনিতা অগ্নিহোত্রীর গল্প

জগমোহন মুখোপাধ্যায়ের নিবন্ধ

আমাদের গ্রন্থাগার

কল্যাণ চক্রবর্তীর এই দেশ এই বিশ্ব

ভারতের বন্যপ্রাণী

Disproportionate Returns for
SMALL INVESTMENTS
&
What more &
Old age Pension too.

INVEST in your CHILD'S STUDIES.

In doing so:
1) You have done your duty to your child.
2) You have assured him good future too.
3) You have insured your future too.

What steps You have to take?
ADMISSION TO TURNING POINT SCHOOL

Can be a TURNING POINT in the life of your child.

* **An Exclusively English Medium Boarding School**

Admission open from Class I to VII.
One class will be added each year till Class X.
(CBSE syllabus)
It is a SCHOOL Sponsored & run by

LINKMAN INSTITUTE

52/B Rash Behari Ave Jn.
(Lane opp. Gurudwara)
Calcutta 700 026
Mon-Sat: 6 am—8 pm. Sun: 12 noon—6 pm

Enquiries: Phone: 46-5137.

* The School is within greater Calcutta.

অপরূপা কলকাতা

নিয়মিত 'আনন্দমেলা' পড়ি। ২৩ অগস্ট সংখ্যার প্রচ্ছদকাহিনী 'কলকাতা ৩০০' আমাদের সঙ্গে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দিল কলকাতার। কলকাতা সম্পর্কে একগুচ্ছ লেখা পড়লাম বিখ্যাত সব লেখকদের! 'কলকাতা ক্যালেন্ডার'টি সংগ্রহকারীদের সংগ্রহ করে রাখার মতো। জোব চার্নক ৩০০ বছর আগে ২৪ অগস্ট সুতানুটির মাটিতে পা দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আজকের নগর কলকাতার জন্ম সূচিত হয়েছিল। আজ কলকাতা মানে সুতানুটি, গোবিন্দপুর, কলকাতা নয়— কলকাতা আজ মহানগরী। এই তিনশো বছরে কলকাতার নানারকম উত্থান-পতন, বয়ে গেছে কত ঝড়-ঝাপটা, তবু সমস্ত কিছু ছাপিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে অপরূপা কলকাতা। এই কলকাতার জন্য গর্ব অনুভব করি।

মনিরুজামান
সরদারবাড়ি, উত্তর ২৪ পরগনা

দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে সেদিনের রাজভবন

কলকাতার তিনশো বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত আনন্দমেলার প্রচ্ছদকাহিনী 'কলকাতা ৩০০' পড়লাম। লেখাগুলি খুবই সময়োপযোগী ও তথ্যপূর্ণ। অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কলকাতায় জ্যোতির্বিজ্ঞান কেন্দ্র' লেখাটি পড়ে দুর্দান্ত লাগল। এইরকম আরও লেখা দেখতে চাই।

বিপ্লব রায়
মির্জাপুর, বাঁকুড়া

সবচেয়ে ভাল লাগে

'আনন্দমেলা' পত্রিকাটি পড়ার জন্য আমি উন্মুখ হয়ে থাকি। সবচেয়ে ভাল লাগে কুইজ, বিজ্ঞান : যেখানে যা হচ্ছে, বাইরের জানালা, বিশ্ববিচিত্রা, চিত্তাকর্ষক খেলার খবর, খেলোয়াড়দের রঙিন ছবি। কেরিয়ার গাইডও খুব উপকারে আসে। গৌতম সরকারের ধারাবাহিক আত্মকথা প্রকাশিত হওয়ায় খুব খুশি হয়েছি।

পুলক সরকার
জোড়দিঘি, পশ্চিম দিনাজপুর

ত্রিপুরার জনসংখ্যা

গোপাল লাহিড়ীর ভ্রমণ 'ঘরের পাশে ত্রিপুরা' ২৩ অগস্ট আনন্দমেলায় পড়লাম। লেখাটিতে দু-একটি ভুল চোখে পড়ল। লেখাটির এক জায়গায় লেখক 'বাদরঘাট'-এর উল্লেখ করেছেন। এটি হবে 'বাধারঘাট'। আর-এক জায়গায় লেখক লিখেছেন, 'ত্রিপুরার আঠারো লক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে আদিবাসীর সংখ্যা পাঁচ লক্ষ'। তথ্যটি ঠিক নয়। ১৯৮১ সালের আদমসুমারিতেই ত্রিপুরার মোট জনসংখ্যা ছিল একুশ লক্ষ। তার মধ্যে প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ ছিল আদিবাসী। লেখক কোন্ সালের ফেব্রুয়ারির কথা উল্লেখ করেছেন জানি না, যদি ১৯৮৯ সালের ফেব্রুয়ারি হয়, তা হলে ত্রিপুরার জনসংখ্যা হবে তেইশ লক্ষ, তার মধ্যে আদিবাসীর সংখ্যা প্রায় সাড়ে ছ' লক্ষ। লেখক 'আথারমুড়া' নামের যে পাহাড়টির কথা লিখেছেন সেটি হবে 'আঠারমুড়া'। আর-এক জায়গায় লেখক 'আথাউড়া রোড' নামে শহরের একটি রাস্তার উল্লেখ করেছেন।
লেখক সম্ভবত 'আখাউড়া' রোডের কথাই বলতে চেয়েছেন।

কমল জমাতিয়া
ত্রিপুরা

আনন্দমেলা
গ্রাহকদের জন্য বিশেষ ছাড়
এক বৎসর
১৮২·০০ টাকার পরিবর্তে
১৫৫·০০ টাকা (২৬ সংখ্যা)
দুই বৎসর
৩৫৪·০০ টাকার পরিবর্তে
৩০০·০০ টাকা (৫২ সংখ্যা)
আপনি যদি গ্রাহক হতে ইচ্ছুক হন তবে সত্বর আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকানাসহ প্রয়োজনীয় ড্রাফ্‌ট আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের নামে নিচের ঠিকানায় পাঠান :
সারকুলেশন ম্যানেজার (ইউ)
আনন্দবাজার পত্রিকা লিঃ
৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০০১
ডাক মাশুল লাগবে না

কোনটি ঠিক

আমি একাদশ শ্রেণীর ছাত্র। ১৭ মে সংখ্যায় 'বিজ্ঞান : যেখানে যা হচ্ছে' বিভাগে 'যে টেলিফোন ভাঁজ করে পকেটে রাখা যায়' লেখাটিতে অনুসন্ধানী লিখেছেন, "আলেকজান্ডার গ্রেহাম বেল টেলিফোন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সময় একদিন অ্যাসিড পড়ে যায় বেলের প্যান্টে। তক্ষুনি তিনি পরীক্ষামূলক যন্ত্রটির মাধ্যমে তাঁর সহকারীকে ডাকেন, ওয়াটসন এখানে এসো, তোমাকে দরকার।" কিন্তু ১৯ এপ্রিল সংখ্যায় 'আবিষ্কারের নেপথ্যে' বিভাগে চঞ্চল পাল লিখেছেন, "হঠাৎ অসাবধানে ব্যাটারিটা গেল উলটে, আর ব্যাটারিটার অ্যাসিড তাঁর (আলেকজান্ডার গ্রেহাম বেল) জামাটাকে দিল ফুটো করে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'মিঃ ওয়াটসন, একবার আসুন তো তাড়াতাড়ি!'"
আমার বক্তব্য, অ্যাসিড পড়েছে গ্রেহাম বেলের প্যান্ট বা জামা অথবা জামা ও প্যান্ট দুটোই নষ্ট হয়েছিল?

রতনকুমার দেলমালিহাটি, মুর্শিদাবাদ

লেখকের উত্তর : এ-কথা ঠিক যে, অ্যাসিড তাঁর পোশাকে পড়েছিল। কিন্তু পোশাকটি ঠিক কী ধরনের, তা নিশ্চিতভাবে বলা শক্ত। নর্মান ওয়াইমার তাঁর 'ইনভেন্টরস' বইয়ে এ-ব্যাপারে শুধু 'ক্লথ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

আগমনী গানে গানে

বনফুল

(১)
জ্যোছনার হাসি কুসুমের রাশি
সারা শরতের প্রাণে প্রাণে
ভরিয়া তুলেছে মা'র আগমনী গানে গানে !
দূর বিদেশীর বহুদিন পরে
ফিরে যাওয়া নিজ গৃহ মাঝে
এরই সাথে যেন কতনা রাগিনী
মধু আগমনী গীত বাজে !
(২)
এই অবকাশে স্নেহের পিয়াসে
বিদেশী সে যাবে নিজ-ঘরে !
আপনার জনে দেখিতে কেবল ক্ষণতরে !
মা'র মধু কোল বাবার আশিস
ভাইবোনদের স্নেহ-বাণী
বন্ধুর সেই হাসিমাখা প্রীতি
জুড়াবে তৃষিত হৃদিখানি !
(৩)
স্নেহজনসনে সে ক্ষণ মিলনে
তুমি যে বন্ধু র'বে দূরে !
মিলনের গানে বিরহ বাজিবে ক্ষীণ সুরে !
লও এ পূজার উপহার তবে
কবিতায় গাঁথা কথাগুলি !
গাঁথিয়া দিলাম হাসি ও অশ্রু
বিজয়ার মধু কোলাকুলি !

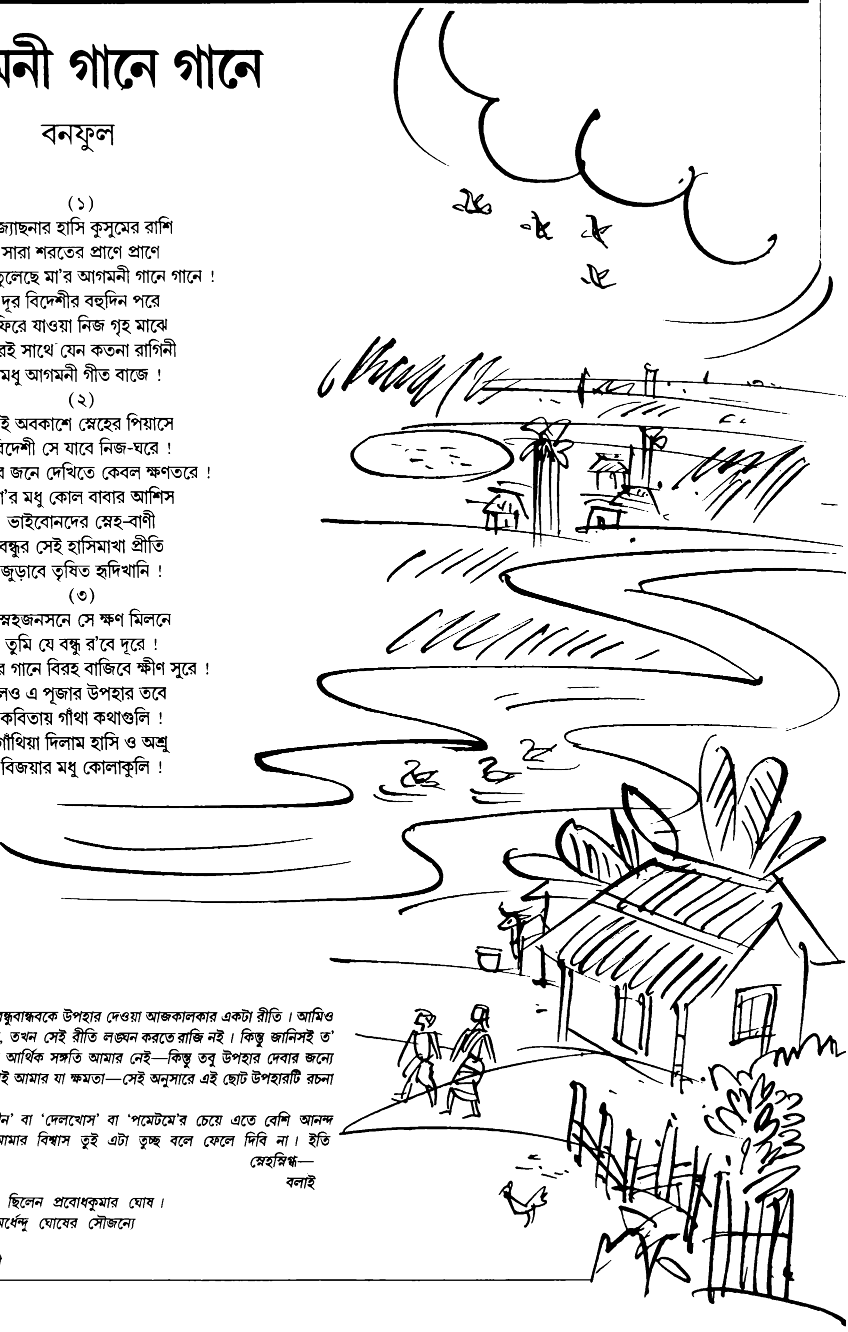

ভাই প্রবোধ,

পুজোর সময় বন্ধুবান্ধবকে উপহার দেওয়া আজকালকার একটা রীতি। আমিও যখন আজকালকার, তখন সেই রীতি লঙ্ঘন করতে রাজি নই। কিন্তু জানিসই ত' উপহার দেবার মত আর্থিক সঙ্গতি আমার নেই—কিন্তু তবু উপহার দেবার জন্যে প্রাণটা উৎসুক। তাই আমার যা ক্ষমতা—সেই অনুসারে এই ছোট উপহারটি রচনা করে দিলাম।
আশা করি 'কুন্তলীন' বা 'দেলখোস' বা 'পমেটমে'র চেয়ে এতে বেশি আনন্দ দেবে। অতএব আমার বিশ্বাস তুই এটা তুচ্ছ বলে ফেলে দিবি না। ইতি

স্নেহস্নিগ্ধ—
বলাই

বনফুলের বাল্যবন্ধু ছিলেন প্রবোধকুমার ঘোষ।
চিঠি ও কবিতা অর্ধেন্দু ঘোষের সৌজন্যে

ছবি কৃষ্ণেন্দু চাকী

উদাসী রাজকুমার

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সারারাত নিদ্রাহীন ভাবে কাটালেন মহারানি তলতাদেবী। তাঁর হাত ও পা শিকল দিয়ে বাঁধা। এই অবস্থায় ঘুম আসার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। একটু নড়াচড়া করলেই শিকলের ঝনঝন শব্দ হচ্ছে। তাঁর দু'চোখে জ্বলছে ক্রোধের আগুন।

ভয় কাকে বলে তা তলতাদেবী জানেনই না। তিনি হতাশাতেও ভেঙে পড়েননি। তিনি মনে-মনে জানেন, যে-কোনও উপায়ে এখান থেকে উদ্ধার পেতেই হবে। তারপর চম্পকের ওপর চরম প্রতিশোধ নেবেন।

শুধু তাঁর চিন্তা হচ্ছে দুই ছেলের জন্য।

রাজকুমার দৃঢ় এবং তীক্ষ্ণ সারাদিন মাকে দেখেনি। রাত্তিরে খাওয়ার আগে তারা মায়ের সঙ্গে গল্প করে। আজ তারা নিশ্চয়ই মাকে খুঁজেছে। রাজপ্রসাদের মধ্যে ওদের বিপদের কোনও আশঙ্কা নেই অবশ্য। তবু মাকে না দেখে ওরা তো কখনও পুরো একটা দিন থাকেনি

মহারাজ মহাচূড়ামণি কখন ঘুম থেকে জাগবেন তার ঠিক নেই। জেগে উঠে তিনি যখন শুনবেন মন্ত্রী জীবক কারাগারের মধ্যেই নিহত হয়েছেন, তখন তিনি দারুণ রেগে উঠবেন তো বটেই, রাগের চোটে অন্য কাকে যে কী শাস্তি দেবেন, তার ঠিক নেই।

মহারানি যে গোপনে চম্পকের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, সে-কথা রাজপুরোহিত ছাড়া আর কেউ জানে না।

রাজপুরোহিত ছন্তী অবশ্যই যথাসময়ে খবরটি জানাবেন মহারাজকে। সব বুঝিয়ে বলবেন ! কিন্তু মহারানি সকালে বেরিয়েও সন্ধের পর রাজধানীতে ফিরতে পারলেন না, এর কী ব্যাখ্যা দেবেন ছন্তী

চম্পক বিদ্রোহ করেছে, একথা শুনলেই মহারাজ জ্বলে উঠবেন। সৈন্য নিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে বেরিয়ে পড়বেন বিদ্রোহ দমন করতে। ঝড়ের মুখে তৃণখণ্ডের মতন মহাচূড়ামণির সামনে চম্পকের বাহিনী এক নিমেষে উড়ে যাবে। আজ দুপুরের মধ্যেই মহারানি মুক্ত হবেন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এবার চম্পক তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়লেও তাকে আর ক্ষমা করা হবে না। রাজপথে, প্রজাদের সামনে চম্পক মৃত্যু বরণ করবে।

কিন্তু চম্পক গূঢ় হেসে কাল বলেছিল, সে এমন কৌশল করেছে যে, মহাচূড়ামণি তাকে আক্রমণ করতে সাহস পাবেন না। কী সেই কৌশল ? মহারাজ কোনও বাধাই গ্রাহ্য করবেন না। এমনকী মহারাজ কাছাকাছি এসে পৌঁছলে চম্পক যদি মহারানির গলায় তলোয়ার ঠেকিয়ে তাঁকে খুন করে ফেলার ভয় দেখায়, তা হলে কি মহারাজ থমকে যাবেন ?

না, না, দেশের জন্য মহারানির জীবনও তুচ্ছ। দেশকে রক্ষা করার জন্য মহারানি এখনই নিজের প্রাণদান করতে রাজি আছেন।

মহারাজের কাছে কোনওক্রমে যদি একটা বার্তা পাঠানো যেত

কাল সারাদিন এবং সারারাত মহারানি তলতাদেবী কোনও খাদ্যদ্রব্য মুখে দেওয়া তো দূরের কথা, এক বিন্দু জলও পান করেননি। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। আর সহ্য করা যাচ্ছে না !

নিজের অজান্তেই তিনি হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, "জল ! জল !"

এমনি একজন প্রহরী তাঁবুর দরজার কাছে উঁকি মারল। তার হাতে একটা জলের পাত্র। মহারানি কখন জল চাইবেন, সেজন্য যেন সে তৈরি হয়েই ছিল।

লোকটি ভেতরে এসে জলের পাত্রটি নামিয়ে রাখল মহারানির সামনে।

তলতাদেবী লোকটির চোখের দিকে চোখ রেখে বললেন, "মূর্খ, আমার হাত বাঁধা। জল খাব কী করে ? হাতের শিকল খুলে দাও !"

প্রহরীটি পাহাড়ি জাতের লোক। রাজধানীর ভাষা সে ভাল বোঝে সে মাথা নাড়ল দু' দিকে।

তলতাদেবী বললেন, "তা হলে ওই জল নিয়ে যাও

প্রহরীটি এবার নিজে জলের পাত্রটি ধরে নিয়ে এল তলতাদেবীর মুখের দিকে।

তলতাদেবী মাথা সরিয়ে নিয়ে জলন্ত চোখে বললেন, "খবর্দার জানো না, এ রাজ্যের মহারানি অন্য কারও হাতে জল পান করেন না

সেই কণ্ঠস্বর শুনে যে-কোনও মানুষই ভয় পাবে। প্রহরীটির হাত কেঁপে উঠল। সে জলের পাত্রটি নামিয়ে রেখে বেরিয়ে গেল তাঁবু থেকে।

একটু পরেই সে ডেকে আনল আর একজনকে। এই দ্বিতীয় ব্যক্তিটিকে তলতাদেবী চেনেন। এর নাম ভাটু, এ চম্পকের সর্বক্ষণের সহচর। চম্পকের সঙ্গে এই ভাটুকে কয়েকবার দেখেছেন তলতাদেবী।

তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে ভাটু বলল, "আপনি জল পান করবেন না, মহারানি ?"

তলতাদেবী বললেন, "তুই জানিস না, রাজা-রানিরা কখনও অন্যের হাত থেকে জল খান না

ভাটু বলল, "এতক্ষণ জল না খেয়ে রয়েছেন। আপনার শরীর খারাপ হবে।"

তলতাদেবী বললেন, "জলের পাত্রটা নিয়ে যা এখান থেকে। আমার জল চাই না !"

ভাটু বলল, "আপনি মুখ ফুটে একবার জল চেয়েছেন। তবু আপনাকে জল না খাওয়ালে আমাদের নতুন রাজা রাগ করবেন !"

তলতাদেবী ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন, "নতুন রাজা ? বিশ্বাসঘাতক হবে রাজা ! তোদের চম্পক রাজা হলে, তুই বুঝি সেনাপতি হবি ?"

ভাটু অন্য প্রহরীটিকে বলল, "এই, ওঁর হাতের শিকল খুলে দাও, আমি পাহারা দিচ্ছি !"

ভাটু তার কোমর থেকে তলোয়ার খুলে নিয়ে দাঁড়াল। পাহাড়ি প্রহরীটি নিজের অস্ত্রটা মাটিতে নামিয়ে রেখে হাঁটু গেড়ে বসল। তারপর মহারানির হাতের শিকলের বন্ধন মুক্ত করে দিল।

তলতাদেবী বললেন, "পায়ের শিকলও খুলে দাও ? আমার পায়ে ঝিঝি ধরে গেছে। আমি উঠে দাঁড়াব।"

পাহাড়ি সৈনিকটি ঘাড় ঘুরিয়ে ভাটুর দিকে তাকাল।

ভাটু বলল, "ঠিক আছে, পায়ের বাঁধনটাও খুলে দ। আমি তো আছি এখানেই ! উনি পালাবেন কোথায় !"

কাগজের হিরে

১৯৮০ সালের ১২ মে। দক্ষিণ আফ্রিকার সোনার শহর জোহান্সবার্গ। বিশ্বের তাবড়-তাবড় জহুরিরা জড়ো হয়েছেন। না, সোনার সন্ধানে নয়, আন্তর্জাতিক হিরে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের বিশ্ব অধিবেশনে যোগ দিতে। এমন সময় শোনা

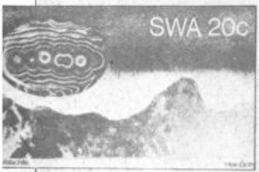

গেল বিশ্বের সবচেয়ে বড় কাটা-হিরের নমুনা অধিবেশন প্রাঙ্গণে নিয়ে আসা হচ্ছে। মুহূর্তেই শুরু হয়ে গেল সাজ-সাজ রব। জহুরিদের চোখ চকচক করে উঠল। সকলে নড়েচড়ে বসলেন। তবে নমুনা দুটি এল 'বিশ্ব হিরে অধিবেশন' উপলক্ষে প্রকাশিত দক্ষিণ আফ্রিকার দুটি ডাকটিকিটে ছাপা হয়ে। ডাকটিকিট ছাড়া নমুনা দুটিকে তখন পাওয়াই বা কী করে সম্ভব ? কারণ আসল হিরে দুটো তখন শোভা পাচ্ছে ব্রিটিশ রাজপরিবারের সম্পদ হিসেবে, টাওয়ার অব লন্ডনে।

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রিটোরিয়ার কাছে কাল্লিনান নামে জায়গায় এক হিরের খনি আবিষ্কৃত হয় ১৯০৫ সালে। নাম তার প্রিমিয়ার ডায়মণ্ড মাইন। ওই সময়েই বিশ্বের সবচেয়ে বড় হীরকখণ্ডটি সেখানে পাওয়া যায়। তৎকালীন সরকার হীরকটিকে উপহার হিসেবে পাঠান রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডের কাছে। ১৯০৭ সালে নভেম্বর মাসে সেটি ছিল রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডের ৬৬তম জন্মদিন। এডওয়ার্ড হিরেটিকে পাঠিয়ে দেন বিশ্ববিখ্যাত হিরে কাটার কম্পানিতে। আমস্টারডামের সেই কম্পানির নাম অ্যাসচারস ডায়মণ্ড কম্পানি। কাটার আগে তাঁরা হিরেটিকে নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। পরে ৯টি বড় খণ্ডে ও ৯৬টি ছোট মণি-মাণিক্যে রূপ দিলেন। এগুলিই এখন রাজপরিবারের সম্পত্তি হিসেবে বিরাজ করছে। এর মধ্যে থেকেই দুটি বড় হিরেকে বেছে নেওয়া হয়েছে আলোচ্য ডাকটিকিটে রূপ দেওয়ার জন্য। ২০ সেন্ট ডাকটিকিটে দেখা যাচ্ছে 'গ্রেট স্টার অব আফ্রিকা' বা 'কাল্লিনান-১' নামের হিরেটিকে। ৭৪টি পলকাটা ৫৩০,২০ ক্যারেটের এই হিরেটি বর্তমানে ব্রিটিশ সার্বভৌমত্বের প্রতীক—রাজদণ্ডের গায়ে খচিত। আর ১৫ সেন্ট ডাকটিকিটে মূর্ত হয়েছে 'কাল্লিনান-২' নামের হিরেটি। ৩১৭,৪০ ক্যারেটের এই হিরেটির গায়ে ৬৬টি পলকাটা আছে।

দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকাতেও বহু অমূল্য রত্নরাজির সন্ধান মেলে। ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত চারটি ডাকটিকিটে এ-কথায় প্রমাণ মিলবে। পান্না, নীলকান্তমণি, স্ফটিক, পুষ্পরাগমণি প্রভৃতি রত্নের এক অপরিসীম আধার হল দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার নানা অঞ্চল। সারা বিশ্বের রত্নসংগ্রহকারী ও জহুরিদের চোখ যখন এইসব অমূল্য রত্নের দিকে, তখন আমরা ডাকটিকিটে এদের স্বরূপ জেনেই ক্ষান্ত হয়ে থাকছি।

কবিতা রায়

পাহাড়ি প্রহরীটি পায়ের শিকলও খুলে দিল।

তলতাদেবী পিতলের তৈরি ভারী জলের পাত্রটি তুলে নিলেন দু'হাতে। মুখের কাছে এনে ঢকঢক করে জল পান করতে লাগলেন। দু'জন পুরুষ এক দৃষ্টিতে দেখতে লাগল তাঁর সেই জল খাওয়া।

একটুখানি জল পান করেই তলতাদেবী সেই ভারী পাত্রটা হঠাৎ ছুঁড়ে মারলেন পাহাড়ি প্রহরীটির মাথা লক্ষ্য করে। সে লোকটি আঁক করে একটা শব্দ করেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

চোখের নিমেষে তার তলোয়ারটি তুলে নিয়ে তলতাদেবী উঠে দাঁড়ালেন !

ভাটু তাঁবুর মধ্যে ঢুকে এল। নিষ্ঠুরভাবে হেসে বলল, "এই ভাবে কি পালাতে পারবেন, রানিমা ? আপনি আমার শক্তি জানেন না ! কেন মিছিমিছি ঝঞ্ঝাট করছেন, আপনার অস্ত্রটা ফেলে দিন !"

তলতাদেবীও হাসলেন। এই ভাটু স্ত্রীলোক বলে তাঁকে অবজ্ঞা করছে। এ লোকটা জানে না যে, এক সময় তিনি সমস্ত রকম অস্ত্র শিক্ষা করেছিলেন।

তিনি তলোয়ারটা তুলে বললেন, "বিশ্বাসঘাতকতা করে সেনাপতি হবার লোভ হয়েছে, তাই না ? দেখি তোর যোগ্যতা আছে কি না !"

তলতাদেবীর তলোয়ারের এক আঘাত প্রতিরোধ করেই ভাটু চমকে উঠল। একজন নারীর এতখানি জোর !

মাত্র একটুক্ষণ লড়াই করেই ভাটুর হাত থেকে অস্ত্র ছিটকে পড়ল। সে সেটা আবার কুড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতেই তলতাদেবী পা দিয়ে চেপে ধরলেন। তারপর ভাটুর ঘাড়ে তলোয়ারের ডগাটা ঠেকিয়ে বললেন, "এবার শেষ করে দিই ?"

ভাটু অমনি হাউহাউ করে কেঁদে উঠে বলল, "আমাকে দয়া করুন, এবারের মতন ক্ষমা করুন !"

তলতাদেবী বললেন, "কাপুরুষরা বিপদে পড়লেই ক্ষমা চায়। তোর মতন পাপীদের মৃত্যুদণ্ডই উচিত শাস্তি। কিন্তু আমি নিজের হাতে এক্ষুনি তোকে মারতে চাই না। তুই টুঁ শব্দটি করবি না। গা থেকে জামাটা খুলে ফ্যাল। আমি যা বলছি শুনবি। একটু এদিক-ওদিক করলেই তোর গলার নলি কেটে দেব !"

ভাটু নিজের জামাটা খুলে ফেলতেই তলতাদেবী তাকে আবার বললেন তার হাত দুটো মাথার ওপর তুলতে।

তারপর সেই হাত দুটোতে তিনি শক্ত করে শিকল বাঁধলেন। ভাটুর জামাটার খানিকটা অংশ ভরে দিলেন তার মুখের মধ্যে। পা দুটিও বাঁধলেন।

তারপর সরে এসে বললেন, "এবার দ্যাখ, শিকল বাঁধা অবস্থায় থাকতে কেমন লাগে ! তুই চ্যাঁচাতেও পারবি না !"

পাহাড়ি সৈন্যটি এখনও অজ্ঞান হয়ে আছে।

তলোয়ারটা হাতে নিয়ে তলতাদেবী খুব সাবধানে উঁকি মারলেন তাঁবুর বাইরে।

কাছাকাছি আর কোনও মানুষজন নেই। চম্পকের বোধহয় ঘুম ভাঙেনি এখনও। কিন্তু ভোরের আলো ফুটে গেছে। পেছনের জঙ্গলে ডাকাডাকি করছে অনেক পাখি।

তাঁবুর বাইরে পা দিয়ে তলতাদেবী বুক ভরে নিশ্বাস নিলেন একবার। আঃ, কী আরাম ! স্বাধীনতার স্বাদ এত সুন্দর। জীবনে এই প্রথম তিনি এক রাত্রি বন্দিনী ছিলেন। তাতেই এত কষ্ট !

সামনের দিকে অনেক প্রহরী থাকবেই। পেছনে জঙ্গলের দিকে, প্রহরীরা আছে কি না কে জানে ! তলতাদেবী খুব সন্তর্পণে পেছন দিকেই যেতে শুরু করলেন। সূর্যের আলো দেখে বুঝলেন, এটাই পূর্ব দিক। তাঁকে যে-কোনও উপায়ে পৌঁছতেই হবে রাজধানীতে। (ক্রমশ)

ছবি সুব্রত চৌধুরী

দূষণমুক্ত তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র

পরিবেশ ও প্রকৃতি নিয়ে আমাদের চিন্তাভাবনার অন্ত নেই। পরিবেশ বাঁচাতে কত চেষ্টাই না করা হচ্ছে। নিত্যনতুন প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া হচ্ছে এই কাজে। লক্ষ করে দেখা গেছে, পরিবেশ দূষণের জন্য যেসব শিল্প দায়ী তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র। বিদ্যুতের চাহিদা যে হারে বাড়ছে, তাতে নতুন-নতুন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তোলা ছাড়া উপায় নেই। অথচ এই তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের চিমনি দিয়ে যে-গ্যাস পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে তাতে থাকে ছাই, কয়লার গুঁড়ো, সালফার-ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন-অক্সাইড, কার্বন-মনোক্সাইড, কার্বন-ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি। নির্গত গ্যাসের সঙ্গে এইসব পদার্থ পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ায় বিদ্যুৎ কেন্দ্রের আশপাশের বাসিন্দারা শিকার হয়ে পড়েন নানা অসুখের, আর প্রকৃতিরও ক্ষতি হয়।

এতদিন পর্যন্ত তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের সবেধন নীলমণি ছিল ইলেকট্রোস্ট্যাটিক প্রেসিপিটেটর বা সংক্ষেপে ই· এস· পি। এর কাজ ছিল সূক্ষ্ম ছাইয়ের গুঁড়ো ইত্যাদিকে নির্গত গ্যাস থেকে আলাদা করে নেওয়া। কিন্তু সম্প্রতি পশ্চিম জার্মানিতে দূষণমুক্ত তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরির জন্য নয়া উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কোনও তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদনক্ষমতা যদি ৩০০ মেগাওয়াট বা তার বেশি হয়, তা হলে তার নির্গত গ্যাসকে সালফারমুক্ত করার জন্য বসছে নতুন কারিগরি সরঞ্জাম। আগামী ১৯৯০ সালের মধ্যে এর সঙ্গে যুক্ত হবে নাইট্রোজেন অক্সাইড মুক্ত করার প্রযুক্তি। গোটা জার্মানি জুড়ে এই উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব হয়েছে আধুনিক কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তির অগ্রগতির জন্য। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের আধুনিক কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চুলচেরা হিসেব করে লক্ষ রাখবে যাতে শক্তি উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত কাঁচামাল আরও দক্ষভাবে কাজে লাগানো যায়। এতে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সামগ্রিক কর্মদক্ষতা অনেক বেড়ে যাবে, আর পাওয়া যাবে দূষণমুক্ত তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র।

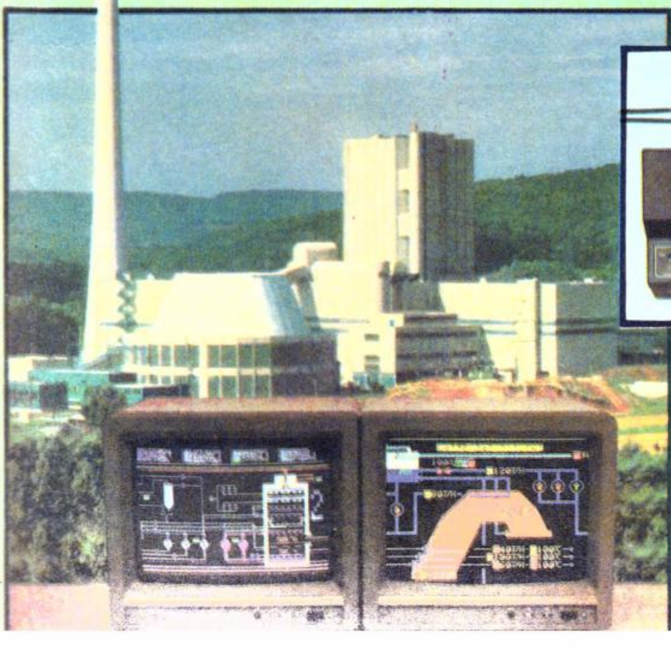

কনট্যুর ক্যালকুলেটর

কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে ধাতব যন্ত্রাংশ তৈরি হচ্ছে পৃথিবীর বহু দেশেই। এই নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজন হয় বিশেষ প্রোগ্রাম। এর সঙ্গে ঠিকমতো খাপ খাওয়ানোর জন্য বিভিন্ন যন্ত্রাংশের কারিগরি নকশাও তৈরি করতে হয় নিখুঁতভাবে। সুতরাং কোনও জটিল যন্ত্রাংশের কোন জায়গার মাপ কত, বা তার কোন তলের সূক্ষ্ম বক্রতা ঠিক কতটুকু ইত্যাদি নির্ভুলভাবে জানা প্রয়োজন। এইসব কাজ সহজভাবে করার জন্য তৈরি হয়েছে কনট্যুর ক্যালকুলেটর। কোনও যন্ত্রাংশের জ্যামিতিক চেহারা নিখুঁতভাবে হিসেব কষে তার প্রতিটি তলের মাপ, বক্রতা ইত্যাদি জানিয়ে দেয় এই ওস্তাদ ক্যালকুলেটর। এর মধ্যে রয়েছে বিশেষ ধরনের জ্যামিতিক মাপজোখের বারোটি প্রোগ্রাম। সুতরাং হিসেব নিকেশের কাজ

শেষ হলে যন্ত্রাংশটির যাবতীয় অংশের মাপ ইত্যাদি প্রিন্টারের সাহায্যে ছাপিয়ে দেয় কনট্যুর ক্যালকুলেটর। প্রিন্টার হিসেবে থার্মাল প্রিন্টার কিংবা ইঙ্ক জেট প্রিন্টার সমানভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। সন্দেহ নেই, যন্ত্রাংশ তৈরির কাজ অনেক সহজ করে তুলবে এই যন্ত্রটি।

অনুসন্ধানী

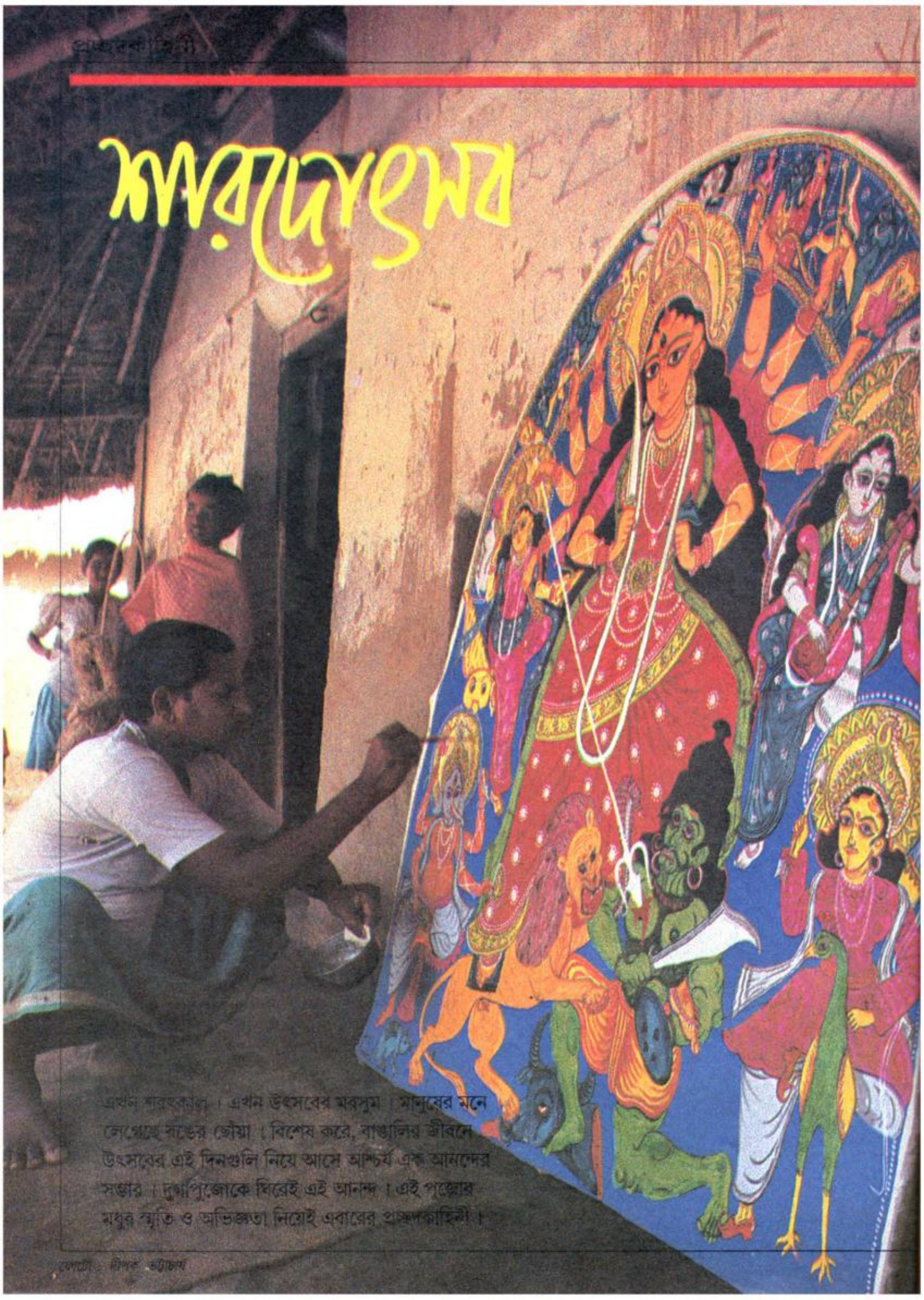

শারদোৎসব

এখন শরৎকাল। এখন উৎসবের মরসুম। মানুষের মনে লেগেছে রঙের ছোঁয়া। বিশেষ করে, বাঙালির জীবনে উৎসবের এই দিনগুলি নিয়ে আসে আশ্চর্য এক আনন্দের সম্ভার। দুর্গাপুজোকে ঘিরেই এই আনন্দ। এই পুজোর মধুর স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা নিয়েই এবারের প্রচ্ছদকাহিনী।

ফোটো : দীপক ভট্টাচার্য

ফোটো : হীরক সেন

প্রতিমার বদলে সেবার ঘটপুজো

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আমার ছেলেবেলায় আমি প্রত্যেক বছর পুজোর সময় পূর্ববঙ্গে আমাদের গ্রামের বাড়িতে চলে যেতাম। খুব রোমাঞ্চকর ছিল সেই যাত্রা। শিয়ালদা স্টেশন থেকে ট্রেনে করে খুলনা। তখন মনে হত, কত দূরের সেই পথ। সারারাত ধরে ট্রেন যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। আসলে কিন্তু একশো মাইলের চেয়েও কম দূর। এখন তিন-চার ঘণ্টাতেই চলে যাওয়া যায়।

খুলনা থেকে ভোরবেলা স্টিমার। আমরা অবশ্য ছেলেবেলায় তাকেই বলতাম জাহাজ। উপরে, নীচে কত মানুষ। অনেকেই সঙ্গে বিছানা নিয়ে যেত, ডেকে সেই বিছানা পেতে শুয়ে থাকত। স্টিমারে উঠেই জায়গা দখলের জন্য হুটোপাটি শুরু হয়ে যেত একটা। রেলিংয়ের ধারে জায়গা পাওয়ার জন্য আমাদের খুব উৎসাহ ছিল।

ফোটো : দীপক ভট্টাচার্য

তারপর বিশাল নদীর বুকের ওপর দিয়ে ঝিকঝিক করতে করতে এগিয়ে যেত স্টিমার। সেই নদীর জলে আমরা অনেক শুশুক দেখেছি। নদীর চড়ায় শুয়ে-শুয়ে রোদ পোহাত কুমিরের দল। সেই কুমিরের গা থেকে ময়লা খুঁটে-খুঁটে খেত শালিক পাখি। স্টিমার খুব কাছে চলে এলে সেই কুমিরেরা সড়াত-সড়াত করে নেমে পড়ত জলে। এখন মনে হবে, এসব সিনেমার দৃশ্যের মতন। কিন্তু আমরা এ-দৃশ্য সত্যিই দেখেছি, আফ্রিকায় নয়, পূর্ব বাংলার নদীপথে।

গ্রামের বাড়িতে কলকাতা, ভাগলপুর, দিল্লি থেকে আত্মীয়-স্বজনরা সবাই এসে জড়ো হত প্রত্যেক পুজোর সময়। আমার মামাবাড়ির সামনে একটা বিরাট আটচালা ছিল। সেটা অনেকটা কলকাতার বারোয়ারি পুজোর মণ্ডপের মতো দেখতে, কিন্তু সেটা বাঁধা থাকত

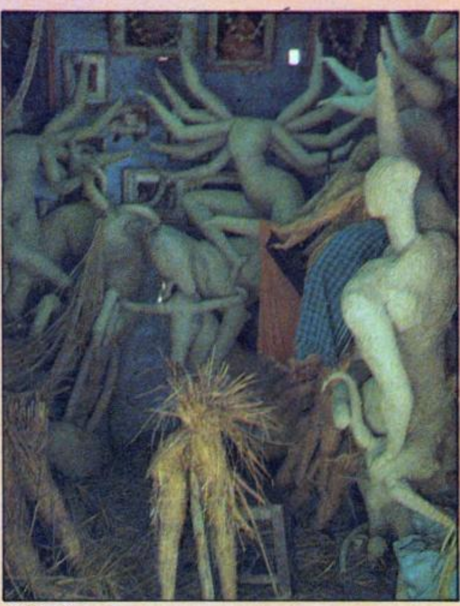

ফোটো : হীরক সেন

সারা বছরই। সেই আটচালার একধারে, পুজোর এক মাস আগে থেকে তৈরি হত ঠাকুর। জলধর নামে একজন কুমোর এসে প্রতিমার মূর্তি বানাত। প্রথমে শুধু খড়ের হাত-পা, আর ধড়। কারও মুখ থাকত না। সেগুলো কেমন যেন অদ্ভুত দেখাত। তারপর তার ওপরে মাটি লাগানো হত কয়েকবার। তাকে বলা হত এক মেটে, দু' মেটে করা।

প্রতিমার মুখ বানাবার সময়টাই ছিল আসল আকর্ষণের। জলধরের দাদা হলধর আরও বড় শিল্পী। সে শুধু আসত মুখ বানাবার জন্য। হলধর লোকটি ছিল ভারী অদ্ভুত। খুব গম্ভীর, কারও সঙ্গে একটাও কথা বলত না। এমনকী, আমার রাশভারী দাদু, তাঁকেও বিশেষ পাত্তা দিত না সে। সে আসত আলাদা একটা নৌকোয়। ঘাটে সেই নৌকোটা বাঁধা থাকত। সেই নৌকোয় আর কারও প্রবেশের অধিকার ছিল না। আমরা দূর থেকে দেখতাম, সেই নৌকোর মধ্যে অনেক নারকোলের মালার মধ্যে নানারকমের রং গোলা, আর বহু রকমের তুলি।

প্রতিমার মুখ বানাবার আগে হলধর কাউকে দেখতেও দিত না। কয়েকটা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হত সামনের দিকটা। তার ভেতরে হলধর শুধু একা থাকত। দু'দিন, তিনদিন কেটে যেত এইভাবে। এর মধ্যে শুধু কয়েক কাপ চা ছাড়া আর কিছুই খেত না সে। আমরা অধীর উৎকণ্ঠায় বাইরে ঘোরাঘুরি করতাম, কেউ কাপড়ের পরদা একটু সরিয়ে উঁকি মারার চেষ্টা করলেই বাড়ির গুরুজনরা খুব ধমক দিতেন।

হঠাৎ এক সময় হলধর নিজেই কাপড়গুলো সব সরিয়ে দিত। তখন ভেসে উঠত যেন এক ম্যাজিকের দৃশ্য। মা দুর্গা তো বটেই,

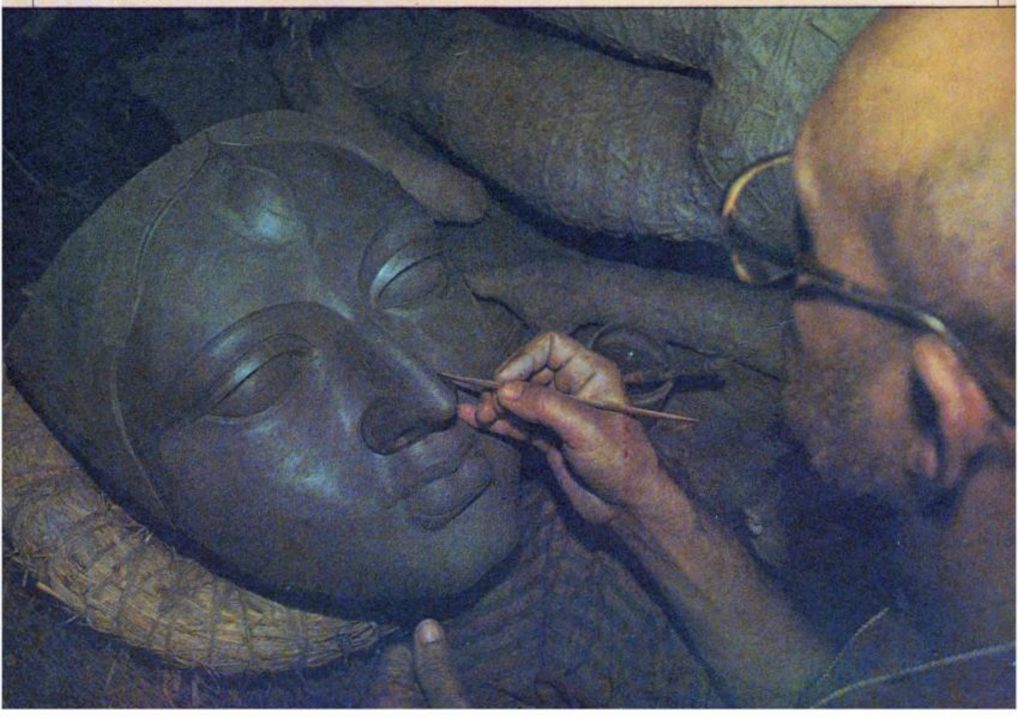

কার্তিক-গণেশ, লক্ষ্মী-সরস্বতী, এঁদেরও সকলেরই মুখ তৈরি হয়ে গেছে। শুধু অসুর আর মোষের মুণ্ডু হলধর নিজে বানাত না। আমরা যতজন থাকতাম, প্রত্যেকেরই মনে হত মা-দুর্গা ঠিক তার দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন। বাড়ির সবাই বলত, হলধরের হাতের কী অপূর্ব গুণ, প্রত্যেকবার প্রতিমার মুখ নতুন রকমের মনে হয়।
মূর্তির মুখ গড়া শেষ হলেই প্রচণ্ড খিদে পেত হলধরের। এক থালা ভর্তি লুচি সাজিয়ে দেওয়া হত তার সামনে। দু-তিন দিনের খিদে সে মিটিয়ে নিত একসঙ্গে। বোধ হয় চল্লিশ পঞ্চাশখানা লুচি সে খেত। আর তখন সে হেসে-হেসে গল্পও করত অনেকের সঙ্গে। এ যেন এক অন্য হলধর।
আমাদের বাড়ির কাছেই নদীর ধারে ফুটত প্রচুর কাশ ফুল। আর শিউলি ফুলের গাছ তো অনেক। এই শিউলি আর কাশ ফুল না দেখলে শরৎকালকে যেন চেনাই যায় না। আকাশের মেঘও তখন সাদা হয়ে আসত।
সেই ছেলেবেলায় পুজোর আগের কয়েকটা দিন আমরা একটা খুব নিষ্ঠুর কাজও করতাম। তখন অবশ্য সে বোধ ছিল না। আমাদের মামাবাড়িতে পুজোর তিনদিন মোট চারটে পাঁঠা বলি হত। একদম কালো রঙের নিখুঁত পাঁঠা বলি দেওয়াই নিয়ম। সেইজন্য আগে থেকেই এরকম চারটে পাঁঠা কিনে রাখা হত বাড়িতে। আমাদের মতন ছোটদের ওপর ভার থাকত সেই পাঁঠাগুলোকে খাওয়ানো-দাওয়ানো আর মাঠে ঘুরিয়ে আনার। আমরা তাদের কচি-কচি ধান খাওয়াতাম, অনেক আদর করতাম। ক'দিন বাদেই যে তাদের বলি দেওয়া হবে সেটা যেন মনেই থাকত না।
তারপর পুজোর দিনে যখন আমাদের সেই পোষা একটি পাঁঠাকে

প্রতিমার অলঙ্কার *ফোটো সোমনাথ ঘোষ*

চড়ানো হত হাড়িকাঠে, সেই পাঁঠাটা দারুণ করুণভাবে ব্যা-ব্যা করে ডাকত, তখনই কেঁপে উঠত আমার বুক। আমি কান্না সামলাতে পারতাম না। ছুটে যেতাম অনেক দূরে।
একবার পুজোর সময় একটা বিশেষ ঘটনা ঘটেছিল। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছে। সুভাষচন্দ্র ব্রিটিশের হাতে বন্দী ছিলেন কলকাতায়।

চালচিত্র আঁকা হচ্ছে *ফোটো সোমনাথ ঘোষ*

হঠাৎ কী করে শত-শত সাহেব-পুলিশের চোখ এড়িয়ে তিনি পালিয়ে গেলেন দেশের বাইরে। তারপর অনেকদিন তাঁর সঠিক কোনও খবর নেই। কিংবা উলটো-পালটা খবর শোনা যেত তাঁর সম্পর্কে। এক বছর পুজোর সময় শোনা গেল, সুভাষ বসু বিশাল এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসছেন ব্রিটিশদের তাড়িয়ে দেশ স্বাধীন করতে।
সেবারে হলধর আর জলধর দুই ভাই মিলে এক কাণ্ড ঘটিয়ে বসল। প্রতিমা বানাবার সময় গোড়া থেকেই পরদা টাঙিয়ে রাখল তারা। আগে থেকে কাউকেই কিছু দেখতে দেবে না। তারপর এক সময় যখন সব শেষ হল, তখন প্রতিমা দেখে বাড়ির সবাই এমনই অবাক হয়ে গেল যে, দু-এক মিনিট কোনও কথাই বলতে পারেনি। মা দুর্গার শাড়ির রং জাতীয় কংগ্রেসের পতাকার মতন তিন রঙের। অর্থাৎ, তিনি যেন ভারতমাতা। আর অসুরকে দেখতে হুবহু এক সাহেব মিলিটারির মতন। কার্তিক একেবারে সুভাষ বসু। সেই কার্তিকের হাতে তলোয়ার আর ভারত মাতারূপী মা-দুর্গা বর্শা বিঁধিয়ে দিয়েছেন মিলিটারি অসুরের বুকে।
আমরা সবাই সেই মূর্তি দেখে হাততালি দিয়ে উঠলাম। গ্রামের লোক দল বেঁধে এসে ধন্য ধন্য করতে লাগল। আশপাশের অনেক গ্রাম থেকে লোক ছুটে এল সেই ঠাকুর দেখতে।
কিন্তু অষ্টমী পুজোর দিন এসে গেল পুলিশ। ব্রিটিশ সোলজারের বুকে মা দুর্গা বর্শা বেঁধাচ্ছেন, আর কার্তিকের বদলে সুভাষ বসু— এই মূর্তি পুজো করা চলবে না। এটা নাকি দেশদ্রোহিতা। সেই ঠাকুর পুলিশের আদেশে কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হল আবার। হলধর, জলধরের নাম বলা হল না। আমার দু'জন মামাকে বন্দী করে নিয়ে গেল পুলিশ।
পুজো অবশ্য বন্ধ হয়নি। সেবারে প্রতিমার বদলে শুধু ঘট পুজো করেই বাকি কাজ সারা হয়েছিল। বলি অবশ্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

ফোটো : সোমনাথ ঘোষ

আমাদের সেই দুর্গাপুজো

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আমাদের দেশ ছিল ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে। আমার দাদু মোক্তারি করতে যখন মৈমনসিংহে আসেন তখন সেখানে আমাদের ঘর-বাড়ি হয়। এই শহরেই আমার জন্ম। শহর হলেও মৈমনসিংহ ছিল এক প্রকৃতিসমৃদ্ধ বৃহৎ গ্রামেরই সামান্য হেরফের। আমরা থাকতুম ব্রহ্মপুত্রের ধারে। বিশাল নদ। তার চরে শরৎকালে কাশফুলের বন্যা দেখা যেত। নদের ওপারে ছিল লোকালয়হীন আলেয়া অধ্যুষিত জলাভূমি। আমরা যে-বাড়িতে থাকতুম সেটিও ছিল গাছ-গাছালিতে ভরা। সুতরাং শহরে থাকলেও গ্রামের গন্ধ আমাদের ঘিরে থাকত।

আমার দাদু ভালই রোজগার করতেন। আমাদের বাড়িতে বেশ কিছু আশ্রিত মানুষও থাকতেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন একজন পুরোহিত। আমাদের যাবতীয় গার্হস্থ্য পুজো-পার্বণ তিনিই সম্পন্ন করতেন। নিরীহ মানুষ। কিন্তু তাঁর পুত্রেরা এত নিরীহ ছিলেন না। কনিষ্ঠটি তুখোড় দুষ্টু। ওই একটা ব্যাপারে, অর্থাৎ দুষ্টুমিতে আমার কুখ্যাতিও ছিল ব্যাপক। সে আমার চেয়ে বয়সে কিছু বড় ছিল এবং দু'জনের ঝগড়া-কাজিয়া-মারপিটও বিস্তর হয়েছে। তবু অকাজের বেলায় দু'জনে মিলে যেতেও দেরি হত না।

সেই ছেলেবেলায় দুর্গাপুজোর আনন্দ ছিল বটে, কিন্তু বারোয়ারির এত বাড়াবাড়ি ছিল না। বেশির ভাগ পুজোই ছিল পারিবারিক। জাঁকজমকের চেয়ে আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, ভক্তি ইত্যাদির পাল্লা বোধ হয় কিছু ভারী ছিল। আমরা পুজো দেখতে যেতুম কাঁহা-কাঁহা মুল্লুক। এক পুজোর ঢাকের বাদ্যি আর-এক পুজোমণ্ডপে বড় একটা পৌঁছত না। আর রাস্তায় ঘাটে পুজো দেখার এমন বেসামাল ভিড়ও চোখে পড়েনি।

ফোটো দেবাশিস দত্ত

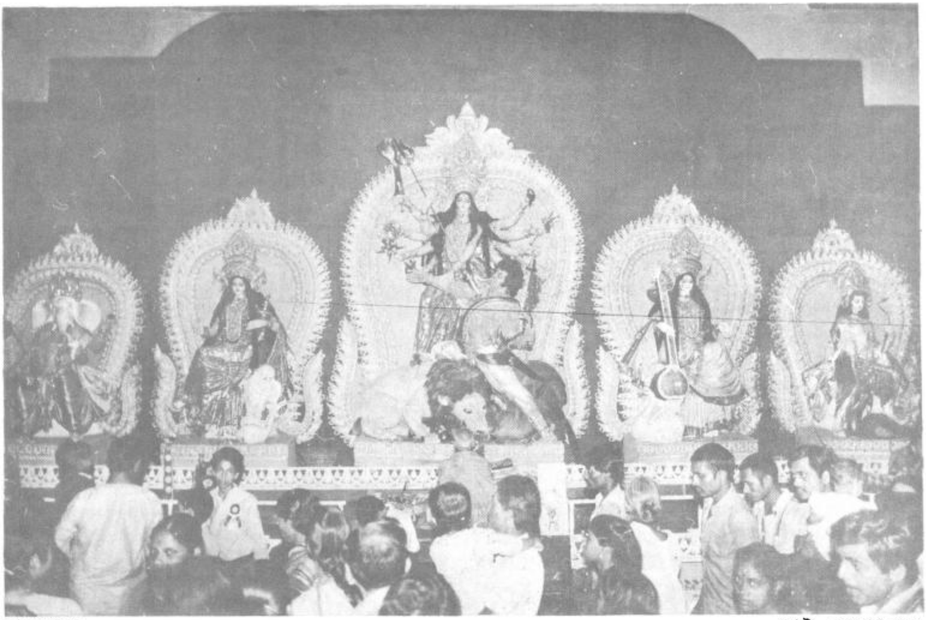

পুজো-মণ্ডপে

ফোটো সোমনাথ ঘোষ

আমার যখন বারো-তেরো বছর বয়স, তখন এক মহাষষ্ঠীর সন্ধেবেলা সেই পুরোহিত-তনয় কোথা থেকে একটা হাতদেড়েক উঁচু দুর্গামূর্তি ঘাড়ে করে এনে আমাদের বার-বাড়ির উঠানে রাখল । আর সঙ্গে-সঙ্গে তার দরিদ্র বাবা-মা খানিকটা ভয়ে, খানিকটা দুশ্চিন্তায় এবং রাগে তাকে প্রচণ্ড ভর্ৎসনা করতে লাগল । পুজোকাটালি দিনে দুর্গামূর্তি বাড়িতে আনা মানেই বাধ্যতামূলক পুজো । কিন্তু সে দরিদ্র ব্রাহ্মণ কোথা থেকে পুজোর খরচ জোগাড় করবেন । সুতরাং, পুরোহিত-জ্যাঠা পায়ের খড়ম তুলে ছেলেকে মারতে গেলেন । আমার দাদুর তখন অঢেল রোজগার । কাছারি থেকে যখন ফিরতেন তখন তাঁর সাহেবি হ্যাট ভর্তি থাকত কাঁচা টাকায় । ঠাকুরমা আঁচল পেতে সেই টাকা নিয়ে লোহার সিন্দুকে রাখতেন । দুর্গামূর্তি নিয়ে যখন বার-বাড়িতে তুলকালাম চলছে, তখন ঠাকুরমাই মুশকিল আসান হয়ে বেরিয়ে এলেন । বললেন, "ছেলেমানুষ, মূর্তিটা যখন এনেই ফেলেছে, তখন পুজো করতে হবেই বইকী । এ যেন মায়ের ইচ্ছে ।" সঙ্গে-সঙ্গে চারদিকে খবর পাঠানো হল । চলে এল বাঁশ, দড়িদড়া, চাঁদোয়া এবং কামলা । সন্ধেবেলা বাঁশ-কাটা, মেরাপ বাঁধা, হ্যাজাক জ্বালা ইত্যাদি গুরুতর ঘটনা ঘটতে লাগল, যা আমাদের বাড়িতে দুর্গাপুজোয় কখনও ঘটেনি । আমরা গুড়ের ওপর মাছির মতো সেইখানে সব জমে গেলুম, আর চারদিক থেকেও রাজ্যের বাচ্চাকাচ্চা এসে জড়ো হল । মণ্ডপ তৈরি হল, দুর্গামূর্তি সেখানে স্থাপিত হলেন । চার-পাঁচখানা সাইকেলে চেপে জ্যাঠতুতো দাদারা ছুটলেন বাজারে । সেই উত্তেজনা, আর সেই শিহরন আজও স্মৃতির সরণি বেয়ে এসে স্পর্শ করে যায় । চলে এল বাদ্যকর । দাদু একটু রাগারাগি করবার চেষ্টা করেছিলেন বটে এবং রাশভারী সেই পুরুষ-সিংহের আধিপত্যও ছিল নিরঙ্কুশ । কিন্তু তবু এক বিপুল গণভোটে তিনি ভেসে গেলেন । বাড়িসুদ্ধু সবাই তখন পুজোর পক্ষে ।

সন্ধেবেলায় বোধন হয়ে গেল । সারারাত বাড়ির সবাই পুজোমণ্ডপের সাজসজ্জায় ব্যস্ত রইলেন । আমরা ছোটরা যথাসাধ্য জেগে রইলুম, এবং খাওয়া-দাওয়ার কথা ভুলে গিয়েই । অনেক রাতে জেঠিমা এসে নড়া ধরে ধরে সবাইকে টেনে নিয়ে গিয়ে একপাতে বসিয়ে খাইয়ে না দিলে খাবার কথা হয়তো মনেই পড়ত না । তারপর 'আমাদের বাড়িতে পুজো হচ্ছে' এই আনন্দে প্রবল উত্তেজনা বুকে নিয়েই একে-একে যে-যেখানে পারি শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তে লাগলাম । সকালে ঘুম ভাঙল ঢাকের বাদ্যিতে । দুর্গার অধিবাস । ধূপ-ধুনো, চন্দন, ফুলের গন্ধ বাড়ি মাত করছে । সকালেই স্নান করে বাড়ির মেয়েরা পুজোর সাজে সেজেছে । সকলকেই মনে হচ্ছে দশভূজা । সকলের মুখেই যেন প্রতিমার আদল ।

চারটে দিন এক অবিশ্বাস্য স্বপ্নের ভিতর দিয়ে কেটে গেল । আমাদের দেড়হাত দুর্গাপ্রতিমা দেখতে পথচারীরা ভিড় করেনি বটে, কিন্তু আমরা মণ্ডপ ছেড়ে বড় একটা নড়িনি । সেই আমাদের বাড়িতে দুর্গাপুজোর প্রচলন হল ।

মাত্র কয়েক বছর পরেই দেশ ভাগ । ভিটেমাটি ছেড়ে লাখো লোক রওনা হল পশ্চিমে । একটু দেরিতে আমরাও । অনেক কিছুই যেমন ফেলে আসতে হল, তেমনই ফেলে এলুম পারিবারিক দুর্গাপুজোকেও। কিন্তু সেই কয়েকটি বছরের দুর্গাপুজোর স্মৃতি, নদীর চর, কাশফুল, আর নীল আকাশের পটভূমি নিয়ে আজও চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে ।

পটের পুজো

অশোককুমার কুণ্ডু

বীরভূম জেলার নানুর থানার হাট-শেরাণ্ডি গ্রাম। বোলপুর থেকে বাসে যাওয়া যায়। বাস-স্টপ থেকে বড় একটা মাঠ পেরিয়ে মাইলখানেক দূরে বেশ পুরনো আর বর্ধিষ্ণু গ্রাম এটি। পুজোও বেশ প্রাচীন। এ-গ্রামের পটের পুজোও পুরনো আর পুজোর সমস্ত প্রথার মধ্যেই আছে সাবেকি ঢঙ। এমনকী, দুর্গার পট যাঁরা তৈরি করেন তাঁরাও পুজোর পনেরো-কুড়ি দিন আগে থেকেই বসে যান পট বানাতে। এ-গ্রামে এখনও পটের দুর্গা হয় ৬ টি। প্রায় সবই তৈরি করেন সূত্রধর পরিবার।

হাট-শেরাণ্ডি গ্রামের বৃদ্ধ পুজারি ব্রাহ্মণ ব্যোমকেশবাবু জানালেন, "এ গ্রামে প্রচুর শিবালয় (শিব মন্দির, শিবের স্থান) আছে। এরকম একশো দশটি শিবালয়ে নিত্য পুজো হয়। পটের দুর্গার সংখ্যা আগে বেশি ছিল। এখন অবশ্য দিন বদলেছে, তাই মূর্তি গড়ে পুজোর চলনও বেড়েছে। তবে বনেদি পুজো, যা পটেই হত, এখনও তা চলে আসছে। মাটির দুর্গার পুজো আগে এ-গ্রামে হত প্রায় চল্লিশটি। এখন কমে গেছে, মাত্র কুড়িটি।" কমে যাওয়ার কারণ জানতে চাইলে বললেন, "লেখাপড়া শিখে চাকরি পেয়ে ছেলেরা বাইরে চলে যাচ্ছে

পটের দুর্গা *ফোটো দীপক ভট্টাচার্য*

গ্রাম ছেড়ে। ফলে গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ কমছে। আর পারিবারিক পুজোয় পড়ছে ভাটা। তা ছাড়া একার পক্ষে পুজোর খরচ চালানোও অসুবিধে।" "তা হলে তো সর্বজনীন পুজোর সংখ্যা বাড়া উচিত।" এ-গ্রামের দক্ষিণ পাড়ার শ্যাম ঘোষ জানালেন, "গ্রামে একটাই সর্বজনীন দুর্গাপুজো হয় দক্ষিণ পাড়ায়। প্রায় দশ বছর চলছে এই পুজো।" এ-গ্রামে পটুয়া শিল্পীদের মধ্যে জীবিত শিল্পী কালীপদ সূত্রধর। সাত পুরুষ ধরে তাঁরা এখানে আছেন। বাবা শিবরাম সূত্রধর

শিল্পী আঁকছেন মা দুর্গার পট *ফোটো দীপক ভট্টাচার্য*

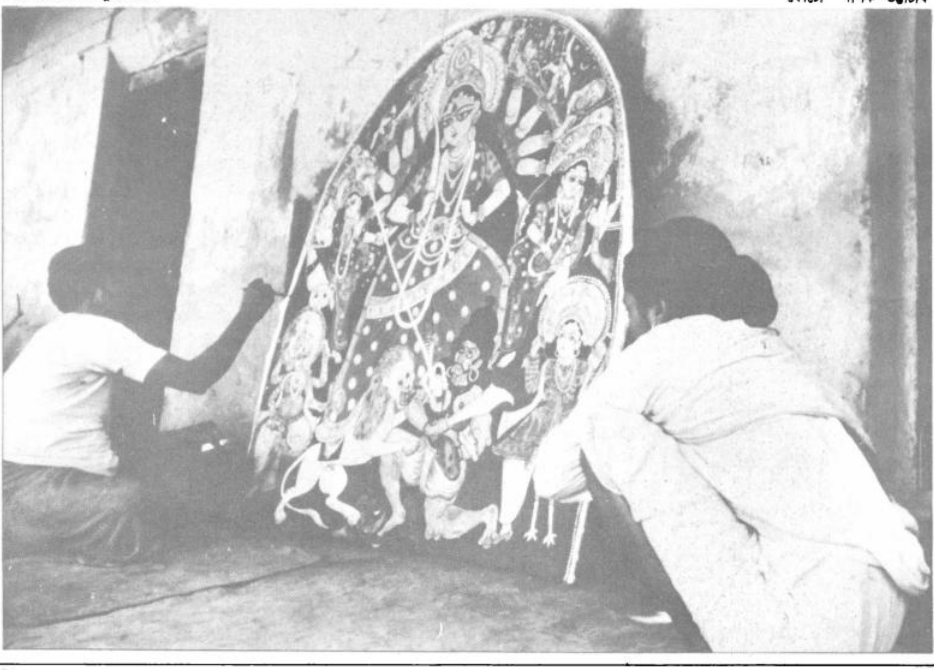

তুলির সূক্ষ্ম কাজ *ফোটো বাদল পাল*

ওড়িশার পটচিত্রীর আঁকা মা দুর্গা *ফোটো সোমনাথ ঘোষ*

শিখিয়েছিলেন এ-কাজ। কালীবাবু পট আঁকা ছাড়া মূর্তিও গড়েন। যেমন এ-বছর বিশ্বনাথ ব্যানার্জির বাড়িতে মাটির দুর্গা তৈরি করছেন কালীবাবু। কালীবাবুর বয়স ৭৮। শিরদাঁড়া বেঁকে গেছে। সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁটেন। শরীর ও মন দুটোই এখন সচল সবল। বিশেষ করে পট আঁকার সময় দুর্গা পুজোর ঠিক আগে-আগেই। কালীবাবুর কথায়, "৬-৭ খানা পট লিখতে (আঁকতে) হয়। সেটা এমন কিছু কঠিন কাজ নয় আমার কাছে। কারণ পটের কাজ ভারী (কায়িক পরিশ্রমের) নয় ততটা। মাটির প্রতিমা গড়তেই বেশি পরিশ্রম হয়। তাই মাটির কাজে আগে হাত লাগাই। মূর্তি গড়ায় হাত দিই প্রায় এক মাস আগে। একমেটে দু'মেটে হয়ে গেলে সমস্ত কাজ নিজের হাতে চলে আসে। এখন বয়স হয়েছে,তাই বেশি পরিশ্রম করতে পারি না। এখন মাটির প্রতিমা গড়ার সময় আমার সঙ্গে তিন-চার জন লোক কাজে সাহায্য করে। রং ও চক্ষুদান অবশ্যই আমি নিজে করি। এ-গ্রামের বেশির ভাগ মূর্তি আর পট আমিই করি। আমার ছেলেও পট লেখে। তবে ওদের যা সময় লাগে এই বয়সে এখনও আমি ওদের থেকে অনেক তাড়াতাড়ি পট লিখি।"

প্রশ্ন করি, "পট লেখার আগে মনে-মনে ভেবে নেন না ?" মৃদু হেসে কালীবাবু জানালেন, "তা ভাবতে হয় বইকী। পুজোর আগেই মনের মধ্যে মা-দুর্গার মুখ ভেসে ওঠে। পটের কাজটা শুরু করি পুজোর দিন-পনেরো আগে। কিন্তু তার আগে জিনিসপত্র জোগাড় করে নিই।

"প্রথমে যে কাপড়ে পট লেখা হবে সে কাপড় সেঁটে নিই বাঁশের ফ্রেমে। নতুন বাঁশের বাতার ফ্রেম করে নিই প্রথমে। তারপর পলি মাটি মিহি করে চেলে নিয়ে জল দিয়ে গোলনা তৈরি করি। এই কাদার গোলনায় চিট করার জন্য তেঁতুল বীজের কাই (গরম জলে ফুটিয়ে বের করতে হয়) মিশিয়ে নিই। তারপর বাঁশের বাতায় কাপড় গেঁথে নিই। কাপড় শুকিয়ে গেলে এবার হবে আঁকার কাজ।

"এর পর রং তৈরি। বাজার থেকে গুঁড়ো রং কিনে এনে তা মেড়ে রং তৈরি করতে হয়। ভাল আঠা দিয়ে রং গুলতে হয়। না হলে কাপড়ের ওপর রং থাকবে না। রং তৈরি হলে তুলি দিয়ে আঁকতে হবে। তুলি তৈরি হয় ছাগলের ঘাড়ের লোম দিয়ে। তুলি বাঁধা বেশ কঠিন কাজ। কারণ তুলি ভাল না হলে কাজও ভাল হবে না। সারাদিন পরিশ্রম করে দুটোর বেশি তুলি বাঁধা যাবে না। এরকম কুড়ি-পঁচিশটি তুলির মধ্যে একটি হবে চাঙ্গা (সবচেয়ে ভাল) তুলি। সব থেকে সরু আর চাঙ্গা তুলি দিয়ে হবে চক্ষুদান। আমার বাবা খুব ভাল তুলি বাঁধতে পারতেন।"

হাট-শেরাণ্ডি গ্রামে পটের দুর্গা হয় দুর্গাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, রাম পাল, ওস্বাদাস মণ্ডল, জগন্নাথ রায়, ভূপতি মণ্ডল ও নীলমণি দে'র বাড়িতে। তবে দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ির পুজো প্রায় ২০০ বছরের পুরনো। এ-বাড়িতে ঠাকুরদালানে পটে দুর্গাপুজো হয়। বিজয়ার দিন দু-একজনের বাড়ি ছাড়া অন্য সবাই পট বিসর্জন দেন। দুর্গাবাবুদের বাড়িতে নতুন পট স্থাপনের পর গতবারের পট বিসর্জন দেওয়া হয়। রাম পালের বাড়ির পট আধুনিক। ক্যানভাস কাপড়ের ওপর তেল রঙে এঁকেছেন দুর্গাপুরের শিল্পী। দশ বছর ধরে এই পটে পুজো চলে আসছে। এ-পুজোয় বলি হয়। সবচেয়ে মজার ঘটনা হল, দুর্গাবাবুদের বাড়ির আঁকা পট পরের বছর হুবহু একই। রঙের উজ্জ্বলতার সামান্য রকমফের ঘটতে পারে,কিন্তু ঠাকুরের মুখ-চোখ আদল একই। কোনও বদল ঘটে না। মূল প্রতিমার পিছনে থাকে চালচিত্র। ছ-সাত পুরুষ ধরে একই প্রতিমা এঁকে আসছেন এই পটুয়া শিল্পীরা। কালীবাবু জানালেন, "আমার চোখ বেঁধে দিলেও আমি এই পট লিখতে পারব।"

পুজোর ছুটি

অশোককুমার মিত্র

পুজোর ছুটি মানে এখন শুধুই ছুটোছুটি,
কেউ বা ছোটে সিমলা পাহাড়, কেউ বা ছোটে উটি।
কেউ ছুটেছে চিল্কা-পুরী—গোপালপুরে কেউ,
লক্ষ হিরের মুকুট পরে ভাঙছে পাড়ে ঢেউ।
তোপচাঁচি কেউ শিমুলতলা কেউবা নেতারহাটে,
কেউ বা ছোটে বারাণসীর দশাশ্বমেধ ঘাটে।
সারাণ্ডাতে কেউ বা ছোটে জঙ্গলে পথ ঢাকা,
চলতি পথে বাঘ-ভালুকের চরণচিহ্ন আঁকা।
আরাবল্লী-রাজস্থানে দুর্গ-মরুর দেশে,
কেউ ছোটে ফের আন্দামানে সাগর জলে ভেসে।
কাশ্মির কি মহীশূর কি সবুজ মালাবারে
ইতিহাসের উজ্জয়িনী—শিপ্রা নদীর ধারে।
বাক্স গোছাও, আসন রিজার্ভ···নানান হুটোপুটি,
ক্যালেন্ডারের পাতায় যখন আসে পুজোর ছুটি।

পুজোর ছুটি তখন ছিল সত্যিকারের ছুটি,
অঢেল সময় ছুটির মাঝে করত লুটোপুটি।
পদ্মবনে দোল দিয়ে ফের কাশের বনে যাওয়া
ধানের খেতে দোল খেত সেই শরৎকালের হাওয়া।
নীল আকাশে ভাসত তখন মেঘের ভেলা দেদার,
সময় ছিল মিল ঘটানোর—হৃদয় এবং মেধার।
সময় ছিল ট্রেন স্টিমারে দেশ গাঁয়েতে ফেরায়
নদীর ধারে ডিম খুঁজতে ভুঁই-কাছিমের ডেরায়।
শিউলি ফুলে ছুপিয়ে কাপড় পুজোর দিনে পরা,
কিংবা মেলায় দল বেঁধে সব নাগরদোলায় চড়া।
জীবন ছিল শান্ত তখন, সময় ছিল একার,
ভালবাসার সঙ্গে ছিল গভীরভাবে দেখার
কেমন করে ফুটছে তারা একটি থেকে দুটি
আকাশ ভরা ; তখন ছিল এমনি পুজোর ছুটি ॥

থাকব পুজোয় গ্রামে

হিমাংশু জানা

থেকে থেকে আমলকী বন উঠছে কেঁপে দিঘির পাড়ে,
হাওয়ার ডানায় ভর করে মেঘ যায় সফরে দূর পাহাড়ে।
মাচায় শুয়ে জেগে জেগে স্বপ্ন দেখে বিষাণলতা,
চন্দনা শিস দিয়ে চলে, ফুরোয় না টুনটুনির কথা।

চেয়ে আছে খোশমেজাজে পথের পানে হাসনুহানা,
ফুটি ফুটি টগরশাখায় কুঁড়ি তো নয়, নকুলদানা।
পাখনা লেগে প্রজাপতির ঝুমকোজবার নোলক নড়ে,
রঙ্গনে রঙ ধরতে কি চায়, স্বর্ণচাঁপায় সোনা ঝরে।

ব্যাকুল বকুল, শিউলির সাজ হয় না আদৌ মনের মতো,
রইল না আর ফুটতে বাকি শালুক ছিল ডোবায় যত।
ভুলেই গেছে মাছরাঙারা হঠাৎ যেন খুঁজতে আহার,
মাধবী আর মালতীকে লজ্জা পাওয়ায় বেগমবাহার।

রাজহাঁসেরা সারাবেলা কী বকে কে কইতে পারে!
ছোঁয়ায় বাউল সুরের জাদু একতারাটির জীর্ণ তারে।
কে বোল তোলে মন্দিরাতে, কী এক পাখি গেল ডেকে,
বেড়ায় কদম ফুলে ফুলে মৌমাছিরা কেশর মেখে।

শান্ত নদীর শান্ত জলে গান ধরেছে কান্ত মাঝি,
ধানের খেতের সবুজতায় হারিয়ে যেতে কে-না রাজি!
আশশেওড়ায় আড়াল করে বাঁশের দিঘল ছায়া নামে।
কোথাও নয় যাওয়া-টাওয়া, থাকব পুজোয় এবার গ্রামে।

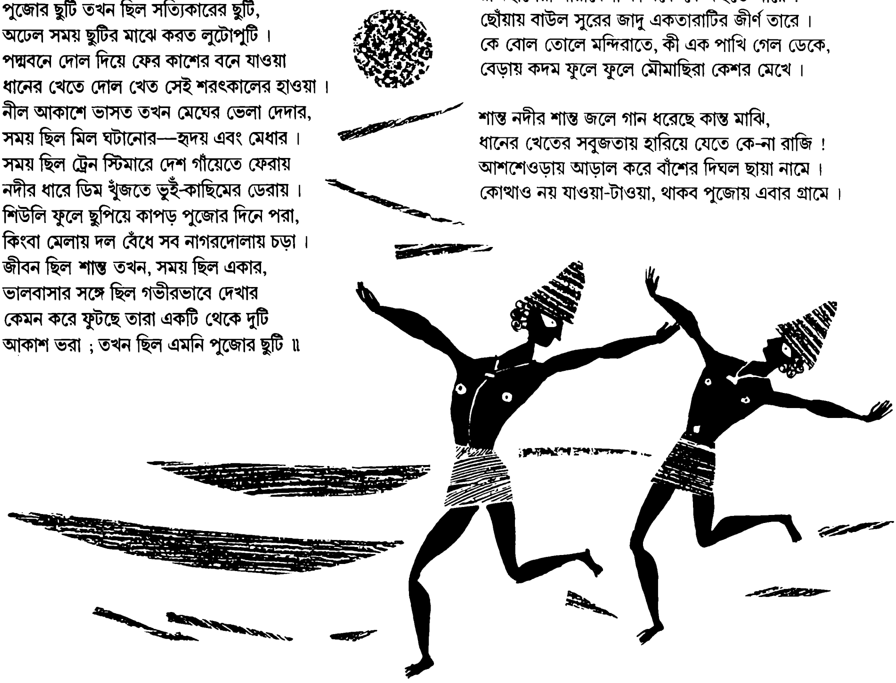

ছবি সুব্রত চৌধুরী

বাদ্যি বাজে বুকের কাছে

শ্যামলকান্তি দাশ

সকাল থেকে বাইরে ঘরে
হুলুসথুলুস করছে ভুলো,
সিঁড়ির উপর ছড়িয়ে আছে
বীজগণিতের অঙ্কগুলো।
বাগানে কেউ রঙ ঢেলেছে
দুলছে ছবি ক্যাংলা গাছে,
ঘিন্‌চিকুড়ি ঘিন্‌চিকুড়ি
বাদ্যি বাজে বুকের কাছে।
শ্রীল শ্রীযুত বাবুইবাবু
একলা-একা ঘরের কোণে,
সকাল থেকে বাংলা খাতায়
ছুটির দিনের হিসেব গোনে।
জানলা দিয়ে বাড়ায় গলা
চিরঅচিন একটি পাখি
"বাবুইবাবু, আমার কাছে
একটুখানি আসবে নাকি ?"
সন্ধে হতেই ফটফটিয়ে
ফটিকসাদা জোছনা ওঠে,
সাঁকোর ধারে অন্ধকারে
ভূতের ছানার নয়ন ফোটে।
ঘরের পাশে নাম-না-জানা
শান্ত নিঝুম নদীর জলে,
দুগ্‌গা মায়ের মূর্তি নিয়ে
তিরতিরিয়ে নৌকো চলে।

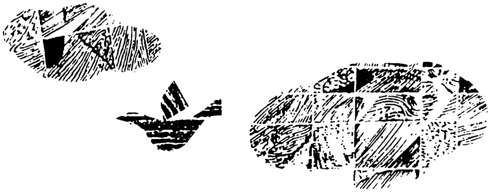

ছবি সুব্রত চৌধুরী

এই কটা দিন

রতনতনু ঘাটী

আগমনী, তুই পুজোয় এবার থাকবি না কেন গ্রামে
দিদির বাড়িতে যাবি,
আকাশ যখন নীল হয়ে নেমে রাখাল বালক সাজে
সে-খেলা কি খুঁজে পাবি ?
তা না হয় যদি পেয়ে যাস তুই রুম-ঝুমঝুম নদী
কলকে ঝোপের বাঁকে,
তুই দেখে নিস আমার মতন ভাসায় কি কেউ ফুল—
হাতছানি দিয়ে ডাকে।
ষষ্ঠীর দিন এবার তা হলে দিতে পারব না তোকে
কাচপোকা ফলে টিপ,
সারা সন্ধেটা কাটবে এবার একা-একা ঘুরে-ঘুরে
আকাশে জ্বলবে দীপ।
সপ্তমী ভোরে ভুল করে আমি তোদের বাড়িতে গিয়ে
ডেকেও পাব না যেই—
দু' পকেট ভরা নারকোল-নাড়ু নদীতে ফেলব ছুঁড়ে
ডাকব না কাউকেই।
অষ্টমী এলে মা বানাবে বসে খই-মুড়কির মোয়া,
বলব না, দুটো দাও।
দিদির বাড়িতে তোরও তখন ভাল লাগবে না জানি
বলবি, খাব না, যাও।
তোর মনে নেই নবমী-দশমী বঁইচি টু কাশদিঘি
ঘুরে বেড়ানোর মজা,
বাবলু ও বেলা এবার কেমন শিউলি কুড়োবে কত
কিনে খাবে জিবেগজা।
এবার পুজোতে মামার বাড়িতে আমার যাবার কথা
আমি যাচ্ছি বা কই,
মাকে তো বলেছি, এই ক'টা দিন দুষ্টুমি করব না
ইতিহাস পড়বই।
ফাইভে পড়িস, ছোট নাকি তাই, কাউকেই বললি না,
যাব না তো কিছুতেই—
সেভেনে পড়ছি, সবকিছু দোষ আমার একার শুধু
তোর কোনো দোষ নেই ?

গলির 'গাভাস্কর', পার্কের 'পেলে' টপ-স্কোর করবেনই যদি এটি মেলে...

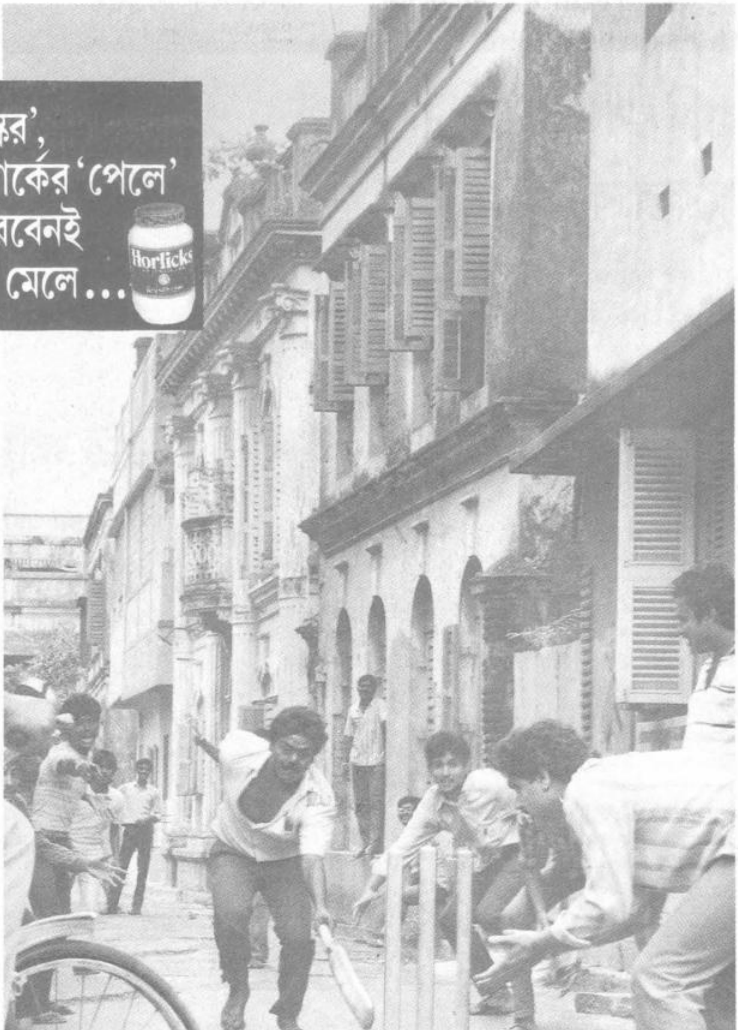

ইঁটের বা চটির উইকেট, 'ক্যাম্বিস' বল, দেওয়ালে লাগলে ছক্কা, পাঁচিল পেরোলে আউট্। গলির ক্রিকেট। আর জামা দিয়ে গোল পোস্ট—রবারের ফুটবল, তাই দিয়েই হ্যাট্রিক।

ঘরে ফিরে কিন্তু দুরন্তপনা শেষ। তখন চাই মায়ের হাতে গরমাগরম গেলাস ভরা হরলিক্স। নইলে চুনী, নঈম, শ্যাম থাপা বা বথাম, পেলে, পতৌদিরা বড় হবে কি করে!

তাই কলকাতার দুরন্ত ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে হরলিক্স-ঘরে ঘরে ফুর্তি বাড়িয়ে, পুষ্টি যুগিয়ে, সেঞ্চুরি পার করে, অনেক খেলায় বিজয়ী হয়ে।

কলকাতা
১৬৯০-১৯৯০

প্রাণের শহর কলকাতায়, পুষ্টি যোগায়, মনমাতায়, হরলিক্স

HTA 3792

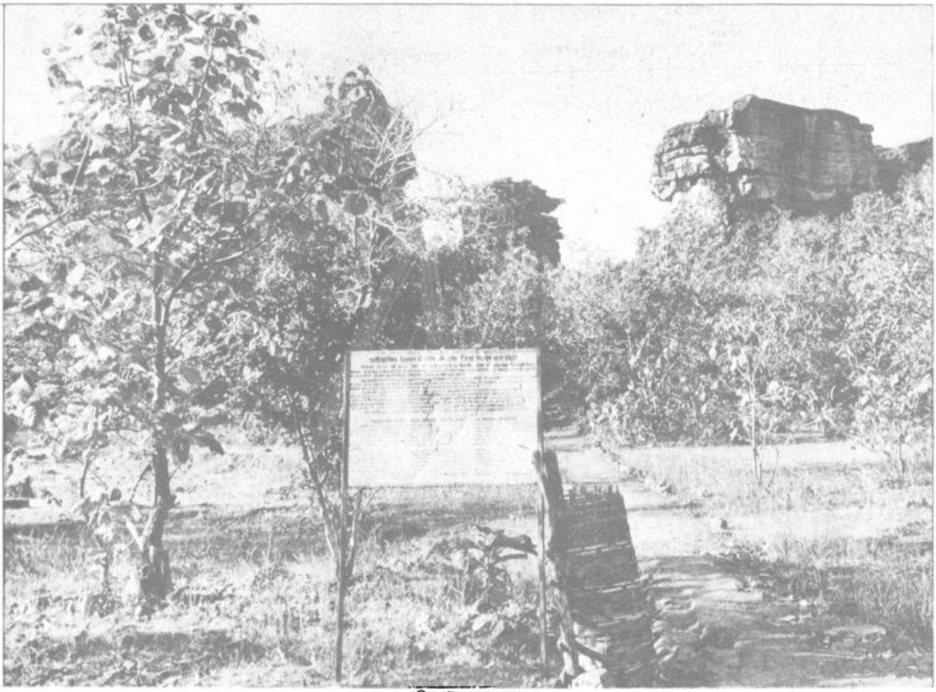

ভীমবেটকার প্রবেশপথ

প্রাগৈতিহাসিক মানুষের গুহাচিত্র

কমলেন্দু সরকার

একটা পাহাড়ি অঞ্চল কিংবা বিশাল একটা এলাকা জুড়ে বিভিন্ন গুহায় ছবি আঁকত আদিম মানুষেরা। গ্রীষ্মের ভয়ঙ্কর গরম, বর্ষার তুমুল বৃষ্টি আর শীতের কনকনে হাওয়ায় তুমুল হইহল্লায় ছড়ানো-ছিটনো গুহাগুলোয় শুরু হয়েছিল ছবি আঁকার চর্চা। কোনওটা খ্রিস্টপূর্ব দশ হাজার বছরের কথা। আবার কোনওটা খ্রিস্টপূর্ব ছ' হাজার কিংবা পাঁচ নয়তো চার হাজার বছরের ব্যাপার।

মানুষ ছবি আঁকতে শিখল কবে থেকে? মোটামুটিভাবে বলা যায়, এখন থেকে পঁচিশ্-তিরিশ হাজার বছর আগে, প্রস্তরযুগে। যে যুগে মানুষ জানত না ধাতুর ব্যবহার। আত্মরক্ষা করত পাথরের হাতিয়ারে। মানুষ তখনও শেখেনি ঘরবাড়ি বানাতে। ওরা বাস করত পাহাড়ের গুহায়। তাই ওদের নাম 'গুহামানুষ', ইংরেজিতে যাকে বলে 'কেভম্যান'। ওরা জানত না চাষবাস। শিকার আর জঙ্গলের ফল সংগ্রহ ছিল ওদের প্রধান কাজ। সারাদিন শিকার। আর শিকার মিললে পাওয়া যেত অখণ্ড অবসর। এ ছাড়া প্রকৃতিও ছিল প্রতিকূল। হয়তো ছিল একটানা শীতের দিন, নয়তো তুষার-ঝড়। তাই গুহার ভিতরে সময় কাটাতে নাকি ঘর সাজাতে শিখল ছবি আঁকা। অনেকে মনে করেন, মানুষ তখন ভয় করত প্রকৃতিকে, ভয়ঙ্কর বন্যজন্তুকে। তাই ওদের বশে রাখতে হলে ছবির মধ্যে দিয়ে বন্দী করতে হবে। এই ছিল তাদের বিশ্বাস। সেই কারণে তুলি ধরেছিল গুহামানুষ। আবার অন্য একদলের ধারণা, শিকার করতে করতে ফুরিয়ে যাচ্ছে বন্য পশুর দল। গুহামানুষেরা ভাবল যে এদের যদি ছবি এঁকে গুহাজাত করে রাখা যায়, তবে তো আর ভাবনা নেই। আর বন্য পশুর দল কোনও দিনই উধাও হবে না জঙ্গল থেকে। এই চিন্তাভাবনা থেকেই ওই যুগের মানুষের হাতে ছবি এল। পরে যা ফুটে উঠল পাহাড়ের গুহায়। কখনও বা পাহাড়ি আবাসে।

প্রাগৈতিহাসিক কালের ওই সব গুহামানুষ ছবি আঁকত কীভাবে? কেননা, যেসব গুহায় ছবি পাওয়া গেছে তার বেশির ভাগই অন্ধকার। আর গুহা যে অন্ধকার থাকবে, এ তো জানা কথা। তাই অনেকে মনে করেন, ছবি আঁকবার সময় গুহার ভেতরে আগুন

জ্বালাত তারা। তারই আলোয় চলত গুহা-চিত্রকরদের শিল্পচর্চা। অনেক জায়গায় ছবি আছে পাহাড়ের গায়ে, বাইরে। সেখানে পাহাড়ের গায়ে এসে পড়া সূর্যের আলোয় ছবি আঁকত গুহামানুষেরা। যেমন, স্পেনের পূর্ব উপকূলে যে সমস্ত গুহাচিত্র পাওয়া গেছে, সেগুলো কিন্তু অন্ধকারে আঁকা নয়। পাহাড়ের গায়ে সূর্যের আলোয় আঁকা ওই সব ছবি।

গুহাচিত্র প্রথম পাওয়া যায় কোথায়? স্পেনের আলতামিরা গুহায়। ১৮৬৮ সালে এক শিকারি আবিষ্কার করেন স্পেনের এই গুহাচিত্র। এর সাত বছর পর অর্থাৎ ১৮৭৫ সালে মার্সেলিনো নামে এক ইঞ্জিনিয়ার এখানে আসেন। তিনি অনেক কিছু খুঁজে পান এখানে। এর পর ১৮৭৯-র গ্রীষ্মে আবার এখানে আসেন। এবারে সঙ্গী তাঁর ছোট মেয়ে মারিয়া আর এক ভূ-অধ্যাপক ভিলানোভা। মারিয়া এখানে এসে দেখেছিলেন গুহার ছাদে আঁকা এক ষাঁড়ের ছবি। ১৮৮০ সালে মার্সেলিনো একটি ছোট বইয়ে প্রকাশ করলেন এইসব কথা। খ্রিস্টপূর্ব তিরিশ থেকে দশ হাজার বছর আগের এই ছবিগুলো গুহামানুষদের আঁকা কি না, এর স্বীকৃতি মিলেছিল বহু বছর বাদে, বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর। এ ছাড়াও ফ্রান্সেও রয়েছে বহু গুহাচিত্র।

আমাদের দেশেও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে বহু গুহাচিত্র। তবে সবচেয়ে বড় আর পুরনো হল ভীমবেটকা। ভীমবেটকা নামটা শুনলেই মহাভারতের কথা মনে পড়ে যায়। সত্যিই, তাই আসল নাম ভীমবৈঠকা। ওখানকার স্থানীয় মানুষদের বিশ্বাস, জায়গাটা নাকি ছিল পঞ্চপাণ্ডবের দ্বিতীয়জন অর্থাৎ ভীমের বসবার জায়গা। নাম তাই ভীমবৈঠকা। পরিচিতি কিন্তু ভীমবেটকা নামেই। কাছেই ভিয়াপুর। আসল নাম ভীমপুর। কাছের গ্রাম পাণ্ডবাস। কিছুটা দূরে নদী, বেতোয়া। পাণ্ডবরা অজ্ঞাতবাসের দিনগুলো এখানে কাটিয়েছিলেন কি না জানা নেই, তবে এখানে যে আদিম গুহা-মানুষদের বাসস্থান ছিল তার অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে।

ভোপালের রেল লাইনের গা ঘেঁষে চলে গেছে জাতীয় সড়ক। রাস্তার দু'ধারে এলোমেলো পাহাড় আর জঙ্গল। মাঝে-মাঝে দেখা যায় ভুট্টা আর গমের খেত। ভোপাল থেকে বাহান্ন কিলোমিটারের পথ ওবায়দুল্লা। সেখান থেকে ন' কিলোমিটার দূরে ভীমবেটকা। বিন্ধ্য পর্বতমালার উত্তর ভাগ। জঙ্গলে ঢাকা।

গুহাচিত্রে বাইসন

হালকা জঙ্গল আর পাহাড়ি গুহাগুলো বেড় দিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে। দেখলে মনে হয়, মধ্যযুগীয় কোনও এক দুর্গ। এই জায়গাটা ছিল এক লক্ষ বছর আগে প্রাগৈতিহাসিক মানুষদের দখলে। তবে ওরা আঁকতে শিখেছিল নব্বই হাজার বছর পর কিংবা তারও আগে। এঁকেছিল বন্য পশু, নাচের ছবি, শিকার-দৃশ্য, যুদ্ধ, আরও অনেক কিছু। এই ছবিগুলো শুধুমাত্র আমাদের দেশের চিত্রসম্পদ নয়। এ থেকে বোঝা যায় আদিমকালের মানুষজনের জীবনযাত্রা। সেই সময় এ-অঞ্চলে দেখা যেত, নিষাদ, শবর, পুলিন্দা, বানর প্রভৃতি অনার্য জাতির।

এখনও রয়ে গেছে বিচিত্র সব উপজাতি। গোন্ড আর কোরকু। অদ্ভুত এদের আচার-ব্যবহার আর জীবনধারা। চাষবাসের চেয়েও ভালবাসে শিকার। ব্যবহার করে কাঠের বা বাঁশের তৈরি অস্ত্র। জঙ্গলে নানা ধরনের ফল সংগ্রহ করে। পুরনো বিশ্বাসে এখনও ছবি আঁকে পাহাড়ের গায়ে।

ভীমবেটকার পাহাড়ি অঞ্চলের বিস্তৃতি দশ কিলোমিটার। এখানকার অধিকাংশ গুহা কিংবা পাহাড়ি আবাসে আলো পাওয়া যায় প্রচুর পরিমাণে। তাই মনের আনন্দে ছবি এঁকে গেছে সেই গুহামানুষেরা। তবে ছবি আঁকিয়ে গুহামানুষদের এক লক্ষ বছর আগের মানুষদেরও খোঁজ পাওয়া গেছে ভীমবেটকায়, যা লোয়ার প্যালিওলিথিক যুগের কথা। এই সময়ের হাতিয়ার পাওয়া গেছে ভীমবেটকার রোমান তিন এফ ২৪ আর রোমান তিন এ গুহায়। তবে ভীমবেটকায় বেশি পরিচিত আপার প্যালিওলিথিক আর মেসোলিথিক যুগ, যার সময়কাল কুড়ি হাজার থেকে আড়াই হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দ। ভীমবেটকা গুহা-বিশেষজ্ঞ যশোধর মতপাল-এর অভিমত। এখানে গুহা আর পাহাড়ি আবাসের সংখ্যা এক হাজার বা তারও বেশি। ছবি অগুনতি। প্রত্যেক দেশেরই গুহাচিত্র আবিষ্কারের পিছনে একটা করে গল্প আছে। কোথাও হয়তো খুঁজে পেয়েছে রাখালের দল। আবার কোথাও বাবার সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে তার ছোট্ট মেয়েটি। তেমনি ভীমবেটকার গুহাগুলো খুঁজে পেয়েছিলেন ভি এস ওয়াকানকার। ট্রেনে বেড়াতে বেরিয়ে ১৯৫৭ সালে কোনও-একদিন দেখতে

পুরনো দিনের পাহাড়ি আবাস

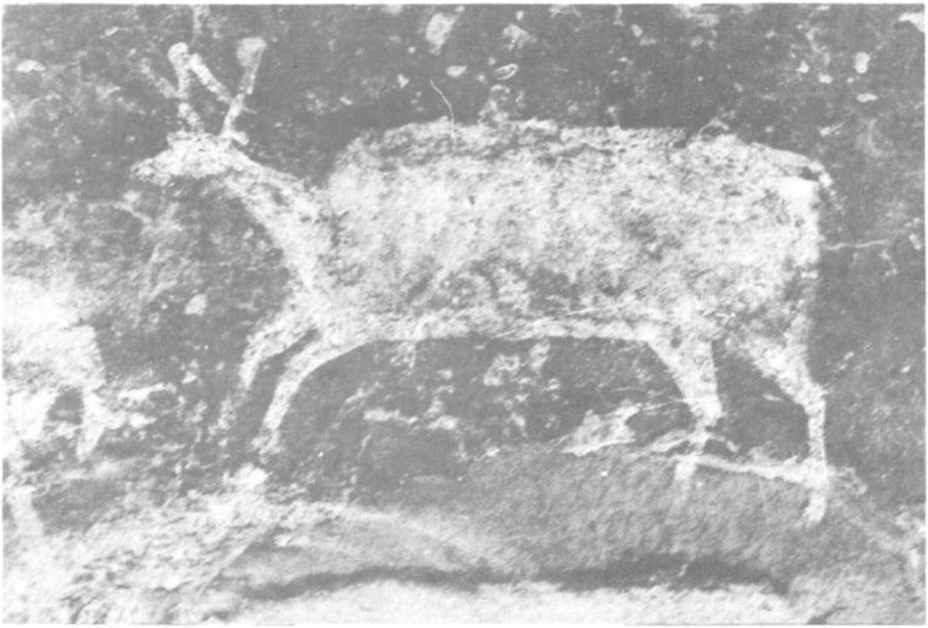

গুহামানুষের শিল্পচর্চার নিদর্শন

পেয়েছিলেন তিনি পাহাড়ের গায়ে ছবির ভাষায় প্রাগৈতিহাসিক মানুষদের জীবনধারা।

সবুজ গাছগাছালির মধ্যে দাঁড়িয়ে বিশাল বেলেপাথরের পাহাড়। গা ছমছমে রহস্যময় পরিবেশ এই বাইশশো ফুট উঁচু পাহাড়ের মাথায়। যেখানে একসময় ঘুরে বেড়াত গুহামানুষের দল। জানা যায়, মেসোলিথিক যুগে ভীমবেটকায় ছিল মৌসুমি আবহাওয়া। সুন্দর বৃষ্টি ছিল। ছিল না শীতের কনকনে ঠাণ্ডা। জঙ্গলে ছিল প্রচুর পশু। গাছে-গাছে ফলপাকুড়। এইরকম পরিবেশে গুহা মানুষেরা শিকার করত। সংগ্রহ করত ফল, ছবিও আঁকত। ভীমবেটকার গুহায়-গুহায় ছবি। এখানে-ওখানে ছড়িয়ে থাকা পাথরের গায়েও ছবি আঁকা। এদের রঙের ব্যবহার ছিল লাল আর সাদা। তবে অনেক ছবিও আছে যার রং নীলচে সবুজ আর হলুদ। ওরা রঙের সঙ্গে ব্যবহার করত জল, বন্যপশুর হাড় বা শিঙের আঠা, নয়তো চর্বি। ছবি আঁকবার তুলি তৈরি হত লতাপাতার কাঠি, থেঁতলানো বা মুখে চিবনো ডালপালা দিয়ে। কিছু-কিছু সময় ব্যবহার করত হাতের আঙুলও। আবার দেখা গেছে, মুখের মধ্যে গোলা রং পুরে তা ছিটিয়ে পাহাড়ের দেওয়ালে কিংবা ছাদে রং করেছে।

প্রথম যুগে গুহামানুষেরা আঁকত মানুষ আর পশুর রেখাচিত্র। মাঝেমধ্যে রং দিয়ে ভরাট করত ওই সমস্ত রেখা। পরে ছবির মানুষ আর পশুর দেহকে সাজাত জ্যামিতিক আদলে, জাফরিকাটা নকশা আর ঢেউখেলানো রেখায়। এখানকার গুহামানুষেরা মানুষের চেহারাগুলো এঁকেছে কাঠের ছড়ি বা লাঠির আদলে, অথচ বন্যপশুদের ছবিগুলো খুব যত্নে আঁকা আর অনেক বেশি জীবন্ত। ভীমবেটকায় গুহাচিত্রের বিচিত্র সমাবেশ। শিকার-দৃশ্য, নাচ, হাতির পিঠে মানুষ, ঘোড়সওয়ার, নানান জীবজন্তুর মারামারি, ফলসংগ্রহ, মুখোশ-পরা মানুষ, মেলার ছবি, যুদ্ধের ছবি, ঘর-সংসারের দৃশ্য। কী নেই সেখানে! তবে সবচেয়ে বিশেষ যে ছবিটি, সেটি হল তিনতলা সমান উঁচু পাহাড়ের গায়ে আঁকা পৌরাণিক বরাহ। এত ওপরে ছবিটি আঁকল কীভাবে? দেখে চমকে যেতে হয়। আর-একটি ছবি আছে যা চোখে পড়ার মতো, তা হল, একটি ছুটন্ত ঘোড়া। ছবির মাঝে-মাঝে আরও একটি জিনিস চোখে পড়ে, তা মানুষের হাতের ছবি।

এখান থেকে দূরে দেখা যায়, ভোঁরাওয়ালি পাহাড়ের সারি। এখানেও রয়েছে গুহাচিত্র। ভোঁরাওয়ালির পাহাড়ি আবাসগুলো একটু ছোট। মেঝেগুলো ঝকঝকে পরিষ্কার আর মসৃণ। এখানকার ছবিতে লাল, সাদা আর গেরুয়া রঙের ব্যবহার বেশি। এবড়ো-খেবড়ো পাথরের গায়ে ছবি আঁকা। ছবি প্রচুর কিন্তু একই বিষয় নিয়ে বারবার আঁকা হয়েছে ছবিগুলো। হাতি, হরিণ, বুনো শুয়োর আর বাইসনের ছবিই বেশি দেখা যায়। যুদ্ধের দৃশ্যগুলো নিপুণভাবে আঁকা। পদাতিক-সৈন্যদের হাতাহাতি যুদ্ধের দৃশ্য যেমন আছে, তেমনই ঘোড়ার পিঠে যুদ্ধরত সৈন্যও আছে।

ভোঁরাওয়ালি পাহাড় থেকে নেমে কিছুটা দূরে বড়িঝিলির গুহা। এখানকার রাজগন্দ আদিবাসীদের কাছে জায়গাটার পরিচিতি রংমহল নামে। ভোঁরাওয়ালি আর বড়িঝিলের গুহাচিত্রগুলো প্রায় একইরকম। তবে বড়িঝিলের গুহায় সবচেয়ে বেশি যুদ্ধের দৃশ্য। ঘোড়ার পিঠে রয়েছে জিন চাপানো। মুখে লাগাম। আর ঘোড়সওয়ারটির মাথায় পাগড়ি। বাবরি চুল। বাঁ হাতে নকশাকাটা তলোয়ার। আবার অনেকের হাতে রয়েছে

নকশাকাটা ঢাল। পদাতিক-সেনাদের হাতেও রয়েছে ঢাল আর তলোয়ার। পোশাকের কোমরবন্ধে গোঁজা রয়েছে ছুরি। বুকে বাঁধা রয়েছে বর্ম। শিরস্ত্রাণ দেখে পদাতিক-সেনাদের দুটি দলকে চিনে নেওয়া যায়। একদলের মাথায় টুপি, অন্যদলের মাথায় পালকের মতো আবরণী। এর মধ্যে একটি ছবি একটু অন্যরকম। এই ছবিটিতে দুজন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। মাথায় পালকের টুপি। কানে দুল। অথচ দুজনের শরীরে যুদ্ধের কোনও পোশাক নেই। একজনের পোশাক মাটি ছুঁয়ে রয়েছে। অন্যজনের কোমর থেকে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে দু'খণ্ড ওড়না। তাদের হাতে রয়েছে একটি বাদ্যযন্ত্র, আর লম্বা লাঠি কিংবা রাজদণ্ড।

রাস্তা একটাই। উত্তরে হোসাঙ্গাবাদ ছুঁয়ে দক্ষিণমুখো পথটি চলে গেছে ইটারসির দিকে। এর একদিকে জমজমাট আধুনিক শহর। অন্যদিকে পড়ে রয়েছে গুহামানুষদের বাসস্থান আদমগড়। মধ্যপ্রদেশের এই নির্জন জায়গাটি স্থানীয় লোকেদের কাছে খুবই রহস্যময়। প্রাগৈতিহাসিক মানুষের ডেরা বাঁধার প্রমাণ মিলেছে এই আদমগড়ে। গুহাচিত্র ছাড়াও পাওয়া গেছে ব্যবহার-করা বহু হাতিয়ার। গুহবাসে সারি-সারি ছবি। ছবিগুলো আছে আট-ন' ফুট উঁচুতে। যুদ্ধের দৃশ্যও আছে অনেক। পুরুষ-যোদ্ধাদের মাথায় ঝুলছে বিনুনি, ঘোড়ার পিঠে চেপে যুদ্ধ করছে তলোয়ার হাতে। রয়েছে হাতি, বাইসন। গেরিমাটিতে রাঙানো ছবি। অবশ্য সাদা রঙেও আঁকা আছে প্রচুর ছবি।

ভোপাল থেকে বাইশ কিলোমিটার দূরে শহর রায়সেন। সরাসরি বাসে যাওয়া যায়। শহরের পাঁচকিলোমিটার আগে থেকেই দেখা যায় রামছাড়া পাহাড়। ওই পাহাড়ের কাছে চারটি গুহাতেই পাওয়া গেছে বহু ছবি। ছবিতে আছে বুনো শুয়োর, বাইসন, হরিণ। একটি অদ্ভুত ছবি দেখা যায়। গোরুর আদলে সাপের মতো লম্বা শরীর, ঘাড়ে সিংহের কেশর আর সোজা লেজ। আছে অস্ত্র হাতে শিকারের দৃশ্যও। পাশাপাশি পাওয়া যায় একটি ছবি জোড়া বলদে হাল জুড়ে চাষ করছে কৃষকেরা।

রায়গড় শহরের দশ মাইল দূরে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে চোখে পড়বে কবরাপাহাড়ের মালা। ঘন সবুজ জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়টি। তবে এখানকার গুহাচিত্রগুলো অনেকটা উঁচুতে। প্রায় বাইশ ফুট উঁচুতে ছবিগুলো আঁকা। ছবিতে দেখা যায়, হরিণ, বাইসন, কুমির, বাঘ, বানর। পোড়ামাটির মতন লাল রঙে আঁকা ছবিগুলো। কবরাপাহাড়ের গুহাচিত্রগুলো একটু অন্যরকম।

মধ্যপ্রদেশের মোরেনা জেলার পাহাড়গড় শেওপুর কালাম এলাকাতেও পাওয়া গেছে গুহাচিত্র। কার্বন ডেটিং-এ নাকি বোঝা গেছে এগুলোর বয়স পঁচিশ হাজার বছর। এখানকার ছবিগুলোর বৈশিষ্ট্য হল, পুরো গুহাটিই ছবিতে ভরা। এমনকী, ছাদেও আঁকা হয়েছে নানারকম ছবি। এখানে যুদ্ধের দৃশ্য, নানারকম বন্য পশু ও শিকারের ছবি সংখ্যায় বেশি। ছবিগুলো লাল এবং সাদা রঙে আঁকা।

এলাহাবাদ থেকে মির্জাপুর হয়ে সাহাবাদ পর্যন্ত একটানা পাহাড়গুলো দেখলে মনে হয়, যেন এক বিশাল প্রাচীর। মির্জাপুর জেলার সদর শহর আড়াউড়া। স্টেশনও একই নামে। ছোট্ট গ্রামে ৩ কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে পাহাড়, লিখুনিয়া। এই পাহাড়ের বুকে লুকনো ছোট-ছোট পাহাড়ি-আবাসে অজস্র ছবি। এখানকার পাহাড়ের দেওয়ালগুলো বেশ মসৃণ। এক-একটি আবাসে ভিন্ন-ভিন্ন ছবি। কোথাও আছে পদাতিক-সৈন্য। শিকারের দৃশ্য। হাতির পিঠে যুদ্ধের ছবি। কোথাও-বা ফাঁদ পেতে হাতি ধরা হচ্ছে। হরিণ ধরার দৃশ্যও আছে। আবার কোথাও-বা আছে ঘোড়ার পিঠে যুদ্ধরত সৈন্য। বাঘের ছবিও চোখে পড়ে অনেকটা ঢোকরার পুতুলের আদলে। এ ছাড়াও এখানে পাওয়া গেছে আদিম মানুষের ব্যবহার করা অস্ত্র।

একশো বছরেরও আগের কথা। দিনটা ছিল ৫ জুলাই, ১৮৮১। উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুর জেলার বান্দা ছাড়িয়ে জঙ্গলে শিকার করতে গেছেন ককবার্ন সাহেব। তিনি জঙ্গলের ভেতর এক পাথরের খাঁজে দেখতে পেলেন একটি পশুর কঙ্কাল। তবে ওটি ফসিল নয়। মাটির তলায় পড়ে থেকে রং বদলেছে। কঙ্কালটি জোড়া দিতেই লাফিয়ে উঠলেন আনন্দে। আরে এ যে গণ্ডার। মির্জাপুরের জঙ্গলে গণ্ডার! ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য। মাটি খুঁড়তে-খুঁড়তে পেলেন বুনো শুয়োর, অ্যান্টিলোপ হরিণ, ঘোড়ার কঙ্কাল আর নানারকম অস্ত্র। এর দু' বছর পর ককবার্ন-সাহেব ঘুরতে-ঘুরতে এসে পড়লেন বিজয়গড় দুর্গের কাছে। এর তিন মাইল দূরে আছে জঙ্গল আর গুহা। স্থানীয় লোকদের কাছে গুহা ঘোড়মানগড় নামে পরিচিত। গুহায় আছে ঘোড়ার প্রচুর ছবি। আদিম গুহামানুষদের আঁকা বহু ছবি এই গুহায় পাওয়া যায়। এখানে শিকার-দৃশ্যই বেশি। গণ্ডারের ছবিও আছে। পাঁচজন শিকারি খুঁচিয়ে গণ্ডারটিকে মারছে। শিকারিদের হাতে বর্শা। মাথায় পাতার মুকুট। পরনে ছোট কাপড়। গণ্ডারও তার খড়্গ দিয়ে তুলে আছড়ে ফেলেছে এক শিকারিকে।

ভুবনেশ্বর থেকে কালাহান্ডির ভবানীপাটনার দূরত্ব প্রায় চারশো কিলোমিটার। ভবানীপাটনা থেকে যেতে হয় যোগীমঠ। যোগীমঠের অনেক গুহাই নষ্ট হয়ে গেছে হয়তো প্রাকৃতিক দুর্যোগে। এখানকার সমস্ত ছবিই রেখায়। যোগীমঠের বন্য পশুর চেয়ে গৃহপালিত পশুর ছবিই বেশি। আর আছে মানুষের ছবি।

রায়পুর থেকে প্রায় একশো চোদ্দ কিলোমিটার দূরে চিতাডোর জঙ্গল। এই জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়ের গায়ে আদিবাসীরা খুঁজে পেয়েছেন ১৭টি গুহাচিত্র। নিওলিথিক যুগে মধ্যভারতে মঙ্গোলীয় যে বাস করত তার প্রমাণ মেলে। এই গুহাচিত্রগুলোর গুরুত্ব অনেক বেশি। কারণ, নিওলিথিক আমলে শিকারি জীবন ছেড়ে মঙ্গোলীয় যখন পারিবারিক জীবনে ফিরে আসছিল, ছবিগুলো সেই আমলের। পাহাড়ের গায়ে সাত-আট ফুট উঁচুতে ছবিগুলো আঁকা। কোনও ছবিতে আছে মঙ্গোলীয় চেহারার ব্যবসায়ী। কোনওটিতে ড্রাগন। কোথাও-বা মেয়েরা বীজ বুনছে। দুটি মানুষের নৌকো চালানোর ছবিও রয়েছে। অনেকের অনুমান, মঙ্গোলীয় শিকারিরা ভারতে এসে দক্ষিণাঞ্চল অভিযানের সময় পথ হারিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন চিতাডোর জঙ্গলে। ছবিগুলো সেই সময়েরই।

তবে ভারতে সবচেয়ে বেশি পরিচিত বোধ হয় অজন্তার গুহাচিত্রগুলি। অজন্তার পাথরের গায়ে শিল্পীদের রঙিন তুলির আঁচড়ে ফুটে উঠেছিল এই সব ছবি। এগুলো আঁকা হয়েছে খ্রিস্টপূর্ব দুই শতাব্দী থেকে খ্রিস্টাব্দ আট শতাব্দী পর্যন্ত। বৌদ্ধধর্ম আর বুদ্ধদেবের জীবন নিয়ে ২৮টি গুহার ছবিগুলো দেখে অবাক হতে হয়। জনবসতি থেকে বিচ্ছিন্ন অজন্তার এই গুহাগুলো ছিল জঙ্গলের মধ্যে। কত শতাব্দী কেটে গেছে। মানুষ জানত না এর মধ্যে কী লুকিয়ে আছে। ১৮১৯ সালে একদল ইংরেজ সৈন্য শিকার করতে গিয়ে আবিষ্কার করেন অজন্তার গুহাচিত্র। সেই থেকে আজ পর্যন্ত মানুষ ছুটে যাচ্ছে বারবার অজন্তার ওই গুহাচিত্র দেখতে। এখনও হয়তো কত-কী লুকিয়ে আছে জঙ্গলে, পাহাড়ের গুহায়। সেখানে মানুষের পা পড়েনি। কোনওদিন হয়তো আবিষ্কার হবে। খুঁজে পাওয়া যাবে ভারতের গুহামানুষদের জীবনযাত্রা। আর তাদের শিল্পকর্মের অজস্র নিদর্শন।

অপু-দুর্গারা যেদিন মহাকাশ-স্টেশনে যাবে

গৌতম চক্রবর্তী

খালসেমারির বিল, উড়ি ধানের খেত, আতুরি ডাইনির ভাঙা কুঁড়ে ও গোটা নিশ্চিন্দিপুর গ্রামকে পিছনে ফেলে অপু অন্য কোথাও যেতে চেয়েছিল। কাশী কিংবা কলকাতা নয়, সুদূর আফ্রিকার গহন অরণ্য কিংবা পোর্তোপ্লাতার সমুদ্রে যাওয়ার স্বপ্ন দেখেছিল কিশোর অপু।

রঙিন কমিক্‌স-বইয়ের ফ্ল্যাশ গর্ডন আর ডঃ জারকভ ইতিমধ্যে দিব্যি হেসেখেলে পৃথিবীর বাইরের এক মহাকাশ-স্টেশনে সারাটা জীবন কাটিয়ে দিলেন। কিন্তু সেদিন আর বেশিদূরে নয়, যখন নিশ্চিন্দিপুরের রক্তমাংসের বালক অপুও আফ্রিকা কিংবা পোর্তোপ্লাতায় না গিয়ে মহাকাশ-স্টেশনে পৌঁছবার স্বপ্ন দেখবে।

তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে এর মধ্যেই। মানুষ যাতে অনায়াসে পৌঁছতে পারে মঙ্গলগ্রহে, স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে মহাকাশ-স্টেশনে, তারই তোড়জোড়। কাজও এগিয়ে চলেছে পুরোদমে।

না, স্পিলবার্গের ছবির চোখধাঁধানো সেট কিংবা আসিমভের লেখা কল্পবিজ্ঞানের পৃষ্ঠায় নয়, তুরন্ত গতিতে কাজ এগিয়ে চলেছে একেবারে বাস্তবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাসা মহাকাশ-কেন্দ্রে। কিন্তু মহাকাশ-স্টেশনে পৌঁছবার আগে প্রসন্ন গুরুমশাইয়ের পাঠশালায় অপুকে অবশ্যই জেনে নিতে হবে মহাকাশ-স্টেশন ব্যাপারটা আসলে কী!

মহাকাশ-স্টেশন

এই ব্যাপারটার অস্তিত্ব এখনও কল্পকাহিনীর পাতায় আটকে আছে। হাওড়া স্টেশন থেকে যেমন দিল্লি, বম্বে, মাদ্রাজ, জম্মু ইত্যাদি বিভিন্ন দিকে ট্রেনগুলি ছুটে বেরিয়ে যায়, মহাকাশ-স্টেশন থেকেও চালু হবে আন্তঃগ্রহ-পরিবহণ ব্যবস্থা। সেখান থেকে কোনও স্যাটেলাইট আসবে পৃথিবীর দিকে, কোনওটা যাবে মঙ্গলগ্রহে, কোনওটা-বা শুক্রে। স্বভাবতই, মহাকাশ-স্টেশন এমন একটি জায়গা, যেখানে মানুষ বাস করবে নির্বিঘ্নে। থাকবে থাকার জায়গা, গবেষণাগার। এখন অবধি মানুষ সবচেয়ে বেশি কতদিন মহাকাশে কাটিয়েছে? ৮৪ দিন। এ রেকর্ড করেছিলেন ১৯৭৪-এ স্কাইল্যাব উপগ্রহের মহাকাশচারীরা। কিন্তু, নাসায় এখন কাজ চলছে স্পেস-স্টেশন 'ফ্রিডম'-এর, শুধুমাত্র রেকর্ড করার জন্য নয়, মহাকাশচারীরা এখানে থেকে চালাবেন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা।

স্পেস-স্টেশনের প্রস্তুতি এবং কাজটি অসাধারণ ও অভূতপূর্ব। কিন্তু প্রথমেই আমরা জেনে নিই কিছু গোড়ার কথা। কৃত্রিম উপগ্রহের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি। কীভাবে কাজ করে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ?

প্রাকৃতিক উপগ্রহগুলি যে নিয়মে ঘূর্ণমান, কৃত্রিম উপগ্রহগুলিও সেই এক নিয়মের বশবর্তী। এই নিয়মগুলিকে প্রথম লক্ষ করেছিলেন ডেনিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী জন কেপলার। পরে, কেপলারের সূত্রগুলি দৃঢ়

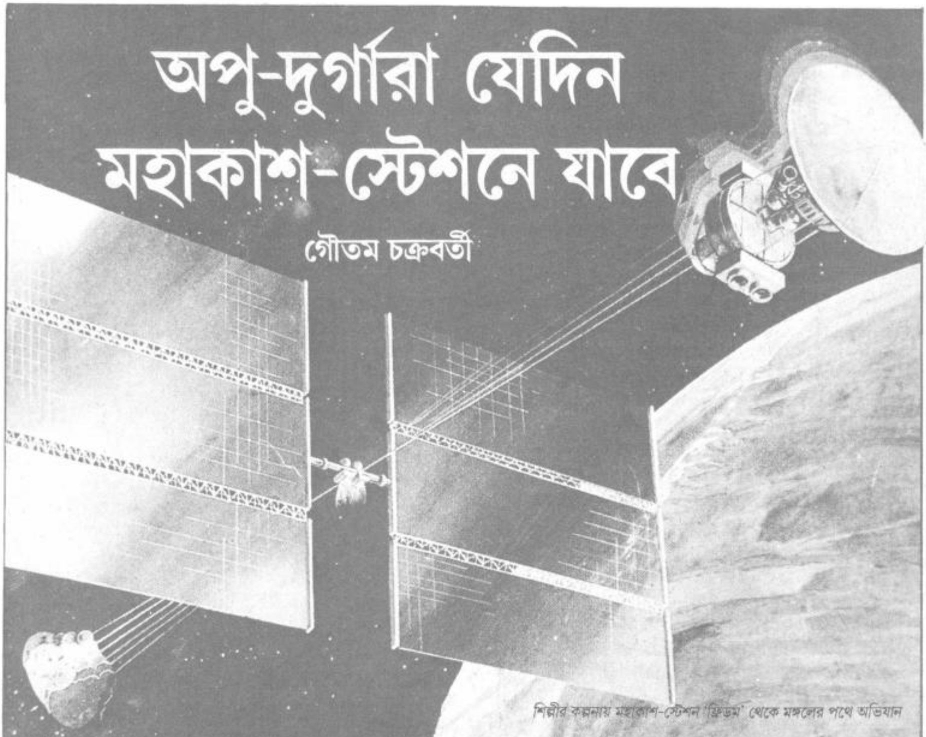

শিল্পীর কল্পনায় মহাকাশ-স্টেশন 'ফ্রিডম' থেকে মঙ্গলের পথে অভিযান

ভিত্তি পায় নিউটনের মহাকর্ষ-সূত্র আবিষ্কারের পর।

কেপলারের প্রথম সূত্র হল, গ্রহগুলি উপবৃত্তাকার কক্ষপথে ঘোরে, সূর্য এই উপবৃত্তের যে-কোনও একটি নাভিবিন্দুতে অবস্থান করে। দ্বিতীয় সূত্রটি, সূর্য থেকে গ্রহ অবধি একটা রেডিয়াস-ভেক্টর টানলে দেখা যাবে, গ্রহটি একই সময়ে একই ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট পথ পরিক্রমা করে। অর্থাৎ, কক্ষপথে একক সময়ে গ্রহটির পরিভ্রমণের ক্ষেত্রফল নির্দিষ্ট থাকে। তৃতীয় সূত্রটি আবর্তনের সময়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। সূর্যকে কেন্দ্র করে কোনও গ্রহের আবর্তন-সময়ের বর্গ, সূর্য থেকে গ্রহের দূরত্বের ঘনের সমানুপাতিক। অর্থাৎ, কোনও গ্রহের আবর্তন-সময় T ও সূর্য এবং গ্রহের দূরত্ব R হলে, কেপলারের তৃতীয় সূত্র অনুযায়ী, $T^2 \propto R^3$. মহাবিশ্বের যাবতীয় গ্রহ, গ্রহাণু, নক্ষত্রের আবর্তন এই সূত্রগুলির উপর নির্ভরশীল।

কেপলারের সূত্র আবিষ্কারের পর, পরবর্তী ২৫০ বছরে পৃথিবীর বিজ্ঞান এগিয়ে যায় আরও কয়েকশো মাইল। আবিষ্কৃত হয় নিউটনের মহাকর্ষ-সূত্র, আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা-তত্ত্ব, ম্যাক্স প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম থিয়োরি ইত্যাদি অনেক কিছু। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্ব থেকে আচমকা বিজ্ঞানীকুলের মাথায় এসেছে 'এসকেপ ভেলোসিটি'-র কথা। একটা বস্তুকে যখন ওপরদিকে দেওয়া হয়, মাধ্যাকর্ষণের জন্য তা নীচে নেমে আসে। কিন্তু যদি বস্তুকে এমন গতিবেগে ছুঁড়ে দেওয়া হয়, যে গতিবেগ মাধ্যাকর্ষণের চেয়েও অনেক অনেক বেশি? তা হলে তো বস্তুটি পৃথিবীতে আর ফিরে আসবে না!

বিজ্ঞানীমহল মাথা ঘামাতে বসলেন জটিলতম সব অঙ্ক, মাপজোক নিয়ে। এবং, অঙ্কই শেষ অবধি বাতলে দিল সে পরশপাথরের খোঁজ। পৃথিবীর ব্যাসার্ধ যদি R, পৃথিবীপৃষ্ঠে অভিকর্ষজ-ত্বরণ G হয়, তা হলে এসকেপ ভেলোসিটি (Ve)-র মান হবে,

$$Ve=\sqrt{2gR}$$

প্রয়োজনীয় সব-কিছু জানা হয়ে গেল। এবার ধরা যাক, এসকেপ ভেলোসিটির সাহায্যে একটি বস্তুকে পৃথিবীর বাইরে বার করে দেওয়া হল। কিন্তু এমন নির্দিষ্ট বেগে যে, বস্তুটি মহাশূন্যে ছিটকে যাবে না, উপবৃত্তাকার কক্ষপথে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরবে। এই বেগটিকে বলা হয় অরবিটিং ভেলোসিটি (Orbiting velocity)। এবং বস্তুটি ঘুরবে কেপলারের সূত্র মেনেই। সেখানেও $T^2 \propto R^3$

পৃথিবীর বিজ্ঞানীমহলের সংশয়ের অবসান হল ৪ অক্টোবর, ১৯৫৭। সোভিয়েত রাশিয়া মহাকাশে পাঠাল মানুষের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ।

'৫৭ সালে রাশিয়ার মির মহাকাশকেন্দ্রের সামনে যে সমস্যাটা ছিল, ১৯৮৯-এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাসা মহাকাশকেন্দ্রের সমস্যাটা তার চেয়েও জটিল। কৃত্রিম উপগ্রহ তো যখন-তখন মহাকাশে পাঠানো যায়, কিন্তু মহাকাশে একটি বসবাসের উপযুক্ত মহাকাশ-স্টেশন কীভাবে গড়া যায়? তা হলে, কল্পবিজ্ঞানের বইতে নয়, বাস্তবের মহাকাশে পৌঁছবে মানুষের বিজয়রথ। জয়ী হবে তার এতদিনের আকাঙ্ক্ষা। আর, এই সভ্যতায় মানুষের মনের সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা, সবচেয়ে বড় বিজয় কোনটা? নিঃসন্দেহে, স্বাধীনতা। স্বোপার্জিত স্বাধীনতাই একজন মানুষের মনের সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা, সবচেয়ে বড় বিজয়। মানুষের তৈরি প্রথম স্পেস-স্টেশনটির নামও নাসা তাই রাখবে ফ্রিডম!

কীভাবে গড়া হবে ফ্রিডম

ফ্রিডমের মূল কেন্দ্রীয় অংশটি হল ৫০৮ ফুট লম্বা একটি অনুভূমিক প্ল্যাটফর্ম। এই প্ল্যাটফর্মটি একেবারে টানা, নিরেট নয়। অনেক গ্রাফাইট-ইপোক্সি নল অ্যালুমিনিয়াম ফিটিংস-এর সাহায্যে পরপর জোড়া লাগিয়ে এই প্ল্যাটফর্মটি তৈরি হবে। না, অ্যালুমিনিয়ম-ফিটিংস-এর পর ঝালাই একেবারে করা হবে না; আসলে এই জোড়গুলি হাত ঘুরিয়ে খাঁজে-খাঁজে লাগানো হবে। ফলত, প্ল্যাটফর্মের অংশগুলি প্রয়োজনমতো যখন-তখন খোলা যাবে ও জোড়া লাগানো যাবে।

লম্বা ও অনুভূমিক এই প্ল্যাটফর্মের দু'প্রান্তে থাকবে চারটি চারটি করে মোট আটটি সোলার-প্যানেল। এইগুলির কাজ হবে শক্তি উৎপাদন করে মহাকাশ-স্টেশনটিকে সচল রাখা। এক-একটি প্যানেলের ক্ষেত্রফল প্রায় ৩৬০০ বর্গফুট। মোট আটটি সোলার-প্যানেলে থাকবে সবসুদ্ধ ২ লক্ষ ৫০ হাজারটি সৌরকোষ বা সোলার-সেল। নিজস্ব কক্ষপথে ঘুরতে স্পেস-স্টেশনটির সময় লাগবে একানব্বই মিনিট। এর মধ্যে ৫৪ মিনিট থাকবে সূর্যালোকের মুখোমুখি। সেইসময় এই আটটি প্যানেল মোট ২২,৪০০ ওয়াট ইলেকট্রিসিটি উৎপাদনে সক্ষম। আর বাকি ৩৭ মিনিট, কক্ষপথে যখন রাত্রি, তখন নিকেল-হাইড্রোজেন ব্যাটারিতে সঞ্চিত শক্তি ওই স্পেস-স্টেশনটি চালিত করবে।

লম্বা প্ল্যাটফর্মের মাঝখানে থাকবে নভোচারীদের থাকার ও গবেষণার ব্যবস্থা। প্রথমে লাগানো হবে দু'টি পঁয়তাল্লিশ ফুট চওড়া সিলিন্ডার, এক-একটি সিলিন্ডার প্রায় বিশাল একটি হলঘরের মতো। আটজন নভোচারী তাতে হেসে-খেলে স্বচ্ছন্দে বসবাস করতে পারবেন। সবসুদ্ধ ত্রিশজনের থাকার ব্যবস্থা আছে। আর-একটি সিলিন্ডার ব্যবহৃত হবে গবেষণাগার হিসেবে।

নভোচারীদের ওইসব ফ্ল্যাটবাড়ি ওরফে সিলিন্ডারটি এখন অবধি নাসার সর্বাধিক বিলাসবহুল ও অভিজাত ব্যবস্থা। কতকগুলি লম্বা, স্থিতিস্থাপক-নিরোধী ঝুলন-দড়িতে তৈরি হবে বিছানা। থাকবে ছিমছাম একটি রান্নাঘর। রান্নাঘরের উনুনটি কাজ করবে কীভাবে? সেখানে তো গ্যাস-সরবরাহ কিংবা কেরোসিনের স্টোভ জ্বালানো সম্ভব নয়! তা হলে জেনে রাখা যাক, ওই রান্নাঘরের উনুনটিই হবে পৃথিবীর প্রথম আউটার-স্পেস মাইক্রোওয়েভ ওভেন। মহাকাশে সর্বত্র তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ, মাইক্রোওয়েভে উনুন ধরানো কোনও সমস্যাই নয়। মহাকাশে

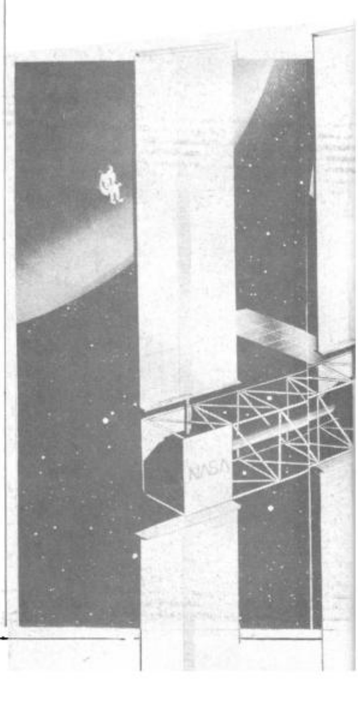

থাকলে অপুদের তা হলে লোডশেডিংও সহ্য করতে হবে না, গ্যাস কিংবা কেরোসিনের লাইনে তীর্থের কাকের মতো দাঁড়িয়েও থাকতে হবে না।

অসুখ-বিসুখ হলে ? ছোটখাটো আঘাত, শরীরের উপর অতিরিক্ত ভারশূন্যতার আঘাত ইত্যাদির চিকিৎসার জন্য থাকবে ছোট্ট হাসপাতাল। জিমনাশিয়ামে থাকবে ট্রেডমিল, স্টেশনারি বাইসাইকেল, রোয়িং মেশিন ইত্যাদি। বাথরুমে থাকবে একটি শাওয়ার, কল খুললেই সারা দেহ ভরে যাবে আর্দ্র জলীয় বাষ্পে।

বিলাসবহুল এই সিলিন্ডারের শেষ প্রান্তে রয়েছে 'ডকিং পোর্ট'-বন্দর এলাকা। সেখানেও থাকবে একটি ছোট্ট মহাকাশযান। গড়ের মাঠের হাওয়া খাওয়া যাবে না, কিন্তু মহাকাশযানটি নিয়ে মহাকাশে বেশ কিছুক্ষণ ঘুরে-ফিরে আবার কেন্দ্রে ফিরে আসা যাবে। পৃথক ডকিং পোর্ট থাকার সুবিধে ? কৃত্রিম উপগ্রহে কিছু হলে উপগ্রহে যাওয়ার দরকার নেই, সেটি নিজে এসে স্টেশনের ডকে সংযুক্ত হবে।

প্ল্যাটফর্মের মাঝখানে বসবাস ও গবেষণার উপযোগী অন্যান্য মডিউলগুলি দেবে ইউরোপ ও জাপান। ইউরোপিয়ান স্পেস-সেন্টার দু'টি ল্যাবরেটরির মডিউল পাঠাবে। একটি মানুষ বসবাসের উপযোগী, অন্যটি মানুষবিহীন।

মানুষের বসবাসের উপযোগী মডিউলটি চল্লিশ ফুট চওড়া একটি সিলিন্ডার। এটি প্রায় আলাদা এক কৃত্রিম উপগ্রহ, কিন্তু যতক্ষণ না শক্তি সরবরাহ হচ্ছে, এটি অচল। ফ্রিডম এটিকে বহন করবে। ফ্রিডমের ডকিং পোর্টের সঙ্গে জোড়া লেগে গেলেই ফ্রিডম একে শক্তি সরবরাহ করবে ও থাকার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি হবে। বিজ্ঞানীরা এখানে জীববিজ্ঞান, ধাতুবিদ্যা, ফ্লুইড ডিনামিক্স ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা করবেন।

ডকিং পোর্ট

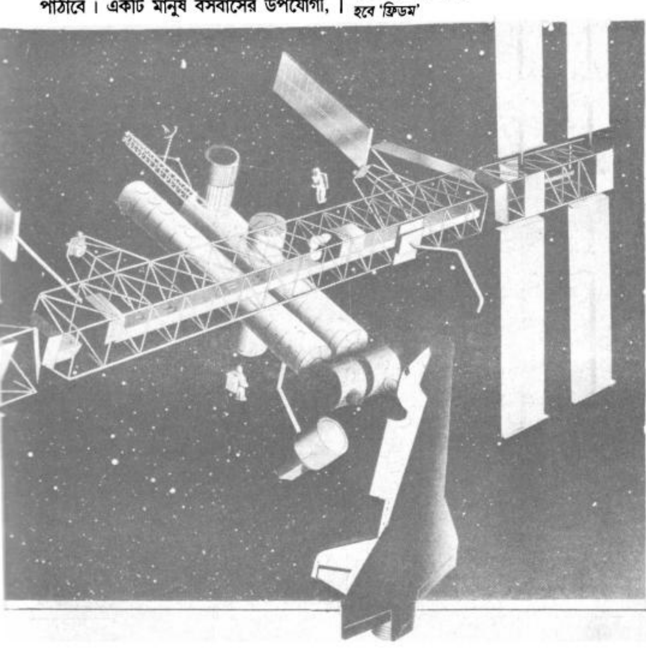

মহাকাশে ভাসতে ভাসতেই তৈরি করতে হবে 'ফ্রিডম'

মানুষবিহীন সিলিন্ডারটি প্রায় কুড়ি ফুট প্রশস্ত, এটি নিজে স্বাধীনভাবে কক্ষপথে পরিভ্রমণ করতে সক্ষম। এর কক্ষপথটি রাখা হবে ফ্রিডমের কক্ষপথের ৩৫ মাইলের মধ্যে। প্রতি ৬ মাস অন্তর, ফ্রিডমের মহাকাশচারীরা এটিকে তাঁদের কাছে নিয়ে আসবেন। স্পেস-স্টেশনে বসে যেসব গবেষণা করা যাবে না, সেগুলি করা হবে এখানে। অতঃপর, এটিকে আবার পাঠিয়ে দেওয়া হবে নিজস্ব কক্ষপথে। ৬ মাস পরে এটিকে আবার ফ্রিডমে নিয়ে এসে দেখা হবে গত পরীক্ষার ফলাফল।

জাপানিরা দিচ্ছে একটিমাত্র মানুষ বসবাসের উপযোগী মডিউল। সেখানে ধাতুবিদ্যা ও এঞ্জিনিয়ারিং-এর উপর গবেষণা হবে। ইউরোপীয় ও আমেরিকান মডিউলের চেয়ে এর আয়তন একটু ছোট। তেত্রিশ ফুট। মডিউলটির বাইরের দিকে রয়েছে একটি বারান্দা—ব্যাক পর্চ। এটিও একটি প্ল্যাটফর্ম ধরনের, একটি যান্ত্রিক বাহু গবেষণাগারের সঙ্গে এর সংযোগ রক্ষা করবে। এই প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে বিজ্ঞানীরা সরাসরি বাধাবন্ধনহীন মহাকাশের দৃশ্য দেখতে সক্ষম, এমনকী, মহাকাশের পরিবেশে কোনও গবেষণার দরকার হলে সেটিও তাঁরা এখানে বসে সমাধা করবেন, তারপর ঘরে ফিরে যাবেন।

কানাডা দিচ্ছে অসাধারণ প্রযুক্তিসম্পন্ন একটি চালক-বাহু বা ম্যানিপুলেটর-আর্ম। এই বাহুটি একটি অসাধারণ চলমান রোবট, যে যন্ত্রপাতি চালাতে, সারাই করতে, সব-কিছুতে সিদ্ধহস্ত। এই রোবটের হার্ডওয়্যারটি প্রায় ৫৫ ফুট লম্বা এক কার্বনবহুল বাহু। বাহুর শক্তি ? পৃথিবীপৃষ্ঠে এটি ২ লক্ষ ২০ হাজার পাউন্ড ওজনের বস্তুকেও সরিয়ে দিতে সক্ষম। মহাভারতের মধ্যম পাণ্ডবও নিঃসন্দেহে এই রোবটের কাছে লজ্জা পাবেন। ফ্রিডমের অন্যান্য ম্যানিপুলেটর-আর্ম আছে এর পে-লোড-বে অংশে (যেখানে জ্বালানি থাকে)। সুদৃঢ় ও স্থিরভাবে। কিন্তু এই কানাডিয়ান আর্মটি থাকবে প্ল্যাটফর্মের ওপরে। এর রয়েছে একটি নিজস্ব ওয়ার্ক-স্টেশন ও কন্ট্রোল প্যানেল। ফলত, ক্রেনের কেবিনে চালক বসে যেমন সব ভারী বাস ও ট্রাক টেনে নিয়ে যান, এর ওয়ার্ক-স্টেশনে একজন নভোচারী বসে কন্ট্রোল-প্যানেল চালিয়ে কাজ করতে পারেন। পৃথিবী এই কানাডিয়ান

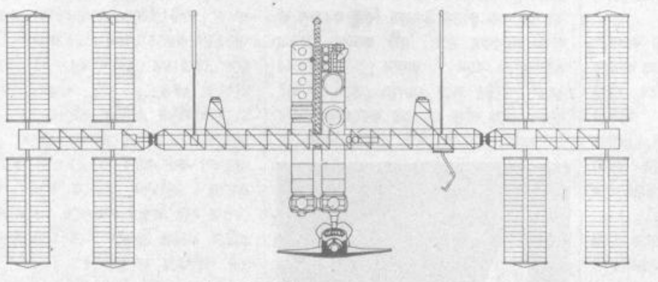

রেখাচিত্রে 'ফ্রিডম'-পরিকল্পনা

ফ্রিডমের মূল কেন্দ্রীয় অংশটি হল ৫০৮ ফুট লম্বা একটি অনুভূমিক প্ল্যাটফর্ম। এই প্ল্যাটফর্মটি একেবারে টানা, নিরেট নয়। অনেক গ্রাফাইট-ইপোক্সি নল অ্যালুমিনিয়াম ফিটিংস-এর সাহায্যে পরপর জোড়া লাগিয়ে এই প্ল্যাটফর্মটি তৈরি হবে।

রোবট-ক্রেনের কথা স্বপ্নেও ভুলবে না। কিন্তু ছোট্ট একটি সমস্যা রয়ে গেছে। ধরা যাক, ফ্রিডমের কোনও মডিউলের ভিতর কিংবা কোনও মানুষবিহীন ল্যাবরেটরি-উপগ্রহের অংশ বিকল হয়ে গেছে। তখন কী হবে? ওই ম্যানিপুলেটর-আর্মটি তো সেসব জায়গায় ঢুকবেই না!

না, ঘাবড়ানোর কিছু নেই। প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে লাগানো আছে ছোট্ট আর-একটি ম্যানিপুলেটর। এর শেষপ্রান্তে লাগানো আছে দু'টি ছোট্ট, ৬ ফুট লম্বা ম্যানিপুলেটর বা বাহু।

প্রথমেই বলেছি, গোটা প্ল্যাটফর্মটি গ্রাফাইট-ইপোক্সিতে তৈরি। রসায়নবিজ্ঞানে ন্যূনতম জ্ঞানসম্পন্ন একজন সাধারণ মানুষও জানেন গ্রাফাইট ধাতু হিসেবে বেশ পিচ্ছিল। সুতরাং, বসবাসের মডিউল, ল্যাবরেটরি যে অংশই খারাপ হোক না কেন, এই দ্বিতীয় ম্যানিপুলেটর বা বাহুটিকে প্ল্যাটফর্মের উপর দিয়ে স্লাইড করিয়ে সহজেই সেখানে আনা যাবে। আর যদি কোনও স্যাটেলাইট খারাপ হয়ে যায়? ভীমাকৃতি কানাডিয়ান ম্যানিপুলেটরের উপর দ্বিতীয় ম্যানিপুলেটরটি বসিয়ে দিলেই হল। একেবারে মানুষের হাত! প্রাথমিক কানাডিয়ান ম্যানিপুলেটর যেন সেই হাতের বাহু, দ্বিতীয় স্লাইডিং ম্যানিপুলেটরটি কবজি আর তৃতীয়, ৬ ফুট ম্যানিপুলেটর দু'টি তার আঙুল! বাপ্‌স, এ যেন এক যান্ত্রিক গোলিয়াথ!

ফ্রিডমে কী কী কাজ হবে? মহাশূন্যে, মাধ্যাকর্ষণবিহীন অবস্থায় বিজ্ঞানীরা প্রোটিন ক্রিস্টাল্‌স, ফ্লুইড ডাইনামিক্‌স, প্ল্যান্ট ফিজিওলজি ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা করবেন। হয়তো এসব গবেষণার ফলে আবিষ্কৃত হবে নতুনতর ওষুধ, নতুনতর ফসল। পাওয়া যাবে শস্তা অথচ নতুনতর কোনও জ্বালানির সন্ধান। ফ্রিডম প্রোজেক্টের প্রধান কর্ণধার বিজ্ঞানী, প্রাক্তন নভোচারী জন বারটো আর-একটি সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দেননি। এখান থেকে মঙ্গল ও চাঁদে যাওয়া। ২০০৫ সালে, এই নাসাতেই শুরু হবে চাঁদে মানুষের উপনিবেশ স্থাপনের প্রাথমিক কাজ। ফ্রিডমের এঞ্জিনিয়াররা এখন কাজ চালাচ্ছেন ভারশূন্য অবস্থাকে কীভাবে কাটানো যায়, তা নিয়ে।

কীভাবে? একটা সহজ ব্যাপার বলি। আঙুলে সুতো বেঁধে একটা ঢিল ঘোরালে দেখা যাবে ঢিলটা ঘুরতে ঘুরতে ছিটকে বেরিয়ে যেতে চায়। যে বল ঢিলকে বাইরে নিয়ে যেতে চায়, তার নাম সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স। কিন্তু ঢিল যতক্ষণ ঘুরছে, আঙুল ওই সেন্ট্রিপিটাল বলের সমান ও বিপরীতাভিমুখী একটি 'সেন্ট্রিফ্যুগাল ফোর্স' দিচ্ছে। ঘূর্ণনেই এই বলের উৎপত্তি। ঘূর্ণমান স্পেস-স্টেশনে এখন ভারশূন্য অবস্থা। কিন্তু গবেষণা চলছে কীভাবে সেন্ট্রিফিউজের মাধ্যমে স্পেস-স্টেশনে একটি সেন্ট্রিফ্যুগাল ফোর্স উৎপন্ন করা যায়! তা হলে সেখানে সবসময় একটি নির্দিষ্ট মহাকর্ষজ ত্বরণ থাকবে। ব্যস্! এবার ধরা যাক প্রায় এক কিলোমিটার লম্বা একটি বিশেষ দড়ির এক প্রান্তে আর-একটা ঘূর্ণমান স্পেসশিপ থাকল। তা হলে স্পেস-স্টেশন এবং দড়ির প্রান্তের স্পেসশিপে মহাকর্ষীয় ত্বরণ এক। স্বচ্ছন্দে, একই মহাকর্ষীয় ত্বরণে মানুষ স্পেস-স্টেশন থেকে মঙ্গলে পৌঁছে যাবে। খালি, মঙ্গলের লঞ্চিং প্যাডে নামার সময় দড়ি থেকে স্পেসশিপটা বিচ্ছিন্ন করে নিতে হবে।

ফ্রিডমে কী কী কাজ হবে? মহাশূন্যে মাধ্যাকর্ষণবিহীন অবস্থায় বিজ্ঞানীরা প্রোটিন ক্রিস্টাল্‌স, ফ্লুইড ডাইনামিক্‌স, প্ল্যান্ট ফিজিওলজি ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা করবেন। হয়তো এসব গবেষণার ফলে আবিষ্কৃত হবে নতুনতর ওষুধ, নতুনতর ফসল। পাওয়া যাবে শস্তা অথচ নতুনতর কোনও জ্বালানির সন্ধান।

ফ্রিডম গড়তে খরচ হবে প্রায় ১৬০ কোটি ডলার। সব-কিছু ঠিকঠাক থাকলে, কনস্ট্রাকশন-গার্ডার, সোলার প্যানেল ইত্যাদি নিয়ে প্রথম রকেটটা ছাড়বে ১৯৯৫ সালে। কয়েক সপ্তাহ বাদে ছাড়বে দ্বিতীয় রকেটটি। ভাসমান নভোচারীরা অ্যালুমিনিয়মের কনস্ট্রাকশন-গার্ডারের সাহায্যে প্রথমে প্ল্যাটফর্মটি জোড়া দিতে শুরু করবেন। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে, ১৯৯৮তেই গড়ে উঠবে পৃথিবীর প্রথম স্পেস-স্টেশন ফ্রিডম!

তারপর?

২০০০ সালের প্রথম দশকে অপু-দুর্গারা নিশ্চয় কাঁটাবন পেরিয়ে জলা পার হয়ে রেললাইন দেখতে ছুটবে না! রানুদিদের উঠোনে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে আঙুল দেখিয়ে তখন দুর্গা বলবে, "ওই দ্যাখ অপু, স্পেস-স্টেশন। যাবি?" ঠ্যাঙাড়ে বিরু রায়ের বাগান ও চালতেতলার মাঠ পেরিয়ে গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে যাবে ভীরু ও কিশোর মানব-সভ্যতা। ওরা সবাই ফ্রিডম-এ পৌঁছতে চায়!

টারজান
এডগার রাইস বারোজ
টম কিনসায়েডের জাহাজ টরটুগা যখন গন্তব্যের কাছাকাছি এসেছে, আর্থার বিসলির ইয়াট নিরাপদ দূরত্বে থেকে তার পিছু নিয়েছে।
আব্দুল্লার বেতারসঙ্কেত পরিষ্কার আসছে। কিনসায়েড জলে ডুব দেবার পরে আব্দুল্লা আলোর সঙ্কেত দেখালে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া কোনও সমস্যা হবে না।
হ্যাঁ, কিনসায়েডকে অপ্রস্তুত অবস্থায় ধরতে পারলে ভাল হয়। অবশ্য টারজান নামে পরিচিত লোকটাকে বাগ মানানো ততটা সহজ নাও হতে পারে।
টরটুগার ডেকে···
এসা, তুমি খোশ মেজাজে ঘুরে না বেড়ালে তোমাকে কেউ মারবে এমন কথা বলছি না। কিন্তু তোমার ব্যবহারে মনে হচ্ছে তোমার ঘাড়ে গোটা পৃথিবীর দায়িত্ব।
আমার কাজে যদি খুশি করতে না পেরে থাকি তা হলে দুঃখিত।
এসা, আমার ধারণা উনি তোমার জন্য উদ্বিগ্ন বোধ করছেন। ক্যাপ্টেনের দায়িত্ববোধ অত্যন্ত প্রবল।
হুঁশিয়ার
হাঙর!
জাহাজের হঠাৎ দুলুনিতে এসা···
···জাহাজ থেকে মানুষ জলে পড়ে গেছে!!
এসাকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাও, টম।

ভূত নয় তো কী

আশাপূর্ণা দেবী

গাড়িখানাকে কর্তাবাবু সম্প্রতি নতুন রং করিয়েছেন, তাই তাকে চান করাবার ব্যাপারে বটুকহরির এখন ভারী সমীহ আর স্নেহ। যাদুর গায়ে হাত বুলনোর মতো করে নরম ঝাড়ন দিয়ে ঘষে ঘষে চান করাতে করাতে, হাতের বালতির জলটা ফুরিয়ে গেল। অগত্যাই আবার লাল টুকটুকে প্লাস্টিকের বালতিটিকে নিয়ে গেটের মধ্যে ঢুকে এল বটুক।

মিস্টার চৌধুরীর এই বারাসতের বাড়িটির সামনে অনেকখানি

কম্পাউণ্ড। বাগানও করা হচ্ছে। সেই বাবদ গেটের ভিতরে একটু ডানহাতি একটা টিউবওয়েল বসানো হয়েছে। বাগানে জল দেওয়ার কাজে লাগবে, প্লাস গাড়ি চান করাবার। এবং কাজের লোকজনদের চানটানও।

রিটায়ার করার পর চৌধুরীসাহেব বাড়িটা নতুন কিনেছেন বটে, তবে বাড়িটা মোটেই নতুন নয়। আদ্যিকালের পুরনো। তবে হ্যাঁ, বাড়ির মতো বাড়ি বটে একখানা। প্রাসাদ বললেই ভাল হয়। কিন্তু নিজের লোক বলতে আর ক'জন চৌধুরীসাহেবের সংসারে? এই লোকজনেতেই যা বাড়ি সরগরম। বটুকহরি একটু বিশিষ্ট। সে কর্তাবাবুর খাশপরিচারক। কর্তাবাবুর গাড়িখানাকে তাই সে অপর কারও হাতে ছেড়ে দিতে রাজি নয়। নইলে গাড়ি তো গোবরাও ধুতে পারত!

টিউবওয়েলটা বার কয়েক ঘ্যাঁচঘ্যাঁচ করেই বালতিটাকে টইটুম্বুর ভর্তি করে গেটের বাইরে চলে এসেই বটুকহরি থ।

গাড়ির বন্ধ দরজাটি খুলে নিয়ে তার মধ্যে দিব্যি আরাম করে বসে আছে একটা ছেলে! ছেলেটার গায়ে একটা গেঞ্জি আর পরনে একটা হাফপ্যান্ট। দুটোই বেশ মজবুত মতো, এবং ভাল জাতেরও। কিন্তু গেঞ্জির পিঠটা আর হাফপ্যান্টের একটা পায়ের নীচের দিকটা ফালা করে ছেঁড়া। ছেলেটার মাথাটা রুক্ষ আর যেন ধুলো-বালিতে বোঝাই। খালি পা দুটোর হাঁটু অবধি খড়ি ওঠা। কিন্তু মুখখানা যেন ঠিক গোপাল ঠাকুরের মতো, আর রংটা দিব্যি ফুটফুটে। হাতের চেটো দুটো ফুলো-ফুলো কচুরির মতো। তবে কাদা-মাটি মাখা।

এ আবার কোথা থেকে এসে জুটল!

এইমাত্তরই তো গাড়িটাকে ছেড়ে জল আনতে ভেতরে ঢুকেছিল বটুক। বটুক হাতের বালতিটা নামিয়ে চোখ পাকিয়ে বলে উঠল, "অ্যাই পাজি, গাড়িতে উঠে বসেছিস যে? কে তুই?"

ছেলেটা জানলায় মুখ রেখে কড়া গলায় বলে উঠল, "পাজি মানে? সভ্যভাবে কথা বলতে জানো না?"

বটুক কোমরে হাত দিয়ে বীরদর্পে দাঁড়িয়ে বলল, "তো পাজিকে পাজি বলব না তো কী বলব? গাড়িতে উঠে বসে আছিস মানে? নেমে আয় বলছি।"

"তুই-তুই করছ কেন? তুমি বলতে শেখোনি? খবরদার, তুই বলবে না।"

"ও! আবার লম্বা-লম্বা কথা। কোথা থেকে কোন মহারাজ লাটপুত্তুর এলে হে যে-তোমায় তুই বলা চলবে না, পাজি বলা চলবে না? নেমে আয় বলছি। নোংরা ভূত। ধুলো-কাদা মেখে গাড়িতে উঠে বসেছিস। সাহস তো কম নয়।" বলেই বটুকহরি দরজার হ্যাণ্ডেলে একটা মোচড় মেরে ছেলেটার একটা হাত চেপে ধরে হিঁচড়ে টান মারে।

"আঃ। ছাড়ো বলছি। ওঃ। কী কেঠো হাত! আঙুলগুলো বুঝি লোহা দিয়ে তৈরি?" বলে ছেলেটা নেমে এসে ঠোঁট উলটে বলে, "ভারী তো গাড়ি। তার আবার এত অহঙ্কার। কী একেবারে ভেলভেটের গদি! তাই ধুলো লাগলে ক্ষয়ে যাবে!"

"বটে। বটে।" বটুক তড়পে উঠে, "তোর বাপের বুঝি এর চাইতে অনেক ভাল ভাল গাড়ি আছে?"

"অ্যাই চোপ। 'বাপ' বলছ যে? খবরদার বাপ-টাপ বলবে না বলছি। ওটা খারাপ কথা। গালাগাল। তা জানো না বুদ্ধু?"

"অ্যাঁ। এই শয়তান পাজিটা কী বলে গো!" বটুকহরি মুঠো পাকিয়ে বলে, "গালাগাল। খারাপ কথা। জ্ঞান টনটনে। আর না-বলেকয়ে অপরের গাড়িতে চড়ে বসা খুব ভদ্রতা, কেমন? হঠাৎ কোথা থেকে উদয় হলি তাই শুনি? কোনও দিন তো এ-তল্লাটে দেখিনি। বাড়ি কোথায়? কাদের ছেলে? নাম কী?"

ছেলেটা ভুরু কুঁচকে বলল, "তোমার অত খোঁজে দরকার কী?"

"ও! দরকার নাই? চোর না ছ্যাঁচোড় তার ঠিক কী? কোন চুলো থেকে এসে এই এরিয়ায় সেঁদিয়ে বসেছিস?"

ছেলেটা তো দুই কোমরে হাত দিয়ে বীরের ভঙ্গিতে বলে, "কেন? এরিয়াটা তোমার কেনা? তাই আর কেউ আসতে পারবে না?"

"আরেব্বাস। এ যে দেখি জাত কেউটের ছানা। বলি গাড়িখানা তো আমার কর্তাবাবুর কেনা। তাতে সেঁদিয়ে বসেছিস কেন?"

"ইচ্ছে হয়েছিল, একবার বসেছিলাম! তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেছে? চোর-ছ্যাঁচোড় যা ইচ্ছে বললেই হল? আমি তোমার কর্তাবাবুর গাড়িখানায় উঠে চালিয়ে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলাম? যা করছিলে করো তো। একের-নম্বর ফাঁকিবাজ।"

"কী? কী বললি? একের-নম্বর ফাঁকিবাজ। ব্যাটা। আমি তোর বাবার চাকর?"

"ফের? ফের ওইসব 'বাবা' দিয়ে কথা? বলেছি না খবরদার বলবে না?"

বটুক যদিও প্রথমটায় ছেলেটার গোপাল-গোপাল মুখ, ফুটফুটে রং, আর এরকম আকস্মিক আবির্ভাব দেখে হঠাৎ ভেবেছিল, কী রে বাবা, কোনও শাপভ্রষ্ট দেবদূতের ছানাটানা নয় তো। কিন্তু সেটা মুহূর্তের জন্যই। ছেলেটার বাক্যিবুলিতে বটুকের সর্বাঙ্গে লঙ্কাবাটার চিড়বিড়িনি।

অতএব বটুক তার পাকসিটে ল্যাগবেগে শরীরটা নিয়ে উচ্চিংড়ের মতো তিড়বিড়িয়ে লাফিয়ে উঠে বলে, "আচ্ছা! বলব কি না বলব, তা দেখাচ্ছি। চল একবার কর্তাবাবুর কাছে।"

হাত বাড়িয়ে চেপে ধরতে যায় ওর হাতটা। আর লক্ষ্মীছাড়া ছেলেটা কিনা ফট করে রাস্তার ধার থেকে এক টুকরো ভাঙা ইট কুড়িয়ে নিয়ে উঁচিয়ে ধরে বলে, "আর এক-পা এগিয়েছ কি ছুঁড়ছি। গাড়ি ধোওয়ার লোক, তার আবার এত সর্দারি। যাও না, ডেকে আনো না তোমার কর্তাবাবুকে। দেখি কী করেন তিনি আমার। যাও না।"

"অ! শয়তান একখানি। আমি কর্তাবাবুকে ডাকতে যাই আর তুই সেই ফাঁকে ভেগে যাস। কেমন? ওসব চালাকি চলবে না। চল বলছি আমার সঙ্গে।"

"যেতে আমার দায়ে পড়েছে। বললাম যা করছিলে করো। তা নয়! কেবল কথা! সাধে বলেছি ফাঁকিবাজ।" বলে ইটটা উঁচিয়েই দাঁড়িয়ে থাকে।

বটুক আর কালবিলম্ব না করে বোধহয় আত্মরক্ষার্থেই মুখের দু' পাশে হাত আড়াল করে একটু সুর করে জোরালো খ্যানখেনে গলায় হাঁক পাড়ে, "গোবরা আ—আ!"

ছেলেটা হঠাৎ হি-হি করে হেসে ওঠে, "কী বললে? গোবরা? বাঃ। বাঃ! কী একখানা নাম! ভাই বুঝি? তো তোমার নিজের নামটা কী? কাদা? না পচা? না কী শ্যাওলা পাঁক?"

হাসির সঙ্গে কথা। ঝিলিক দিয়ে ওঠে মুক্তোর মতো দাঁতের সারি।

বটুকের মাথা ঝিমঝিমিয়ে আসে।

এ কী ছেলে রে বাবা! কাদের ছেলে। এতটুকু ছেলের মুখে এত কথা! বিচ্ছু না ধানিলঙ্কা!

গোবরা এসে গেল। হাঁপাতে-হাঁপাতে, ছুটে-ছুটে।

"কী গো বটুকদা। অমন আত্তোনাদ করে ডাকলে যে? ওমা। এটা আবার কে? ইট বাগিয়ে কেন?"

বটুক ফোঁসফোঁস করে বলে ওঠে, "ওটা? ওটা হচ্ছে একটা

বিচ্ছু ! পুনকে সাপ ! ধানিলঙ্কা । ছানা শয়তান । ধর তো । দু'জনে মিলে কর্তাবাবুর কাছে ধরে নিয়ে যাই ।"

"হি-হি-হি !" ছেলেটা আবার ধুলো-কাদা মাখা মুখে মুক্তোদাঁতের পাটির ঝিলিক মেরে বলে ওঠে, "উঃ । কী বীরপুরুষ রে । এইটুকু একটা ছেলেকে ধরে নিয়ে যেতে দু'জন লাগবে । ধরে নিয়ে যাবার দরকারটা কী ? চলো না । আমি নিজেই যাচ্ছি । ভয়টা কী ? তোমাদের কর্তাবাবু কী বাঘ, না ভালুক ? না কী প্রাইম মিনিস্টার ?"

"কী ? কী বললি ?"

গোবরা বলে ওঠে, "পাজি যে আবার ইংরিজি কথা কয়গো বটুকদা ।"

"আবার অসভ্য কথা । সবাই সমান । চলো দেখি, কোথায় তোমাদের সেই কর্তাবাবু । বলে দিয়ে মজা দেখাচ্ছি ।" বলেই হঠাৎ একঝলক আলো ছড়িয়ে একসার মুক্তোপাটি দাঁত দেখিয়ে হি-হি করে উঠে বলে, "নাকি তিনিও তোমাদের মতন ? হি-হি, একজন মোটা গুঁফো ভুঁড়িদাস বুড়ো ? তাই তোমরা···"

"ওরে গোবরা !" বটুকহরি চেঁচিয়ে ওঠে, "এ পাজি মানুষের ছ্যানা নয় রে, শয়তানের ছ্যানা । এই বয়েসে এমন বাক্যিবুলি । যা, কর্তাবাবুকে বলগে যা । আমায় তো শাসিয়ে রেখেছে এক-পা এগোলেই ইট ছুঁড়বে ।"

গোবরা ছুট মারে ।

এবং শয়তানের ছানাটি যেই ভাঙা ইটের টুকরোটি উঁচু করে তুলে ধরে, সেই মুক্তোসারি দাঁতের পাটিটি মেলে হাসতে থাকে ।

গোবরা ভিতরে ঢুকে যাওয়া-মাত্রই গোবরার মাসি আসে বাইরে থেকে, একঝুড়ি শাকডাঁটা নিয়ে । মনে হয় বাজার থেকে কেনা নয়, বাগান থেকে সংগ্রহ করা ।

গাড়িটাকে পাশ কাটিয়ে ঢুকতে গিয়েই থমকে বলে, "অ মা । এ আবার কী ? এই পোলাডা এমন মারমুখী হয়ে দাঁইড়ে যে ? অ বটুক ? অ খোকা, কী হয়েচে ? কোথা থেকে এলে গো ?"

'খোকা' শব্দটা শুনে পোলাটি হাতের ইটটা ঈষৎ নামিয়ে বলে, "এই লোকটা ভারী অভদ্র । খারাপ কথা বলে ।"

"অ মা ! তোরে আবার কী খারাপ কতা বলবে ? পুঁচকে একটা···

"ফের ? তুমিও ? বলেছি, ঠিক সবাই সমান ।"

মাসি বলে, "বটুক । কী হয়েচে খুলে বল তো ?"

"বলবার কিছু নেই । ওনাকে পাজি বলা চলবে না । ওটাই হচ্ছে খারাপ কথা ।"

মাসি একটা ফোকলা দাঁতের ফাঁক দিয়ে হেঁ-হেঁ করে হেসে বলে, "তাই বুঝি ? তো কী বলতে হবে ? হেঁ-হেঁ । তো কোথা থেকে এসে উদয় হয়েচিস রে বাবা ? দেকতে তো বেশ চাঁদপানা । হালখানা বস্তির ঘরের মতন । বলি কাদের ছেলে রে তুই ?"

"অ্যাই । 'তুই' বলবে না বলে দিচ্ছি ।"

বটুক বলল, "ওই শোনো মাসি । গোবরা গেছে কর্তাবাবুকে জানাতে ।"

মাসি গলা নামিয়ে বলল, "পাগল ছন্ন নয় তো ? খ্যাপাসনি বাপু । মুকচোক তো দিব্যি । ভদ্দরঘরের মতন রং । মাতা-ফাতা খারাপ হয়ে বোধ হয়···"

ভেতরে ঢুকে যায় গোবরার মাসি ।

বটুক বলে, "ওই উঁচনো ইটটা নামা না বাবা ! ইদিকে তো দাঁত বার করে আছিস । হেসে হেসে মনিষ্যি খুন করিস না কী !"

ছেলেটা নামানো ইটটা ফের উঁচিয়ে বলে, "তুই বলা ছাড়বে কি না ?"

তা বটুক উত্তর দেবার আগেই অন্য ঘটনা ঘটে । গেট ঠেলে বেরিয়ে আসেন কর্তাবাবু । চৌধুরীসাহেব ।

কর্তার পরনে একটি ধবধবে পায়জামা, গায়ে একটি এমব্রডারি-করা পাঞ্জাবি । পায়ে চপ্পল । বছর ষাটেক বয়েস । চেহারা রীতিমত অভিজাত । পিছনে গোবরা ।

গেট ঠেলতে ঠেলতেই বলেন, "কী হে বটুকহরি ? কী ব্যাপার ? তোমার ওপর নাকি ডাকাত পড়েছে ? কই ? আরে এ কী ! হা-হা-হা ! এই না কী ? এই শিশুটির ভয়ে··· হা-হা-হা । ওহে মাস্টার, হঠাৎ ইট হাতে কেন ? নামাও বাপু ! এসো এদিকে ।"

ছেলেটা হাতের ইট নামিয়ে হাতটা ঝাড়তে-ঝাড়তে গাড়ির ওপার থেকে এপারে সরে এসে জোর গলায় বলে ওঠে, "নমস্কার । আপনাকে দেখে তো বেশ জেন্টলম্যান বলেই মনে হচ্ছে, কিন্তু আপনার এইসব লোকজন এমন ইয়ে 'স্মলম্যান' কেন ?"

"কী ম্যান ?"

"বললাম তো । স্মলম্যান । বাংলায় বললে খারাপ শোনায় । এদের একটু ম্যানার্স শেখাতে পারেননি ?"

চৌধুরীসাহেব তাঁর পুরু কাচের চশমার মধ্যে থেকে তীক্ষ্ণ গভীর দৃষ্টিতে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসির সঙ্গে বলেন, "শিখলে তো । জ্ঞানগম্যি থাকলে তো । তোমার সঙ্গে বুঝি খুব খারাপ ভাবে কথা বলেছে এরা ?"

"বলেছেই তো ।"

"ভেরি ব্যাড । তো তোমায় তো মাস্টার, ঠিক চিনতে পারছি না । এ-পাড়ায় নতুন এসেছ বুঝি ?"

ছেলেটা মাথা দুলিয়ে 'হ্যাঁ' জানায় ।

"তো কোন বাড়িটায় এসেছ ? মানে, কিনে, না ভাড়া নিয়ে ?"

"আপনাকে বলেছি, এখানে থাকতে এসেছি ? এমনি কেউ আসে না ?"

"সে তো ঠিক । নিশ্চয় আসে । তো নাম কী ?"

"নামটাম নেই ।"

"নাম নেই । বলো কী হে ? নাম থাকে না, এমন কেউ হয় নাকি ? ছেলেমেয়ে জন্মালেই তো তার একটা করে অন্তত নাম হয় । হয় না ? কারও-কারও তো দু-চারটেও হয় । পোশাকি নাম । আটপৌরে নাম । ডাকার সুবিধেয় ছোট্ট নাম ।"

ছেলেটা তাচ্ছিল্যভরে বলে, "ডাকতে কে সেধেছে ?"

"আরেব্বাস ! এ যে একদম মিলিটারি । তো এটি কিন্তু ঠিক ম্যানার্সের মধ্যে পড়ছে না । নাম জিজ্ঞেস করলে বলতেই হয় । সেটাই নিয়ম ।"

"ঠিক আছে । নাম টম ।"

"টম !"

"কেন ? টম নাম হয় না ?"

"আহা, হবে না কেন ? হওয়ালেই হয় । তা বাড়ি কোথায় ?"

"কেন ? আমার বাড়িতে আপনার দরকার ? এখন হয় তো আবার পুলিশের মতন জেরা শুরু করবেন, বাড়িতে কে আছে ? এখানে কী করতে এসেছি ? আমি চললাম ।"

"আহাহা, চলে যাবে কেন ? ওসব না হয় জিজ্ঞেস করব না । বাড়ির মধ্যে এসে বোসো । বাড়ির বাইরে থেকে ফিরে যাবে, তা কি হয় ? কিছু খাও আমার সঙ্গে ।"

"খাব ? আপনার সঙ্গে ? কেন ? কী জন্য ?"

ছেলেটার ভুরু কুঁচকে ওঠে ।

"কী জন্য আবার । ছোট ছেলেটেলে বেড়াতে এলে, কিছু খেতে দেওয়া নিয়ম নয় ? তোমাদের বাড়িতে এ-নিয়ম নেই ?"

চৌধুরীসাহেবের চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণতর ।

ছেলেটাও সোজা নয়। চট করে বলে ওঠে, "কেন থাকবে না ? তো আমি কী আপনার বাড়িতে বেড়াতে এসেছি ?"

"বেশ তো, তা না-হয় না এলে। আমার বাপু তোমায় বেশ ভাল লাগছে, মাই বয়। এসো, একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট করা যাক।"

ছেলেটার মুখটা একটু উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আবার নিভে যায়। ভুরু কুঁচকে বলে, "আমাকে আপনার ভাল লাগছে কেন ? আমি তো একটা ধুলোকাদামাখা রাস্তার ছেলে।"

"বাঃ। ভাল লাগবার কী কিছু কারণ থাকে ? এমনিই হঠাৎ ভাল লেগে যায়। ধুলোর হাত ধুয়ে নিয়ে বসে পড়ো এসে। তো রাস্তায় হঠাৎ ষাঁড়ে কি গোরু-টোরুতে তাড়া করেছিল না কি ?"

ছেলেটা চোখ পাকিয়ে বলে, "কেন ? ষাঁড়ে তাড়া করতে আসবে কেন ? আমি কি লাল জামা পরে বেড়াচ্ছি ? ষাঁড়েরা লাল দেখলে তেড়ে আসে।"

"ও বাবা তুমি এইটুকু ছেলে, জানো এসব ? আমি ভাবলাম গায়ে-হাতে-মুখে এত কাদার ছোপ, চুলে ধুলো, হয়তো হঠাৎ কোথাও খানাখন্দে পড়ে গিয়ে…জামাটামা ছিঁড়ে…"

ছেলেটা গম্ভীরভাবে বলে, "গরিবদের এইরকমই হয়। খুব গরিব তো।"

তারপর একটু ঢোক গিলে বলে, "গরিবদের তো এইরকম ছেঁড়াখোঁড়া জামাটামাই হয়। আমি চলে যাচ্ছি।"

"কী মুশকিল বললাম একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট করব।"

"নিজের লোকদের নিয়ে করুন গে না।"

"আহা, নিজের লোক কোথায় ?"

ছেলেটা চমকে উঠে বলে, "কেউ নেই আপনার ? ছেলেমেয়ে ?

চৌধুরীসাহেবও একটু ঢোক গিলে বলেন, "আছে। তো তারা সেই অনেক দূরে। আমেরিকায়, জাপানে। এখানে শুধু আমি আর আমার বুড়ি।"

ছেলেটা আরও চোখ কুঁচকে বলে, "বুড়ি মানে ? ওই যে শাক নিয়ে আসছিল ?"

"শাক নিয়ে ? হা-হা-হা ! ও তো গোবরার মাসি। হা-হা-হা। বুড়ি মানে আমার বউ, বুড়োর বউ বুড়ি।"

"ধ্যাত, আপনি মোটেই বুড়ো নন।"

"বলছ ?"

"বলছি তো। বুড়োরা তো সারাক্ষণ রাগ করে, বকবক করে আর মেজাজ দেখায়। আপনি করেন এসব ?"

"না না। ওসব আমার ভাল লাগে না।"

"তা হলে আপনি বুড়ো নন।"

"অলরাইট ! চলো। এবার আমার খাওয়া দেখবে। সে যা খাব না ? তুমি সাতদিনেও খেতে পারবে না ! এই বটুক, হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস যে ? গাড়িটা ধোওয়া শেষ হয়েছে ?"

ছেলেটা প্রায় ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, "হবে কোথা থেকে ? ফাঁকিবাজের রাজা যে। তখন থেকে গাড়িটাকে ভিজিয়ে ফেলে রেখেছে।"

"নে নে, চটপট কাজ সেরে নে। গোবরা বাড়ির মধ্যে গিয়ে বলগে যা, দু'জনের মতো ব্রেকফাস্ট দিতে। ওহে, তুমি, আচ্ছা, তোমার নামটা যেন কী বললে ? টম। তাই না ? হ্যাঁ, টম। তুমি কড়া টোস্ট ভালবাস, না নরম

ছেলেটা একটু তাকিয়ে গম্ভীরভাবে বলে, "গরিবরা তো ব্রেকফাস্টে বাসী রুটি আর গুড় খায়। আর ছেঁড়া জামা পরে।"

বারাসত থানার ও· সি· ফোনের রিসিভারটা হাতে নিয়ে বলেন, "না সার, ওরকম কোনও খবর আসেনি। কত বয়েস বললেন ? বছর সাতেকের মতো ? নাঃ। তেমন কোনও… তা ছাড়া যা ডেসক্রিপশন দিলেন। না না। যাই হোক, আপনার কাছে আটকে রেখেছেন তো ? আর-একটু রাখুন ভুলিয়ে-ভালিয়ে। মনে হচ্ছে এ-এরিয়ার নয়। দূর থেকে এসে পড়েছে। কী যে হয়েছে সার আজকাল। হরবখত এই চলছে। আমার তো ধারণা, বেশির ভাগ ছেলেপিলেই টিভিতে ছবি তোলাবার জন্য…আচ্ছা। ছাড়ছি। ছেলেটাকে ছাড়বেন না। দেখুন। সন্ধেবেলায় টিভির খবরের সময় এরকম কোনও ছেলের জন্য…"

ছেলেটাকে সাবান দিয়ে হাত ধুতে বাথরুমে পাঠিয়ে চৌধুরীসাহেব থানায় টেলিফোন-পর্বটি সেরে নেন।

ইত্যবসরে চৌধুরীগিন্নি তাঁর পুজোপাঠ সেরে খাবার ঘরে এসে বসে খাবার গোছাতে লেগে গেছেন।

টম বাথরুমে ঢুকে হাতমুখ ধুতে ধুতে আয়নায় নিজেকে দেখে ফেলে হি-হি করে হেসে ওঠে। আরে টম-মাস্টার ! তুই কীরকম দেখতে হয়ে গেচিস রে ? কার সাধ্যি চিনতে পারে ? কিন্তু আমার তো এই হল। আর তার এখন কী অবস্থা ! উঃ। রাত্তিরে মশা কামড়ে কামড়ে গা একদম ফুলিয়ে দিয়েছে। আঃ জল লাগিয়ে বেশ আরাম হচ্ছে।

চৌধুরীগিন্নী মনোরমা গলার স্বর নামিয়ে কর্তাকে বলেন, "তুমি ঠিকই বলেছ। কোনও ভাল ঘরের ছেলে। কীভাবে বেরিয়ে পড়ে, হারিয়ে গিয়ে…"

চৌধুরী ফোনের ব্যাপার সেরে এসে টেবিলের ধারে বসেছেন। তিনি গলার স্বর আরও মৃদু করে বলেন, "হারিয়ে গিয়ে নয়। ইচ্ছে করে হারিয়ে। শুনলে তো কী বটুকের কাছে ? কী চোটপাট। ভয়ভাবনার লেশ নেই। তখন কীভাবে ওর বাড়ির ঠিকানাটা বার করা যায় ! মহা ধুরন্ধর ছেলে। ভুলিয়ে-ভালিয়ে কিছু হবে বলে মনে হয় না। …রীতিমত ভাল ঘরের বলেই মনে হচ্ছে। দেখলে না বাথরুমে ঢুকে বাথটব শাওয়ার বেসিন কোনও কিছু দেখেই অজানা বলে থতমত খেল না। আমি একবার বলেছিলাম ইচ্ছে হলে, চানও সেরে নিতে পারো। তো বলল, কী জ্বালা, আহা, আমি যেন আর-এক সেট জামা-প্যান্ট নিয়ে ঘুরছি।"

বাথরুমের দিক থেকে চলে এল টম একটা শুকনো তোয়ালে দিয়ে হাত মুছতে মুছতে। সাজানো টেবিলের দিকে একটু তাকিয়ে দেখল। উদার গলায় বলে উঠল, "বাড়িতে বুঝি বাসী রুটি নেই ? থাক গে, টোস্টও চলতে পারে। কড়া টোস্টই তো বেস্ট।"

"ঠিক তোমার মতন বয়েসের একটি নাতি আছে আমার।" মিষ্টির প্লেটটি টমের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন মনোরমা।

বলতে যা দেরি। ছিটকে উঠল টম।

"ঠিক আমার মতন বয়সের মানে ? আপনি আমার বয়েস জানেন বুঝি ?"

"আহা আন্দাজ তো থাকে একটা। নিশ্চয় তোমার বয়েস সাড়ে ছয়-সাত।"

"কারেক্ট।"

মধুর হাসি হাসে টম, "সাতদিন আগে সাত হয়েছি। কই আপনার নাতি ?"

মনোরমা দুঃখের গলায় বলেন, "সে কী আর এখানে থাকে বাবা ? মা-বাপের সঙ্গে সেই বিলেত-আমেরিকায় থাকে।"

"আহা কী বুদ্ধি ! বিলেত আর আমেরিকা এক হল ?"

"ওই হল আর কী ? এরোপ্লেনে চড়ে আকাশে উড়ে উড়ে চলে

যাওয়া তো। আমি তাকেই বলি বিলেত-আমেরিকা।"

"ভুল-ভুল কথা বলতেই ভালবাসে বুড়োলোকেরা। চিরকাল দেখছি। এ কী, এত মিষ্টি-ফিস্টি দিচ্ছেন কেন আমায় ? সাতজন্মে মিষ্টি খাই না আমি।"

চিরকাল। সাতজন্ম। যেন কতই বয়েসের মানুষ।

সাতদিন আগে সাত বছরের হওয়ার হিসেব হয়ে গেছে।

চৌধুরীসাহেব অতি নিবিষ্টভাবে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন। এখন বলে উঠলেন, "তা হলে **গুড়-রুটি** খাওয়া চলে কী করে ? গুড় মিষ্টি নয় ?"

"আমি খাই বলেছি ?" টমের তীক্ষ্ণ উত্তর, "শুধু তো বলেছি, গরিবদের ওটাই ব্রেকফাস্ট।"

যুক্তিসম্মত আর আইনসম্মত উত্তর। তাই চৌধুরীসাহেবকে মেনে নিতে হয়, "হ্যাঁ। হ্যাঁ তা ঠিক। তা হলে আর দুটো টোস্টই খাও।"

"ইস, আমার পেটটা ফেটে যাক এই চান বুঝি ?"

মনোরমা হেসে উঠলেন। বললেন, "তার বদলে একটু কর্নফ্লেক্স চলতে পারে, কেমন ?"

এঁরা যেন চেষ্টা করে চলছেন, এই রাস্তার ছেলেটা ছদ্মবেশী রাজপুত্তুর-টুত্তুর কি না সেটা আবিষ্কার করতে। খাওয়ার ধরন আর অভ্যাস দেখলে তো অনেকটাই বোঝা যায় এ কোন ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছে। নিশ্চিত হচ্ছেন ভাল ঘরই। এর পরের উত্তরও সেই ধারণার অনুকূলই হল। টম সতেজে বলল, "ও আমার বিচ্ছিরি লাগে।"

আর তার পরক্ষণেই বলে উঠল, "এ-বাড়িতে ভূত আছে ?"

"ভূত !"

"আহা ! ন্যাকা অবতার ! যেন আকাশ থেকে পড়লেন। সাতজন্মে ভূত কথাটা শোনেননিই।"

"আহা তা শুনব না কেন ? ছেলেবেলায় ভূতের গল্প শুনে-শুনেই তো মানুষ হয়েছি।"

"অ্যাঁ, কে গল্প বলত ?"

"এই আমার ঠাকুমা আর-এক পিসিমা।"

"সব ছোটছেলেদেরই বেশ ঠাকুমা-পিসিমা এই সব ভাল-ভাল জিনিস থাকে।"

"তোমার নেই বুঝি ?"

"আমার কথা হচ্ছে কেন ? ভুলিয়ে-ভুলিয়ে আমার সব কথা জেনে নেবার মতলব, না ! ভারী চালাক।"

"আরে হঠাৎ ভূতের কথা বললে, তাই ভাবছিলাম..."

টম খুব বিজ্ঞভাবে বলে, "এই রকম পুরনো-পুরনো মস্ত-মস্ত বাড়িতেই ভূত থাকে।"

গোরা বলল, "ব্যাপারটা কী হল বলো তো বটুকদা ? পাজিটাকে নিয়ে কর্তা-গিন্নি নাতির আদর করতে বসলেন কেন ?"

বটুক দু' হাত উলটে বলল, "ভগবান জানেন। বড়মানুষের মর্জি। আমরা এই দু-দুটো বছর প্রাণ দিয়ে খাটছি, তবু জন্মে কোনওদিন আমাদেরকে ডাইনিং টেবিলে বসিয়ে খাইয়েছেন ?"

এরাও ব্রেকফাস্টে বসেছে এখন।

গোবরার মাসি রান্নাঘরে গিয়ে-গিয়ে রাঁধুনি বংশীলালের কাছ থেকে এনে-এনে সাপ্লাই দিচ্ছে গরম-গরম পরোটা আর আলু-চচ্চড়ি তার সঙ্গে জিলিপি।

খাওয়া-দাওয়া এ-বাড়িতে খুব উত্তম। বেশ আনন্দেই থাকে এরা। গোবরার মাসি রান্নাঘরের হেল্পার, কাজেই ভাল-মন্দটা একটু বেশিই জোটে। কিন্তু আজ ওই একটা হতচ্ছাড়া রাস্তার ছেলেকে নিয়ে কর্তা-গিন্নির নাতির আদরতুল্য আদর দেখে হিংসেয় প্রাণ জ্বলে গেল এদের।

গোবরার মাসিরও তাই।

সে মনে-মনে বলল, 'কেন, আমার গোবরাই কী কালো কুচ্ছিত ? কই, তাকে তো এমন আদর দেখি না।' ডাক দিয়ে বলল, "কই গো বংশীঠাকুর, আর দু'খানা পরোটা হবে ? আমি আর বাতের পা নিয়ে হাঁটতে পারছি না।"

বংশী বেরিয়ে এল রান্নাঘর থেকে, "কী বাবা বটুকহরি। তোমরা দু'জনায় তো সব পরোটা সেঁটে দিলে দেখছি। আরও চাই ? তা হলে মাসিকে বলো আরও ময়দা মাখতে।"

"ঠিক আছে। ঠিক আছে। আর দরকার নেই।"

বটুক বলে, "মাসি, আর দু'খানা জিলিপি বরং দাও। তো হ্যাঁ ঠাকুরমশাই, কর্তা-গিন্নি ওই রাস্তার পাজিটাকে খাবার টেবিলে বসিয়ে খাওয়াচ্ছেন কেন বলো তো ?"

বংশী হাতের খুন্তিটা উঁচিয়ে বলে, "বসিয়েছে তো বসিয়েছে। তাতে তোরই বা কী ? আমারই বা কী ? অ্যাঁ ? খাচ্ছিস খা। মনিব নিয়ে কথা কিসের ?"

"বাবাঃ। বংশীদা যেন একটা মিলিটারি।"

"না না। আমি ওসব পসন্দ করি না। এমন মনিব আর পাবি ?"

"তা ঠিক। এমন মনিব দুর্লভ ! তবু কোথাকার একটা ছেলে হঠাৎ 'পুজ্যি' হবে এটা কী করে সহ্য হয় ?"

চৌধুরীসাহেব বললেন, "আরে, তুমি যে দেখছি যাবার জন্য একপায়ে খাড়া ! তো এই মস্ত পুরনো বাড়িটা একটু ঘুরেফিরে দেখে যাও, ভূত-টুত আছে কি না ?"

টমের অবশ্য কথাটা শুনে মুখটা একটু উজ্জ্বল দেখাল। কারণ এই

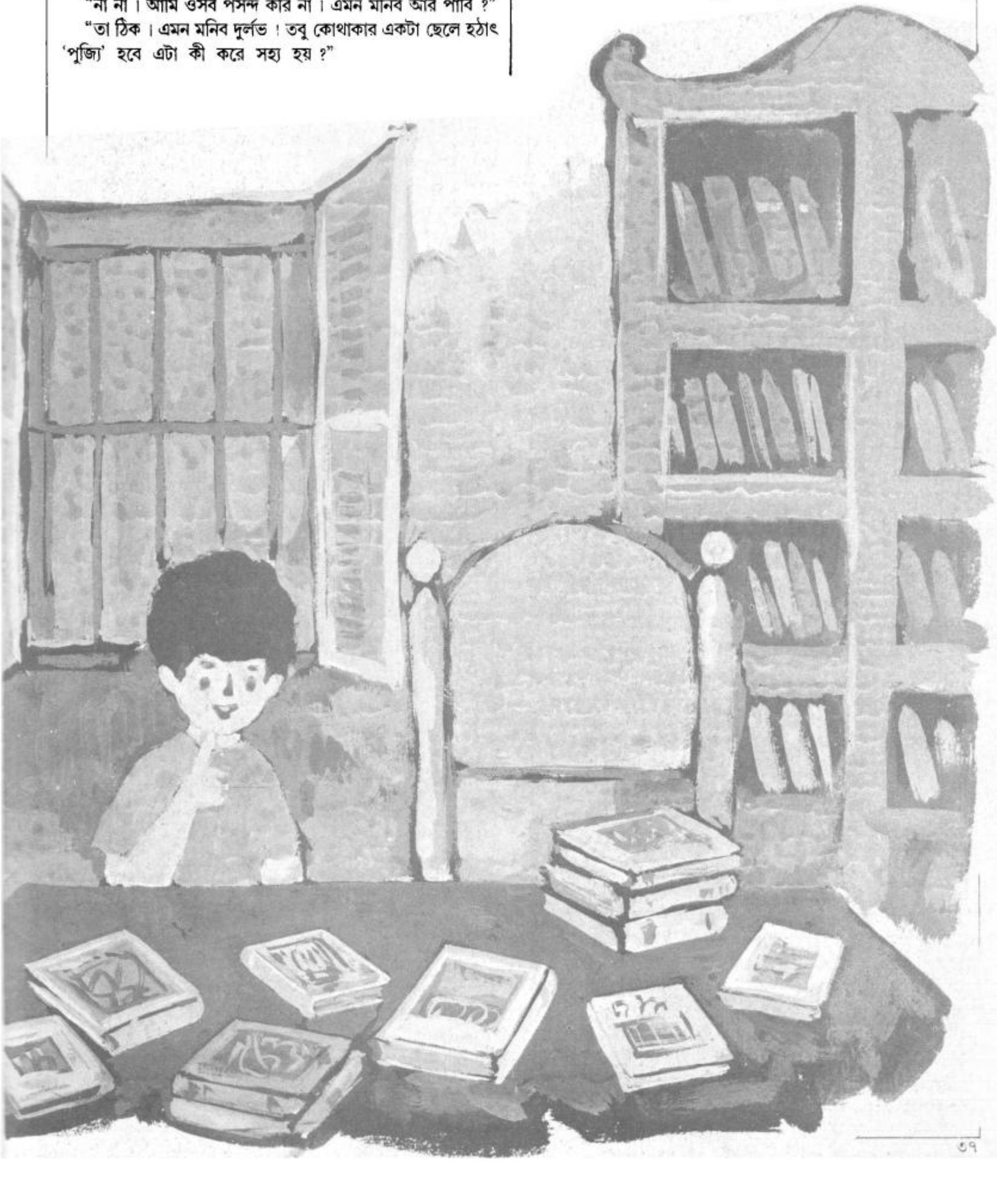

পুরনো ফ্যাশানের বৃহৎ তিনতলা বাড়িটাকে দেখে পর্যন্তই ওর মনে হচ্ছিল, এই রকম বাড়িতেই ভূত থাকে। তবু টমের ভুরু কুঁচকে গেল।

"আপনার মতলবটা কী বলুন তো? আমায় গুম করে আটকে ফেলতে চান, না কি?"

মাত্র সাতদিন আগে সাত বছরে পড়া এই ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে তাজ্জব হন চৌধুরীসাহেব। এই বয়েসে এত কথা শিখল কী করে ছেলেটা? বললেন, "তোমায় আটকে ফেলে আমার লাভ?"

ছেলেটা অম্লান মুখে হি-হি করে হেসে বলে, "তা কী জানি। হয়তো ভাবছেন ধরে লুকিয়ে রেখে অনেক অনেক টাকা মুক্তিপণ আদায় করবেন।"

"কী পণ?"

চমকে ওঠেন চৌধুরীসাহেব। এ কী ছেলে রে বাবা

ছেলেটি ততক্ষণে আরও হি-হি করে বলে, "কী বুদ্ধু লোক ভাগ্যে জুটেছে রে বাবা। মুক্তিপণ জানেন না? আমায় আটকে রেখে আমার বাড়িতে চিঠি লিখে দেবেন; এত-এত টাকা চাই। না হলে ছেলে ফেরত পাবেন না। হি-হি, সে আশায় ছাই দিন।"

চৌধুরী হতাশা গলায় বলেন, "তুমি এইটুকু ছেলে, এত কথা শিখলে কোথা থেকে বলো তো?"

"এতটুকু মানে? বললাম না সাতদিন আগে সাত বছরে পড়েছি।"

"ও তা হলে তো মস্তবড়। তা তোমার যখন আমায় এত সন্দেহ, তখন আর বাড়ি দেখে কাজ নেই।"

সঙ্গে সঙ্গে টমের মত বদলায়, "ঠিক আছে, সন্দেহ করব না। এইরকম সব হয় কিনা। দেখি বাড়িটা।...আরে সিঁড়িটা কী চওড়া।...সিঁড়ির ঘরে বুঝি যত রাজ্যের আজেবাজে জিনিস থাকে? ভূতেদের পক্ষে এইরকম ঘরই বেস্ট।"

ভূত সম্পর্কে বেশ ওয়াকিবহাল বলেই মনে হচ্ছে টমকে।

দোতলায় উঠে আসেন চৌধুরীসাহেব। আর সামনের হলে ঢুকেই টম দিশেহারা গলায় বলে ওঠে, "আরেব্বাস! কত বই? এটা বুঝি আপনার লাইব্রেরি ঘর? কী কাণ্ড। এত এত ছোটদের বই কেন আপনি কী ছোট ছেলে?"

"ও আমার নাতির জন্য কিনে কিনে রাখি।"

"ও। সেই বিলেত-আমেরিকার নাতি? সে এসে এই সব বই পড়বে? এই 'রক্তচোষা ড্রাকুলা', 'হিমালয়ের ভয়ঙ্কর', 'মাঝরাত্রে ভয়ানক'—হি-হি। পড়তেই পারবে না।"

চৌধুরী অবাক হয়ে বলেন, "পড়তেই পারবে না? কেন? একথা কে বলল তোমায়?"

"কে আবার বলবে। আমি নিজে নিজেই সব জেনে যাই। ভুটানি-পিসির নাতিটা তো দশ-বারো বছরের। এক লাইনও পড়তে পারে না।"

"বলো কী? কোথায় থাকে তারা? জঙ্গলে না কি?"

"জঙ্গলে কেন, আপনার আমেরিকায়। খালি ইংরিজি বলে। ভুটানি-পিসি বলে, নাতি এলে আর আমার কী লাভ? একটা কথাও কইতে পাই না তার সঙ্গে। আপনাদের নাতি, হি-হি, তাই...আরেব্বাস। এ বইটা কে লিখেছে? 'ভরদুপুরে ভূতের ঠ্যালা'। একটু দেখব?"

চৌধুরীসাহেব এই জ্ঞানবৃদ্ধ শিশুর ব্যাপারে ক্ষণে-ক্ষণেই তাজ্জব বনে যাচ্ছেন। তবে নিঃসন্দেহ হচ্ছেন, রীতিমত বিশিষ্ট ঘরেরই ছেলে। কিন্তু ইতিহাসটা কী? কেউ কি চুরি করে নিয়ে এসেছিল? তারপর তার কবল থেকে পালিয়ে এসেছে? কিন্তু তা হলে বাড়ির ঠিকানা, নাম-পরিচয় দিতে নারাজ কেন? আর সাজটাই-বা এ-হেন কেন।

তা এসব তো মনের মধ্যেকার কথা। মুখে মহা উৎসাহে বলে ওঠেন, "নিশ্চয়। নিশ্চয়। শুধু দেখবে কেন? পড়ো না। আলমারির চাবি তো খোলাই রয়েছে। তোমার যেটা ইচ্ছে পড়ো।"

অনুমতি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সেই **'আরেব্বাস'** বইটি টমের হাতে চলে এসেছে এবং স্থান-কাল-অবস্থা সব ভুলে টম তার মধ্যে ডুবে গেছে।

এই ফাঁকে কি চৌধুরীসাহেব একবার থানায় ঘুরে আসবেন? অবশ্য মনোরমাকে আর কাজের লোকগুলোকে বলে যাবেন, যেন ছেলেটা না পালায়।

নীচে নেমে এসে বললেন, "গোবরা, বটুক কই রে? বল, গাড়িটা বার করতে।"

গোবরা মাথা চুলকে বলে, "বটুকদা নাই কর্তাবাবু। সে এখন মাথায় হাত চাপড়ে রাস্তায় ঘুরতে গেছে। আমিও গেছলাম। তো মাসি ডাকল, তাই..."

চৌধুরীসাহেব অবাক হয়ে বললেন, "হঠাৎ মাথায় হাত চাপড়াবার কী হল?"

"আজ্ঞে, সে আপনারে বলতে পারছিনে। বড় ভয়ানক কাণ্ড।"

"থাম পাগলামি করতে হবে না। হয়েছেটা কী?"

"আজ্ঞে, গাড়িটা...

"গাড়িটা? গাড়িটা মানে?"

"আজ্ঞে, গাড়িটা হাওয়া হয়ে গেছে।"

"থাপ্পড় খাবি গোবরা। গাড়িটা হাওয়া হয়ে গেছে মানে?"

"মানে তো ওই একটাই কর্তাবাবু। গাড়িটাকে ধোয়াধুয়ির পর, ওই পাজি ছেলেটাকে নিয়ে বচসা করতে করতে দেরি হয়ে গেছল তো তো বটুকদা বলল, কর্তাবাবু তো একটু পরেই বেরোবেন, গাড়িটাকে আর তুলে কাজ নাই। তো আমরা ইয়ে, ভেতরে গেছি জলখাবার খেতে। ইয়ে, তারপর বেরিয়ে দ্যাখে, গাড়ি নাই।"

"গাড়ি নাই।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ কর্তাবাবু। গাড়ির জায়গাটা খাঁ খাঁ করতেছে। তাই দেখে বটুকদা মাথা চাপড়াতে চাপড়াতে..."

চৌধুরীসাহেব চেঁচিয়ে উঠে বলেন, "তা খবরটা আমায় না জানিয়ে মাথা চাপড়াতে চাপড়াতে গেলেন কোথায় বাবু?"

"আজ্ঞে, ভাবল, যদি কোনও বদলোক ইদিক-উদিক টেনে নিয়ে গিয়ে থাকে।"

"রাবিশ। গাড়িটাকে এদিক-ওদিক টেনে নিয়ে যাবে? বেড়ালে ইলিশ মাছটা টেনে নিয়ে যাবার মতো? উঃ। একদিনেই কী যত ঝামেলা। ওই ছেলেটা কোথা থেকে এল। আবার..."

গোবরা হঠাৎ বীরস্বরে বলে ওঠে, "ছেলেটা তো নিজেই বিদেয় হয়ে যেতে চাইছিল কর্তাবাবু। আপনিই তাকে পুষ্যিপুত্তুরের মতন আদর করে..."

"থাম। তুই আর বটুক দুটোই হয়েছিস সমান। দেখি বাবু কোথায় কী করে বেড়াচ্ছেন।"

বলে গেটের দিকে এগোতে যেতেই মনোরমা ঘর থেকে বলে উঠলেন, "গোবরা, বাবুকে বল, ফোন।"

ফিরে এসে ফোন ধরতে হল।

ধরে? ধরে কী শুনলেন? নিজের কানকে কী বিশ্বাস করতে পারছেন?

"থানা থেকে বলছি সার। চক্রবর্তী। বলছি—সকালে

যে-ছেলেটার কথা বলছিলেন, সেটাকে বোধহয় আটকে রাখতে পারেননি ? মহা বজ্জাত ছেলে সার। ওইটুকুন ছেলে কিনা...."

"কী যা-তা বলছেন চক্রবর্তী ? ছেলেটা তো আমার ঘরে বসে।"

"তাই না কি ? তা হলে ?" চক্রবর্তী বলল, "কিন্তু, মানে আপনি যা ডেসক্রিপশন দিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি একটা ছেলে সার নিজে গাড়ি চালিয়ে..."

"নিজে গাড়ি চালিয়ে...

"হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই তো বলছি সার। ওই পুঁচকে ছেলেটা কিনা দিব্যি গাড়ি চালিয়ে রাস্তায় যাচ্ছিল। তা হঠাৎ আমাদের রামদিনের চোখে পড়ায় সে গিয়ে চেঁচামেচি করে বলেছে গাড়ি থামা। দেখি তোর লাইসেন্স আছে কি না। তাই শুনে জোরে স্পিড দিয়ে ভোঁ-কাট্টা। রামদিন বলছিল গাড়ির নম্বরটা নিয়ে নিয়েছিল। সেটা নাকি সার..."

"হ্যাঁ আমার।"

চৌধুরীসাহেব এতক্ষণে একটি কথা বলেন। "আমারই গাড়ি। হঠাৎ বাড়ির সামনে থেকে হাওয়া হয়ে গেছে। তবে আসামি অন্য। সে ছেলেটা তো বছর সাতেকের।"

"আজ্ঞে রামদিন যা বলল..."

"রাখুন আপনার রামদিন। সক্কালবেলাই বোধ হয় মাত্রা চড়িয়েছে। সে ছেলে আমার ঘরে বসে গল্পের বই পড়ছে। ভাল ঘরের ছেলে বলেই মনে হচ্ছে। তো আপনার রামদিনের সামনে দিয়েই একটা পুঁচকে ছেলে গাড়ি হাঁকিয়ে হাওয়া হয়ে গেল ?"

"তাই তো বলল সার !"

চৌধুরীসাহেব একদা পুলিশ বিভাগেরই একজন হর্তাকর্তা ছিলেন। অবসর নিয়েছেন বছর তিনেক। তবে থানা মহলে এখনও সারই আছেন। জোরের সঙ্গেই কথা বলেন। বললেন, "বলেছে নেশার ঝোঁকে। কিন্তু এই বারাসতের মতো ছোট জায়গায় এক্ষুনি কোথায় হাওয়া হয়ে যাবে ?"

চক্রবর্তী একটু হাসলেন, "বারাসতটা তো আর কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা নেই সার ? হাইওয়ে ধরে 'হুশ্' করে বেরিয়ে গেলে কে কী করবে ?"

"আশ্চর্য !" চৌধুরীসাহেব রাগের গলায় বলেন, "এদিকে বলছেন তো একটা বাচ্চা ছেলে..."

"বাচ্চা ! এ-যুগে বাচ্চারা কী আর বাচ্চা সার ? স্রেফ বিচ্ছু ! কেন ? কাগজে পড়েননি ? 'ওদেশে' একটা পাঁচ বছরের ছেলে গাড়ি চালিয়ে...."

"সে হচ্ছে ওদেশের কথা চক্রবর্তী !"

চক্রবর্তী হতাশভাবে বলেন, "ওদেশ-এদেশের তফাত ক্রমেই ঘুচে যাচ্ছে সার, বাদে টাকাকড়ির-টড়ির অবস্থায়। আর খেলাটেলায় সোনা জেতায়...

"ঠিক আছে। ঠিক আছে। আপনার রামদিন যে গাড়ির নম্বরটা নিয়েছিল, এতেই তাকে ধন্যবাদ দেবেন।"

টেলিফোন নামিয়ে চৌধুরীসাহেব হঠাৎ যেন কেমন কন্টকিত হলেন। ছেলেটা দোতলাতেই আছে তো ? না কী...

তারপর মনে-মনে হাসলেন। না থাকলেও ইতিমধ্যে তাঁর গাড়িখানাকে হাতিয়ে চলে যেতে পারে না অবশ্যই। সময়ের অঙ্কে মিলবে না।

তবু আস্তে-আস্তে আবার দোতলায় উঠে এলেন। আর সিঁড়ির মুখ থেকেই একটা খিলখিল হাসি শুনতে পেলেন। হাসছে কে ? সেই ছেলেটাই মনে হচ্ছে। ইতিমধ্যে কে আবার ওর কাছে এসে হাজির হয়েছে।

তাড়াতাড়ি এসে দ্যাখেন হরেকেষ্ট। আর কেউ নেই, ছেলেটা একাই হাসছে খিলখিলিয়ে। হাতে বইটা ধরা। তার মানে বইয়ের মধ্যেই হাসির খোরাক রয়েছে।

পিঠটা দেখা যাচ্ছে। ফালাফালা গেঞ্জিটার মধ্যে দিয়ে পিঠের রংটা দেখা যাচ্ছে। যেন ছেঁড়া মেঘের মাঝখান থেকে চাঁদের আলো। কাছে এসে বললেন, "খুব হাসির বই বুঝি ?"

"ভীষণ !"

"ভূতের গল্প তো ভয়ের হবার কথা হে।"

"ভূত ? আসলে তো ভূত না কচুপোড়া ! স্রেফ চালাকি ! ভূতের ওঝা আর তার ভাগ্নেতে মিলে ষড়যন্ত্র ! ভাগ্নে ভূত সেজে লোকের বাড়িতে যতসব উপদ্রব করে, আর মামা গিয়ে মন্তর পড়ে বাড়ির ভূত ছাড়ায়। তো একদিন ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে গিয়ে ভূতবাবাজির যা না অবস্থা ! হি-হি-হি। পিটনচণ্ডীর চোটে হি-হি, সব বলে ফেলে—মামাকেও তখন লোকে হি-হি-হি-হি। ....যেমন না চোরেদের সঙ্গে পুলিশের ষড়যন্ত্র থাকে, হি-হি..."

চৌধুরীসাহেব চমকে উঠে বলেন, "চোরেদের সঙ্গে পুলিশের ষড়যন্ত্র থাকে ?"

"থাকে না ? জানেন না নাকি ? পৃথিবীসুদ্ধু সবাই তো জানে !"

চৌধুরীসাহেব সোফায় বসে পড়ে বলেন, "তোমার বয়েসটা সাত, না সত্তর বলো তো ?"

"সত্তর ? এ মা ! কী অদ্ভুত কথাই যে বলেন আপনি !"

"অদ্ভুত কথা আমি বলি না তুমি বলো, তাই ভাবছি। এই বয়েসে তুমি পৃথিবীর সব খবর জেনে ফেলেছ কী করে ? অ্যাঁ ?"

"টম অবজ্ঞাভরে বলে, "এসব জানতে আবার কষ্ট আছে নাকি ? এমনিই তো শেখা হয়ে যায়।"

চৌধুরীসাহেব হঠাৎ বলে ওঠেন, "তা তুমি যে স্কুলে পড়তে, সেখানে..."

টম ছিটকে ওঠে, "কে বলেছে আমি স্কুলে পড়তাম ? রাস্তার ছেলেরা স্কুলে পড়ে ? আপনি না—খুব ইয়ে লোক। চালাকি করে জেনে নেবার....আমি চলে যাচ্ছি।"

"কী মুশকিল। রেগে যাচ্ছ কেন ? এতসব বইটই পড়তে পারো, ভাবলাম হয়তো স্কুলে পড়েছ। চলে যাচ্ছ যে ? বইটা শেষ করো।"

"ঠিক আছে। শেষ করেই চলে যাব।"

চৌধুরী উদাস গলায় বলেন, "তা তো যাবেই। আমি তো আর তোমায় আটকে রাখব না ? তবে এখন আমার মনটা খারাপ—তাই বলছিলাম..."

"মনখারাপ ? কেন ?"

"কেন জানো ? আমার গাড়িটা হঠাৎ লোপাট হয়ে গেছে।"

"লোপাট ? মানে চুরি ?"

"তা ছাড়া আর কী ?"

"কোন গাড়িটা ? সকালের সেইটা ?"

"তাই তো। আমার তো সবেধন নীলমণি ওই একটাই গাড়ি। যেখানে ছিল সেখান থেকেই হঠাৎ হাওয়া। তো এইমাত্র থানা থেকে খবর দিল রাস্তায় নাকি ঠিক তোমার মতো একটি ছেলেকে গাড়ি চালিয়ে চলে যেতে দেখে গাড়ি আটকে লাইসেন্স আছে কি না জানতে চাইতেই..."

টম ক্রুদ্ধ গর্জনে বলে, "ঠিক আমার মতন ছেলে মানে ? থানার লোক আমায় দেখেছে ?"

চৌধুরীসাহেব প্রমাদ গনেন। নিজের ভুলটা বুঝতে পারেন। তাড়াতাড়ি সামলালেন, "না, মানে ওরা কি আর তোমার মতো বলেছে ? তবে যা বর্ণনা দিল...তাতেই ! মানে ওরা বলল, বছর

ভারতের সবচেয়ে বেশী বিক্রীর ক্যামেরা

Snapper

স্ন্যাপার আপনার পয়সার পুরোপুরি মূল্য উসুল করে। মডেলের বিরাট শ্রেণী—আর, এমন একেকটি অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয় এ, যার দরুণ এক অতুলনীয় ক্যামেরা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেজন্যেই তো অন্য যে কোনো ক্যামেরার তুলনায়, স্ন্যাপার অনেক বেশী লোকেদের হাসিমুখের দেয়, পরিচয়।

Snapper ক্যামেরা

হাসিমুখের দেয় পরিচয়!

আগফা গেভার্ট ইণ্ডিয়া কর্তৃক মার্কেট করা হয়েছে।

ULKA-11402 BEN

সাত-আট মতো বয়েসের ছেলে, পিঠ-ছেঁড়া গেঞ্জি আর পায়া-ছেঁড়া হাফ-প্যান্ট পরা। গায়ে ধুলো-বালি-কাদার ছাপ। তাই বললাম, তোমার মতো। তো মনে হচ্ছে ভুল দেখেছে, অতটুকু ছেলে কি আর গাড়ি চালাতে পারে?”

“কেন পারবে না? খুব পারে। গাড়ি চালানো আবার কি শক্ত?”

“তা হলেই তো মুশকিল। মনে হচ্ছে আমার ওই গাড়িটাই…”

“পুলিশে ধরেছে ছেলেটাকে?”

“ধরবে কী, লাইসেন্স দেখতে চাইতেই তো ভোঁ-দৌড়।”

টম হঠাৎ হাততালি দিয়ে বলে ওঠে, “কী মজা! কী মজা দুয়ো। দুয়ো!”

চৌধুরী তীক্ষ্ণ চোখে তাকান।

“আরে! কী ব্যাপার? আমার গাড়িটা চুরি হয়ে গেল, আর তুমি বলছ কী মজা!”

টমও চট করে নিজেকে সামলে নেয়। ফের চেয়ারে বসে পড়ে বলে,“গাড়িটার জন্য তো বলিনি। পুলিশ হেরে গেল সেটাই মজা! ধরতে পারলেই তো ছেলেটাকে পিটনচণ্ডী দিয়ে শেষ করে ফেলত। ছোট ছেলেটা মার খেলে আপনার ভাল লাগত? গাড়ি হারালে তো আবার কেনা যায়, আর ছেলেটা মরে গেলে?”

তারপরেই বইটা ফের হাতে নিয়ে গম্ভীরভাবে বলে, “আমি এখন আরও বই পড়ব।”

মুখে-চোখে যেন বেশ একটু নিশ্চিন্ততার ভাব।

ছেলেটাকে কী ভাবে অন্তত সন্ধে পর্যন্ত আটকে রাখা যায় এই ভেবেই অস্থির হচ্ছিলেন চৌধুরী, হঠাৎ আবার চাঁদের ওপর চুড়ো, এই গাড়ি হারানো! নিজে যে বেরিয়ে পড়বেন, তাই বা কিসে চেপে? ট্যাক্সিতে? …বেরিয়ে পড়লে যদি ছেলেটা পালায়? মস্ত একটা দায়িত্ব বোধ করছেন চৌধুরীসাহেব।

হঠাৎ যদি দূরদর্শনের পরদায় ছেলেটার ছবি ভেসে ওঠে নিরুদ্দেশের তালিকায়? আর দ্যাখেন, ছেলেটা ক’ ঘণ্টা আগেও তাঁর বাড়িতে ছিল। তা হলে? নিজেকে ক্ষমা করতে পারা যাবে? বাড়ি থেকে নড়া চলবে না আপাতত। অতএব ফোনের সামনেই আসন গ্রহণ!

“কী হল চক্রবর্তী? কোনও হদিস পেলেন? কী বলছেন? চারিদিকে লোক পাঠিয়েছেন? একজন খবর দিয়েছে কোনওখানের একটা খাবারের দোকানের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে একগাদা খাবার কিনে গাড়িতে তুলে নিয়ে আবার সটকেছে? …আশ্চর্য! বলছেন একটা বাচ্চা ছেলে! যতই ‘বাচ্চা’আর ‘বিচ্ছু’ হোক, গাড়ি চালানোর দৌড়টা কতই হবে? …কী বলছেন? আরও এক জায়গায় নাকি পুলিশে আটকেছিল লাইসেন্স দেখতে চেয়ে? এমন জোরে গাড়ি চালিয়ে হাওয়া হয়ে গেল, ধরতে পারা গেল না? …আমার মনে হচ্ছে আপনাদের দেখার ভুল। হয়তো কোনও বেঁটেখাটো লোক…কী বলছেন? ছোট ছেলেই? রং ফর্সা? মুখ সুশ্রী? …কোঁকড়া চুল? একদম বছর সাতেকের মতো ছেলে! তাজ্জব! দেখুন, গরিবের গাড়িটা যদি কোনও ভাবে উদ্ধার করতে পারেন? নম্বরটা পেয়ে গেছেন যখন? …কী বলছেন? নিজেকে গরিব বলছি কেন? তা রিটায়ার্ড মানুষ গরিব ছাড়া আর কী? ওঃ। না। সে ঠিক আছে। গল্পের বইয়ে ডুবে গেছে। অনেক পড়েটড়ে মনে হচ্ছে। ইস, কোনও মতে যদি…কী বললেন? লালবাজারে ফোন করেছিলেন? দু-চার দিনের মধ্যে ঠিক ও-ধরনের কোনও ছেলের হারানোর খবর আসেনি। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই তো বলছি। সবজান্তা ছেলে একখানি। হতেও পারে গাড়ি চোরও ওই বয়েসেরই। ঘর থেকে পালিয়ে আসা।”

তখনকার মতো ফোন রাখেন।

ব্যাপারটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। এমন একটা ছেলেকে হারিয়ে মা-বাপ উতলা হচ্ছেন না? চারিদিকে হুলিয়া করছেন না? মা-বাপ যদি নাও করেন, কেউ তো আছে? তাঁর দায়িত্ব নেই?

এদিকে উতলা হচ্ছেন মনোরমা। “ও ছেলে! অনেক তো বেলা হয়ে গেল। ভাত খাওয়ার সময় পার হয়ে যাচ্ছে। বাড়ির কর্তা তো ‘গাড়ি-গাড়ি’ করে…তো তুমি বাপু চানটা করে নাও!”

টমের হাতে এখন অন্য একটা বই। এবং কোলের ওপর বেশ খানকয়েক।

এখন মনোরমাকে ডাকতে আসতে দেখে চমকে বলে ওঠে, “আঃ। আমি কী এখানে থাকতে এসেছি? চান করব! ভাত খাব! মাথাখারাপ। এই বইটা শেষ করেই চলে যাব!”

“বাঃ। চলে যাবে? না খেয়ে?”

“আঃ। তখন তো কত খেলাম।”

“সে তো কোনকালে! এখন কঁটা বেজেছে জানো? পাক্কা দেড়টা। চলো চলো, চানটা করে নিয়ে…”

টম উঠে দাঁড়িয়ে বলে, “আঃ। একটু শান্তিতে বই পড়বারও উপায় নেই! চান করলে জামা ভিজে যাবে না?”

“আহা। আমি তোমার জন্য শুকনো জামা-প্যাণ্ট রেখেছি।”

টম ছটফটিয়ে ওঠে, “আমি ওই বাড়ির কর্তার মস্ত শার্ট-প্যাণ্ট পরব?”

মনোরমা হেসে ফেলেন, “তাই কখনও হয়? আমার নাতির কত জামা পড়ে রয়েছে…”

টম গম্ভীর ভাবে বলে, “পরের পুরনো জামা পরতে যাব কেন?”

“পুরনো কী গো? তাই কখনও পরতে বলি আমি? নতুন-নতুন সব জামা-টামা। প্লেনে ভারী হবে বলে নিয়ে যায়নি। চলো বাবা। কত খিদে পেয়ে গেছে!”

“কে বলেছে খিদে পেয়েছে?”

“কে আবার বলবে? মুখ দেখেই বোঝা যায়।”

টম অনমনীয় ভাবে বলে, “রাস্তার ছেলেরা তো না খেয়ে ঘুরে বেড়ায়।”

“তা সে কাল থেকে বেড়িও। আজ আমার বাড়িতে তুমি অতিথি। জানো তো, অতিথি নারায়ণ?”

“নারায়ণ না হাতি! এসব বুড়োদের চালাকি। সব বুড়োদেরই দেখছি এক স্বভাব! সর্বদা ছোটদের ওপর সর্দারি ফলানো, আর জবরদস্তি করা। এর পর আবার নিশ্চয় একগাদা জিনিস দিয়ে কেবল ‘খাও খাও’ করতে বসবেন! ভাগ্যিস আপনার সেই নাতি…”

নাতি কী, সেটা আর শোনা হয় না মনোরমার। হঠাৎ নীচের তলায় দারুণ একটা শোরগোল ওঠে। …একসঙ্গে সকলের গলা কানে আসে। …গোবরা চেঁচাচ্ছে, গোবরার মাসি চেঁচাচ্ছে, বটুকহরি চেঁচাচ্ছে, বংশীলাল চেঁচাচ্ছে, এবং তার সঙ্গে চৌধুরীসাহেবের গম্ভীর ভারী-ভারী জোরালো স্বরটাও শোনা যাচ্ছে।

কর্তাবাবুর সামনে এরা সবাই এমন লাগামছাড়া ভাবে চেঁচাচ্ছে মানে? …বাড়িতে ডাকাত পড়ল? না কি হঠাৎ কোনওখানে আগুন লাগল? মনোরমা তাড়াতাড়ি নেমে এলেন। নির্ঘাত আগুন-টাগুনেরই ব্যাপার! কিন্তু হঠাৎ যেন কানে এসে গেল, ‘ভূত ভূত। ভুতুড়ে কাণ্ড!’

টম একটু চঞ্চল হল।

একবার নেমে আসতে গেল। আবার অগ্রাহ্যভরে ঠোঁট উলটে চেয়ারে বসে পড়ে বইখানা হাতে তুলে নিল। কাজের লোক-টোকরা অমন একটু কিছু ফ্যানতাফ্যাচাং হলেই চেঁচায়! টমের খুব জানা। রাস্তায় গাড়ি চাপা পড়ে খোঁড়া হয়ে যাওয়া একটা কুকুরছানাকে বাড়িতে নিয়ে এলেও এইভাবে সবাই মিলে চেঁচায়। যাকগে। বয়েই গেল। এখন এই 'গ্রহান্তর ফেরত মানুষ' বইটা শেষ না করে উঠে চলে যাওয়ার কোনও মানে হয় না।

ওই মহিলা আবার খেতে বলছেন। উঃ। যেখানে যাও সব জায়গায় জ্বালাতন।...অবশ্য খিদেটা পেয়ে গেছে বেশ। কিন্তু মনের আনন্দে খেতে বসে পড়াটা কী ঠিক হবে? যাকগে বইটা তো শেষ করে নিই! আর ক' পাতা আছে? তেরো পাতা। হয়ে যাবে। আবার তাড়া দিতে এলে তখন...।

ডুবে যায় গল্পের মধ্যে!

ওদিকে নীচের তলার আকস্মিক শোরগোল একটু থিতিয়েছে। তবে গোবরার মাসি সতেজে বলে চলেছে, "ভূত যদি না হয় তো ভগবান! কাজটা কী মনিষ্যির মতন দেখাচ্ছে? তোরাই বল? চোর-ডাকাতে না হয় হঠাৎ ফাঁক পেয়ে গাড়িখানা হুশ করে উড়িয়ে নিতে যেতে পারে। তো সে আবার ঘণ্টা দুই-তিন পরে ফের হুশ করে গেটের সামনে বোস করিয়ে রেখে যাবে? কেউ কখনও শুনেছে এমন কথা? ওই যে ওই সরকার-বাড়িতে...গিন্নির গয়নাগুলো চুরি গেল। আবার সেগুলো ফেরত দিয়ে গেল চোরব্যাটা? তবে? আর গাড়ি বলে জিনিস। এ কী ঘড়িটা-আংটিটা যে, টুক করে পকেটে ফেলে হাওয়া হয়ে গিয়ে আবার ভয়ে-ভয়ে ফেরত দিয়ে যাবে? এ কাজ ভূতের! নিয্যস ভূতের। আর নচেত ভগবানের।"

তা কাজটা ভূতেরই হোক আর ভগবানেরই হোক, চৌধুরীসাহেব ঘরে বসেই গাড়িখানা আবার পেয়ে গেলেন। ...পরীক্ষা করে দেখলেন তেলটা প্রায় তলায় ঠেকেছে। তা ঠেকুক। খানিকটা তেলের ওপর দিয়েই গেছে। গাড়িটা ঠিকঠাকই আছে।

যদিও বটুকহরি এখন রাগারাগি করছে, "এই ক' ঘণ্টা আগে সকালবেলা গাড়িখানারে অমন করে ধোওয়া-মোছা করলুম, আর এখন অবস্থা দ্যাখো! ধুলোয় ধুস। ভুতুড়ে কাণ্ড তো।"

কর্তা বললেন, "পাওয়া গেছে এই ঢের। আবার ধুলো বলে রাগারাগি। কাজটা যদি ভূতেরই হয়...তো বলতে হবে ভদ্র ভূত! দরকার মিটে যেতে ফেরত দিয়ে গেছে!"

'গ্রহান্তর ফেরত মানুষ'কে শেষ করে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেও টম কোলের ওপর গুছিয়ে রাখা বইগুলো আবার উলটে-পালটে দেখছিল। এই কটাই যা না-পড়া। আর সব বই-ই তো পড়া। তা ছাড়া ঘরের বাকি সবই তো বড়দের বই।

দরজার কাছে বংশীলাল এসে দাঁড়াল। বলে উঠল, "কই খোকাবাবু, আপনি খেতে নামছ না? গিন্নিমা তাড়া দিয়ে গেলেন। চলেন। চলেন।"

"যাচ্ছি। যাচ্ছি। তোমরা তখন শুধু-শুধু অত চেঁচামেচি করছিলে কেন?"

"আরেব্বাস! শুধু-শুধু? কর্তাবাবুর গাড়িটা যে ভূতটা উড়িয়ে হাপিস করে দিয়েছিল, সে আবার গাড়িটাকে ফিরত দিয়ে গেল। এটা কিছু না?"

টম চমকে উঠে বলে, "অ্যাঁ? ফেরত দিয়ে গেল? কখন?"

"ওই তো, তখন!"

"তোমরা তাকে ধরে ফেলে বেঁধে রেখেছ?"

বংশীলাল কপালে হাত ঠেকায়। "হায়! হায়! ভূতকে কে ধরতে যাবে? ও কী দেখা দিয়েছে? শুধু তো গাড়িটাকে কখন কোন সময় রেখে গেছে।"

"তাই? সত্যি?" টমের মুখে যেন আহ্লাদের আভা।

"ওই তো। গোবরা, বটুক আমি কত টাইম রাস্তায় ঘুরে-ঘুরে হাল্লাক হয়ে ফিরে এসে সবে বসেছি। আর মাসি এসে বলল, ওই তো গাড়ি! ...তো ভূতব্যাটা বেশ সেয়ানা আছে। গাড়িতে বসে-বসে মজাসে খাওয়া-দাওয়া করেছে।"

"ধ্যাত। কে বলল?"

"আরে বাবা! বলবে কে? গাড়ির গদিতে শিঙাড়া, কচুরি, জিলেবি, বোঁদের গুঁড়ো ছড়াছড়ি।"

টমের মুখে হাসির ঝিলিক। "গুড। তো চলো। আমায় কী খেতে দেবে দেখি।"

চক্রবর্তী এখন ডিউটিতে নেই।

অন্য একজন ফোন ধরল। "পেয়ে গেছেন? গুড নিউজ! তবে আমাদের লোকেরা কম হয়রান হয়ে খোঁজেনি সার। তাদের ব্যাড লাক। বামাল-সমেত চোরটাকে ধরতে পারলে মুখটা থাকত। ...যাকগে, পেয়েছেন এই ভাল। সাবধানে রাখবেন। ...ও না! লালবাজার থেকে কোনও খবর আসেনি। ছেলেটা বাইরের কোনও ভবঘুরের দলের হয়তো। ...আপনার তো মহা মুশকিল হল সার। তো আপনার দায়িত্বে রাখছেন কেন? থানায় জমা দিয়ে যান না? এখন নয়? ঠিক আছে। নমস্কার।"

ওদিকে বটুকহরি আর গোবরা আড়াল থেকে দাঁত কিড়মিড় করছে, "দেখছিস? দেখছিস ও ব্যাটা রাস্তার ভিখিরির ছানার আদর? সাবান মেখে চান করে নাতির ঝকমকে জামা-পেণ্টুল পরে নাতিমানিক টেবিলে বসে আরামসে খেয়ে চলেছে। উঃ? একবার হাতে পেতাম তো..."

আর কিছু বলার আগে গোবরার মাসি হঠাৎ বাইরে থেকে ছুটে এল হাঁপাতে-হাঁপাতে। এসেই বসে পড়ে বলে উঠল, "ভূ—ভূ—ভূত?"

"ভূত! আবার কোথায়? সেই গাড়ি-চোরটা?"

"তা জানি না..."

গোবরার মাসির গলা দিয়ে শব্দ বেরোচ্ছে না। তবু যা বলে তার অর্থ এই—সকালের সেই লক্ষ্মীছাড়া পাজিটাকে কর্তাবাবু-গিন্নিমা তো বাড়িতে রেখে পুষ্যিপুত্তুরের মতন আদর করছেন। ওই যে খাবার টেবিলে খেতে বসেছেন। অথচ সে নাকি পুরনো আস্তাবলের ঘরে একধারে বসে একখানা ছেঁড়াখোঁড়া খবরের কাগজ নিয়ে পড়ছে।

"সে মানে?"

"হ্যাঁ, নিয্যস সে রে বটুক। পষ্ট দিনের আলোয় দেখলুম না তখন? আর এখনও এই দিনদুপুরে..."

কিন্তু ওই কোনকাল থেকে পড়ে থাকা পুরনো আস্তাবলটার মধ্যে গোবরার মাসির যাবার কী দরকার ছিল?

কী দরকার আবার? সারা সকাল থেকে রাস্তায় কুড়িয়ে-কুড়িয়ে ভর্তি হয়ে যাওয়া গোবরের ঝুড়িটাকে রাখতে। এই তো কাজ গোবরার মাসির। বাবুদের বাড়ির চাকরি ছাড়াও ওর পার্টটাইমের ব্যবসা হচ্ছে গোবর কুড়িয়ে ঘুঁটে দেওয়া, আর সেই ঘুঁটে বিক্রি করে পয়সা জমানো! বরাবরই করে। ওই আস্তাবলটা গোবরার মা'র নিরালা ভাঁড়ার। ওই জায়গায় কিনা ভূতটা...

গোবরা বলল, "কাকে দেখতে কাকে দেখেছ ?"

"বললেই হল ? ঠিক সেই পাজিটা ।"

"এ তা হলে কে ? ওই যে দিব্যি তারিয়ে-তারিয়ে ডিমের ঝোল মেখে ভাত খাচ্ছে । সেই ছেলেটাকেই তো কর্তাবাবু বাড়িতে এনে..."

"তা হলে সেটাই ভূত । হয় সে ভূত, নয় এ ভূত ।"

গোবরার মাসি চাপা গলায় বলে, "নচেত একটাই ভূত । সেটাই গাড়ি নিয়ে ডাংগুলি খেলে এল । সেটাই কর্তা-গিন্নির নাতির মতন চেয়ারে বসে টেবিলে খানাপিনা করছে, আর সেটাই উই পচা গোবর-গন্ধওলা মশার কুঠি আস্তাবল ঘরে দিব্যি বসে খপরের কাগজ পড়চে । ভূত নয় ! ভূতের ছ্যানা । মনিষ্যির ছ্যানা হলে, ওই আস্তাবল ঘরে বসে থাকতে পারে ? এই গোবরার মা পর্যন্ত নাকে কাপড় দিয়ে ঘরে ঢোকে ?"

গোবরা বলল, "গিন্নিমাকে বলি ?"

বটুক বলল, "ওনারা এখন খেতে বসেছেন । ডিসটার্ব করার দরকার নাই । আগে নিজেরা দেখে আসি । সত্যি, না ছায়া-টায়া ?"

"মাসি তো দেখেছে ?"

"মাসির তো চোখে ছানি । তুই, আমি, বংশীদা তিনজনে গিয়ে তদন্ত করে আসি ।"

গেল তিনজনে চুপিচাপি । বাগানের পিছন দিয়ে । আর-একটা ভাঙা দেওয়ালের খাঁজে হুমড়ে পড়ে দেখতে গেল । গেল । আর দেখেই ওরে ব্বাবা ! দুড়দাড়িয়ে পালিয়ে এল তিন জোয়ান ।

ভেতর থেকে সাড়া উঠল, "কে ?"

সরে গেল মুখের সামনের কাগজের আড়াল ।

সেই ছোঁড়াটা ? যাকে বাবু বাড়ির মধ্যে নিয়ে গিয়ে ডিমের ঝোল মাখা ভাত খাওয়াচ্ছেন ।

মনোরমা হতভম্ব হয়ে বলেন, "তোমরা আর এখানে কাজ করবে না ? একসঙ্গে তিনজনে কাজ ছেড়ে চলে যেতে চাইছ ? এর মানে ?"

বটুকহরি গোঁজ হয়ে বলল, "ভূতের সঙ্গে একত্তর বসবাস করা যায় না ।"

"ভূত ? ভূত মানে ?"

"আজ্ঞে । মানে তো আপনাদের কাছে । হঠাৎ সক্কালবেলা মহাপ্রভু এসে হামলা করে বাড়ির মধ্যে ঢুকে চব্যচোষ্য খাচ্ছেন, আবার গাড়ি উড়িয়ে নিয়ে মজা দেখছেন, আবার আস্তাবলে বসে খপরকাগজ পড়ছেন ।"

"কী যা তা বলছিস ? আস্তাবলে আবার কে ?"

"ওই উনিই । না বাবা । এখানে আর না ।"

"বংশী ?"

"আজ্ঞে ।"

"তুমিও যাচ্ছ না কি ?"

"আজ্ঞে না । আমার পৈতে আছে । আমায় কিছু করতে পারবে না ।" বলে বংশী গলার পৈতেটাকে টেনে কপালে ছোঁওয়াল ।

"চল তো দেখে আসি ।"

"আপনি যাবেন যান । আমরা আর না ।"

গোবরার মা বলে, "গোবরা আমার বাবা তারকনাথের দোর-ধরা ছেলে । ভূত-পেরেতের সঙ্গে বসবাস করতে পারবে না ।"

চলে এলেন কর্তা-গিন্নি দু'জনাই ।

দেখি তো ব্যাপারটা ।

কিন্তু কোথায় কে ?

গোবর-পচা গন্ধে সামনে থেকেই ছিটকে আসতে হল । সব ওদের বুদ্ধুমি । ওই গাড়িখানা নিয়েই ওদের মাথার মধ্যে ভূত খেলছে ।

কিন্তু খবরের কাগজ একখানা পড়ে রয়েছে বটে। ছেঁড়াছেঁড়া মতো। এখানে কাগজ আসবে কোথা থেকে?

কোথা থেকে আর? হাওয়ায় উড়ে-টুড়ে?

চলে এলেন বাড়িতে।

আর এসেই মাথা চাপড়ানি। এইটুকুর মধ্যেই হাওয়া হয়ে গেছে। এতক্ষণ ধরে তোয়াজ করে-করে আটকে রাখা খাঁচার মধ্যেকার চিড়িয়াটি!

টম নো-পাত্তা!

চেয়ারের পিঠে ঝুলছে তাকে পরতে দেওয়া শার্ট-প্যান্ট। আর উঠোনের দড়িতে মেলে দেওয়া তার ছেঁড়া গেঞ্জি আর পায়া-ফাঁসা হাফপ্যান্ট অদৃশ্য। তার মানে, আধভিজে দুটোই গায়ে চাপিয়ে সটকেছে।

থানার দারোগা মাথা চুলকে বললেন, "আপনি সার এমন একজন পাকালোক হয়ে এমন একটা কাঁচা কাজ করে বসলেন? ওই একটা পুঁচকে ছেলেকে কোনওভাবে আটকে ফেলতে পারলেন না?"

চৌধুরীসাহেব মনঃক্ষুণ্ণভাবে বললেন, "বাড়ির কাজের লোকগুলোর বোকামিতেই··· 'ভূত-ভূত' করে একটা রব তুলে এমন করল···।"

চক্রবর্তী হেসে ফেলে বলেন, "তা, তাদেরও দোষ দেওয়া যায় না। আমাদের এই এরিয়ায় হঠাৎ বেশ ভৌতিক ব্যাপারই চলছে মনে হচ্ছে। এইমাত্র গণপতি সাহা নামের এক ভদ্রলোক ডায়েরি করে গেলেন, তাঁরও নাকি মাত্র এক মিনিটে গাড়ি বেপাত্তা।"

"অ্যাঁ?"

"আজ্ঞে তাই তো।"

"বিজনেসম্যান। শ্যামবাজারের মোড়ে না কোথায় কিসের যেন মস্ত দোকান আছে। হাতিবাগানেও। তো শহরের গোলমালে থাকতে চান না বলে ফ্যামিলি নিয়ে এই দেশের বাড়িতেই থাকেন। রোজ যাতায়াত করেন। পুরনো একখানা অ্যামবাসাডার ছিল। তো সম্প্রতি নতুন একখানা মারুতি কিনেছেন। ড্রাইভার গাড়িটাকে গ্যারাজ থেকে বার করে বাড়ির মধ্যে কী যেন বলতে গেছে, এসে হাঁ। গাড়ির চিহ্ন নেই।"

"বলেন কী? তাজ্জব।"

"সেই তো। কোথাকার কোন গ্যাং হঠাৎ এদিকে এসে পড়ে···। ড্রাইভারটাকে জেরা করতে বলল, ও যখন গ্যারাজের দরজা খুলে গাড়ি বার করছিল, রাস্তার ওপারে একটা গাছতলায় এক ধরনের বয়েসের ছেঁড়া গেঞ্জিপরা দুটো ছেলে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। এসে দ্যাখে তারা নেই।"

"অ্যাঁ, আবার ছেঁড়া গেঞ্জি!"

"সেই তো।"

"লোকটাকে ছুটিয়েছেন?"

"আমরা তো ছোটালাম। সেই সাহামশাইও নিজে ট্যাক্সি নিয়ে একদিকে বেরিয়েছেন। অন্যদিকে ড্রাইভার। কিছু ফল হবে কি না জানি না। তবে যদি আপনার কেসটার মতো হয়ে যায়···"

চৌধুরীসাহেব একটু চিন্তিতভাবে বলেন, "দুটো ছোট ছেলে।"

"তাই তো বলল।"

"কিন্তু অতটুকু ছেলেদের কতটা ক্যাপাসিটি? অ্যাঁ, কতটা স্পিডে গাড়ি ছোটাতে পারে?"

"সেই তো ভাবছি।"

চৌধুরী বললেন, "লালবাজার···নো খবর?"

"নো খবর।"

"গণপতি সাহার বাড়ি থেকেই বারেবারে ফোন আসছে। গাড়ি পাওয়া গেছে কি না। ···পুলিশ বলে তো আর ভগবান নই সার যে, যেখানে যা কিছু ঘটবে সব টের পেয়ে যেতে হবে।"

জিম বলল, "কী কী খেলি বুড়োর বাড়িতে?"

টম বলল, "সকালের কথা তো বললাম। দুপুরে গাদা-গাদা কী সব দিয়েছিল, কে অত খাবে! শুধু ডিমের ঝোল, চিংড়ির তরকারি, ডাল আর আলুভাজাটা খেয়েছি।"

"সবই তো বাজে। পচা! আমি অনেক ভাল খেয়েছি। গরম জিলিপি, বোঁদে, গরম-গরম হিঙের কচুরি, আলুর তরকারি, ঝাল-ঝাল শিঙাড়া—জগতে এত যে ভাল-ভাল খাবার আছে।"

টম নিশ্বাস ফেলে বলে, "ঠিক বলেছিস। রাতদিন কেবল ফল খা, দুধ খা, মাছ খা, মাখন খা—হ্যানো খা, ত্যানো খা! একটু ফুচকা আলুকাবলি ঝালমটর খেতে দেখলেও বকাবকির ধুম। যতসব পচা বুদ্ধি? তো ভাগ্যিস তুই বুদ্ধি করে টাকা-পয়সা কিছু এনেছিলি।"

"হুঁ, বাবা। আমি তোর মতন বোকা নই। টাকা-পয়সা না নিয়ে নিরুদ্দেশ হলে কম অসুবিধে? আরও বেশি করে আনলে আরও ভাল হত। তোর জন্যই···"

টম বলল, "আমি ভাবলুম চুরি করা হচ্ছে····।"

"ধ্যাত। চুরি আবার কী? নিজেদের বাড়ির জিনিস নিলে চুরি করা হয়? বাড়িতে যদি ফ্রিজ খুলে কিছু খাই? সেটা চুরি?"

"তা নয় অবশ্য।"

"তবে?"

"তা ছাড়া, এই যে আমরা চলে এসেছি। আমাদের জন্য এখন কিছু খরচ হচ্ছে ওদের?"

"ঠিক? কিন্তু গাড়িটাকে এলোপাথাড়ি চালিয়ে এই ঝোপজঙ্গলের মধ্যে এনে ফেললি, এখন কী হবে?"

জিম সতেজে বলল, "কী আবার হবে? ভালই তো, এখানে কেউ ডিসটার্ব করতে আসবে না মনে হয়। গাড়ির মধ্যে শুয়েই রাতটা কাটিয়ে দেওয়া যাবে। উঃ। কাল যা হয়েছিল!"

টম বলল, "ওঃ বাবা! মশারা তো গা একদম ফুলিয়ে দিয়েছিল। তোরও তো মুখটা একদম···আর কী বিচ্ছিরি গন্ধ!"

জিম গম্ভীরভাবে বলল, "অ্যাডভেঞ্চার করতে বেরিয়ে তুই বুঝি আরামদায়ক সিল্কের বিছানার মশারির মধ্যে শুতে চাস?"

"আহা। তাই বলছি নাকি? আমিই তো বলেছিলাম টাকা-পয়সা জামা-টামা কিছু না নিতে। তুই-ই তো বরং এই-সেই সঙ্গে নিলি।"

জিম জোর দিয়ে বলল, "রাস্তার ছেলে হয়ে বেড়ালেও দু' সেট জামার দরকার, বুঝলি? আর টুথব্রাশ-টুথপেস্টটা।"

"কোথায় সেগুলো?"

"এই তো, আমার ঝোলাটার মধ্যে!"

"এ মা। এই ঝোলাটাকেও এইরকম কাদা মাখিয়েছিস?"

"তা মাখাতে হবে না? ধুলোমাখা রাস্তার ছেলেদের কাঁধে একটা সুন্দর ফুল-কাটা ঝোলা। বোকার মতন লাগবে না?"

"জিম। তুই তো আমার থেকে ছোট। তবু তোর বুদ্ধি ঢের বেশি। আর গাড়িও চালাস অনেক ভাল।"

"ছোট? আহা রে। কতই ছোট!"

জিমেরও টমের মতোই মুক্তোপাটি দাঁতের সারির মধ্যে একটা দাঁতের জায়গা শূন্য। সেই দাঁতেই ঝিলিক দিয়ে হেসে ওঠে জিম।

"তা যতই যা হোক। ছোট তো? আমি বড়।"

"ছাড়! কী আমার বড় রে? হি-হি। দাদা। গুরুজন। প্রণাম করি তা হলে? তা একটু বোকা আছিস বটে! দু-চারটে বই নিয়ে

আসতে পারতিস!"

"এ মা। চুরি করে?"

"ভাগ্। চুরি আবার কী? এই যে গাড়ি! চুরি করেছি? সেটার মতন এটাও ফিরিয়ে দেব। বইগুলোও পড়ে আবার..."

"আহা! গাড়ি তো রাস্তা থেকে নেওয়া। বই নিতে হলে বাড়ির মধ্যে থেকে সকলের সামনে দিয়ে সিঁড়িতে উঠে..."

"নাঃ। সত্যিই তোর বুদ্ধি নেই টম! সিঁড়ি দিয়ে ছাড়া দোতলায় ওঠা যায় না?" তারপরই বলে, "কাগজে বিজ্ঞাপন-টিজ্ঞাপন কিছু দেয়নি কেউ! আমাদের ছবি-টবি ছাপায়ওনি?"

"কোথায় কাগজ?"

"সে তো সেইখানে পড়ে আছে।"

"পেয়েছিলি কোথায়?"

"কোথায়?" জিম হি-হি করে হেসে ওঠে। "একটা না বুড়ো মতন লোক রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে রোদের দিকে কাগজখানা ছড়িয়ে...হি-হি...এমন মন দিয়ে পড়ছিল, গায়ের কাছ দিয়ে গাড়ি আসছে দেখতেই পাচ্ছে না। দেখেই না...হি-হি-হি-হি-হি...ফট করে ব্রেক মেরে জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে একটানে...হি-হি। তো খানিকটা বুড়োর হাতেই থাকল, আর খানিকটা না আমার হাতে। তো দেখি যে ওই যেখানে নিরুদ্দেশটেসের খবর ছাপে, সেটা আমার কাছে চলে এসেছে। কিন্তু..."

টম বলল, "আমরা তো মাত্তর পরশু স্টার্ট করেছি রে জিম! এক্ষুনি কী করে? তো আমরা তো আর টিভি দেখতে পাচ্ছি না! ওতে ছবি দিয়ে-দিয়ে খবর বলে।"

জিম আবার হি-হি করে হেসে ওঠে, "হ্যাঁ। এই ছেলেটির বয়েস এই...নাম এই..."

টম বলে, "ওই বাড়িটায় টিভি আছে।"

"থাকগে। আমাদের কী? আমাদের তো এখন শুধু চেষ্টা করতে হবে যাতে না ধরে ফেলতে পারে।"

জিম তার হাফ-প্যান্টের পকেট থেকে একমুঠো 'ঝালচানা' বার করে বলে, "নে, তোর জন্য রেখেছিলুম!"

"এ মা, সবটা দিচ্ছিস? তুই নে।"

"আমি অনেক খেয়েছি।"

"খেয়েছিস তো খেয়েছিস। একসঙ্গে তো খাসনি।"

দু'জনে নিবিষ্ট মনে নুন চেটে-চেটে তারিয়ে-তারিয়ে সেই পোকাধরা ঘোড়ার ছোলার ঝালচানা খেতে থাকে।

"কী ফার্স্টক্লাশ রে জিম। অনেক বেশি করে কিনলি না কেন?"

জিম হি-হি করে, "আহা। আর 'পেট ছেড়ে' দিলে?"

"এই বাবা! সেই একটা ভাবনা।"

একটু পরেই আবার বলে ওঠে, "আচ্ছা টম! আমরা তো বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে রাস্তার ছেলে হয়ে গিয়ে ঘুরছি। লোকের গাড়িও নিয়ে চলে আসছি, তো তেমন অ্যাডভেঞ্চার-অ্যাডভেঞ্চার লাগছে কই রে?"

টম জোরে বলে ওঠে, "আহা! আহ্লাদ। কলকাতার এত কাছে-কাছে ঘুরে অ্যাডভেঞ্চার হবে? চল না, কাঠমাণ্ডু কি লাদাক কি অসমের জঙ্গলে। ভীষণ-ভীষণ বিপদ-টিপদ আসুক। বুনো হাতি তাড়া করুক, ইয়েতির পায়ের ছাপ দেখি, কিংবা হঠাৎ অন্য গ্রহের প্রাণীর সঙ্গে দেখা হয়ে যাক, তবে তো?"

জিম নিশ্বাস ফেলে বলে, "আমাদের ভাগ্যে আর হয়েছে! ছোট হওয়া যে কী যন্ত্রণা! পৃথিবীর যতসব বড়রা আর বুড়োরা যেন ছোটদের জ্বালাতন করতেই জন্মায়। ...এই তো এই গাড়িটা চালিয়েই তো কত দূর চলে যাওয়া যেতে পারে। তো শান্তিতে যেতে দেবে? রাস্তায় দেখতে পেলেই বলে উঠবে আরেব্বাস! এইটুকু ছেলে গাড়ি চালাচ্ছে। ও খোকা! তোমার লাইসেন্স আছে? ...পুলিশ নয়, এমনি লোক। তবুও। আর পুলিশ হলে তো হয়েই গেল। দেখলি তো কী ছুট মেরে চলে আসতে হল। তো টম! সেই গ্রহান্তর-ফেরত মানুষটা কী করে অন্য গ্রহে গিয়েছিল রে?"

টম ছোলার নুনটা চাটতে-চাটতে বলে, "সে তো গাদাগাদা কাণ্ড। না পড়লে বুঝতেই পারবি না। এই, এই জিম! দ্যাখ, দ্যাখ। ওইখানে একটা পেয়ারাগাছে কত পেয়ারা!"

ব্যস! দেখতে যা দেরি। দু'জনে গাছে উঠে পড়ে।

ডাঁশাও নয়, নেহাত কষা পেয়ারা। তাতে কী? গাছে চড়ে বসে পেড়ে-পেড়ে চিবিয়ে ছিবড়ে ফেলতেই কী কম মজা? তবু একটু যেন অ্যাডভেঞ্চার-অ্যাডভেঞ্চার!

গাছের ওপর থেকেই হঠাৎ এক দৃশ্য চোখে পড়ল।

"টম! ওদিকে রাস্তার ধারে সেই ভুঁদো বুড়ো দুটো পুলিশ নিয়ে একটা ট্যাক্সি থেকে নামল!"

"সেরেছে। তার মানে গাড়ি খুঁজতে বেরিয়েছে।"

"এই, একদম নড়িসনি! দ্যাখ, কী করে! এই, এই, এদিক-ওদিক ঘুরেফিরে চলে গেল। হি-হি। গাড়িটাকে দেখতে পেল না।"

"দেখবে কী? তুই ওটাকে যা বিচ্ছিরি ঝোপজঙ্গলের মধ্যে ঢুকিয়ে এনেছিস।"

ভাগ্যিস এনেছি। না হলে তো ঠিক দেখতে পেত। আর-একটু থাক চুপচাপ! পরে আরও ঘুরে নিয়ে ফেরত দিয়ে এলেই হবে।"

"আহা এটা চেপেই যদি কাঁহা-কাঁহা জায়গায় যাওয়া যেত রে। তো হিংসুটে লোকেরা তো দেবে না! লাইসেন্স! লাইসেন্স থাকলে যেন তারা অ্যাকসিডেন্ট করে না। যতসব। অন্য গ্রহেই চলে যেতে ইচ্ছে হয়।"

এক সুটেড-বুটেড সুদর্শন ভদ্রলোক দমদম এয়ারপোর্টে নেমেই দ্রুত বেরিয়ে আসতে-আসতে বলে উঠলেন, "এই যে দরবারিলাল এসে গেছ। কী খবর বলো তো? তোমাদের ছোটসাহেব হঠাৎ আমায় ট্রাঙ্ককল করে জরুরি তলব করল কেন বলো তো?"

দরবারিলাল সংক্ষেপে বলল, "কোঠিতে চলেন।"

"কী বাবা। ভয় ধরিয়ে দিচ্ছ যে? কেউ মারাটারা যায়নি তো?"

"আরে রাম! রাম!"

"তবে? কারও বেশি বেমার-টেমার?"

"না সাহেব। ওসব কুছ না!"

"তবে? হঠাৎ এভাবে...তুমি কিছু চেপে যাচ্ছ মনে হচ্ছে!"

দরবারিলালের এখন স্টিয়ারিং-এ হাত। ঘাড় না ফিরিয়ে বিজবিজ করে যা বলে তার অর্থ, হয় বাড়ি থেকে খুব দামি কিছু জিনিস হারিয়ে যাওয়ায় ছোটসাহেব বড়সাহেবকে খবর দিয়েছেন।

"আরে ধুস! এইজন্য আমায় সব কাজ ফেলে আসতে হল?" বড়সাহেব রেগে-রেগে বলে ওঠেন, "আমাদের বাড়িতে কী এমন দামি জিনিস ছিল হে দরবারিলাল? কোহিনুর হিরের মুকুট? আসলি মোতির মালা?"

দরবারিলাল খুব গম্ভীর গলায় বলে, "উসবসে বহোৎ জ্যায়দা দামি ভি হোতে পারে।"

"যাব্বাবা! এ আবার কী রহস্য-রোমাঞ্চ সিরিজের মতো কথা তোমার দরবারিলাল! দেখি বাড়ি গিয়ে। তোমাদের ছোটসাহেব আবার কী বলেন!"

গাড়ি এসে বাড়ি পৌঁছল।

বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের ওপর মস্ত বাড়ি। সামনে উঁচু লোহার

গেট। খোলাই রয়েছে। বাড়ি ঢুকে এসে ভদ্রলোক হাঁক পাড়লেন, "পল্টু! পল্টু! এই যে, এসব কী ব্যাপার তোদের? বাড়ির একটা জিনিস হারিয়েছে বলে আমার এই কাজকর্মের সময় জরুরি তলব? কী এমন দামি জিনিস?"

পল্টু অগ্রাহ্যের গলায় বলে, "আমি অবশ্য দামি ভাবি না। কানাকড়িও না। তবে আর সব্বাই ভীষণ দামি ভেবে চিন্তায় মরছে।"

"কী মুশকিল। তো জিনিসটা কী? থানায় ডায়েরি করিয়েছিস?"

পল্টু দু' হাত উলটে আরও তাচ্ছিল্যের গলায় বলে, "ওসব থানা-পুলিশের মধ্যে আমি নেই দাদা! তোমার বাসনা হয় থানা-পুলিশ, গোয়েন্দা-গণৎকার, রেডিও-টিভি সব করো। আমায় ছুটি দাও। আমি আমার সব জামাকাপড় গেরুয়ায় ছুপিয়ে রেডি রেখেছি, হরিদ্বারের টিকিট কাটা, তুমি এলেই কাট মারব ঠিক করা আছে। এখন তুমি ঠ্যালাটি বোঝো।"

বেলা পড়ে এসেছে।

বটুকহরি চা দিতে এসে বলল, "কর্তামশাই শুনেছেন খবর?"

"কোন খবর? কিসের খবর?"

"আজ্ঞে, আজকে এই বারাসতে আর কিসের খবর? সেই ভূতের ছানাটার কীর্তিকাণ্ডর খবর। বাজারধারের সাহামশাইয়ের নতুন মালুতি গাড়িখানা ভূতে উড়িয়ে নিয়ে গেছে।"

"ভূত-ভূত করিস না বটুক! বেশ বোঝা যাচ্ছে, হঠাৎ কোনও গাড়ি-চোরের আবির্ভাব হয়েছে এখানে।"

"আজ্ঞে, চোরই বা বলেন কী করে? আবার তো ফেরতও দে গেছে।"

"আমারটা পুরনো। বোধ হয় পছন্দ হয়নি। ওই নতুন 'মালুতি' গাড়ির সন্ধানে ছিল। এটা আর ফেরত দেবে না দেখিস!"

"কিন্তুক ওইটুকুন ছেলে..., বলে কিনা তীরবেগে..."

"আরে দূর। ওটা ওই পুলিশসাহেবদের চোখের ভুল। কত বেঁটেখাটো রোগা ক্ষয়া লোক থাকে, সেইরকমই হবে। এই ছেলেটা যে কীভাবে উপে গেল। তোরা তখন মিছিমিছি ভূত-ভূত করে ধুয়ো তুললি, আমরাও দু'জনেই ছুটে চলে গেলাম, সেই তক্কে..."

কথার মাঝখানে হঠাৎ টেলিফোনের ঝনঝনানি।

"চৌধুরীসাহেব আছেন?"

"কথা বলছি।"

"সার। আমি চক্রবর্তী বলছি, আবার একই ব্যাপার সার। গতকাল গণপতি সাহার বাড়ির সামনে থেকে..."

"হ্যাঁ শুনলাম! নতুন মারুতি গাড়ি! হুশ করে হাওয়া হয়ে গেছে।"

"গেছল সার। গতকাল সারারাত গণপতিবাবু গাড়ির শোকে কেঁদেছেন। এখন আবার ফিরে এল।"

"অ্যাঁ বলেন কী? চোরকে ধরতে পেরেছেন?"

"আমাদের লাকের দোষ সার। ধরে ফেলেছে একটা রিকশওলা। গাড়ি ফেরত দিয়ে ছেলেটা নাকি দেখেছে রিকশওলা রাস্তায় রিকশ রেখে চায়ের দোকানে চা খাচ্ছে। ব্যস। ফট করে রিকশয় উঠে পড়ে প্যাডেল করতে শুরু করেছে। কিন্তু চোর ব্যাটার ব্যাড্‌লাক। হঠাৎ চাকার চেনটায় গড়বড় করায় রিকশওলা তাকে চেপে ধরে। আরও পাঁচজনে জোটে। তো এইমাত্র থানায় জমা দিয়ে গেল। তবু প্রাণে ভয় নেই। ওইটুকু বাচ্চা, কী তেজ। বলে কিনা, খবরদার মারবে না বলছি। মারাটারার আইন নেই এখন।"

এই কথার তোড় থেকে একটু ফাঁকা পেয়ে চৌধুরী বলেন, "আচ্ছা, বলছেন বটে কাল থেকে, ছোট ছেলে। কিন্তু সত্যিই কী তাই? মাপে ছোট চেহারার লোকও হয়।"

"কী যে বলেন সার। এত লোক দেখছি। ব্যাটার এখন সবে একটা দুধে দাঁত পড়েছে।"

চৌধুরীর চোখের সামনে টমের চেহারাটিও ভেসে ওঠে। তারও যেন একটা দাঁত! কিন্তু তা কী করে হবে? ও যখন আমাদের সঙ্গে খায়, তখন আস্তাবলেও না কি ওইরকম একটা ছেলে। আবার ওইরকম সময়ই না কি গণপতি সাহার বাড়ির সামনে থেকে... না। সময়টাকে নিয়ে অঙ্ক কষতে হবে। মুখে বলে উঠলেন, "তা মারধোর করেননি তো?"

"না, সার। ছেলেটা যা রাগি, যদি বদমাইশি করে আমাদের ফাঁসাবার জন্য একটা থাপ্পড় খেয়েই চোখ উলটে মরে বসে। তবে খুব একখানা রামধোলাই দেবার দারুণ ইচ্ছে হচ্ছিল।"

"না না। ইচ্ছেটা সামলান। যতই দুঁদে হোক, সত্যিই যখন বাচ্চা।...খুব সাবধানে আটকে রাখবেন। আমি তো কাল আর-একটা বাচ্চা ছেলের কাছে বুদ্ধু বনে গেলাম। আচ্ছা, ওই সাহামশাইয়ের গাড়িটা গিয়েছিল কখন?"

"এই বেলা দুটো-সওয়া দুটো নাগাদ। উনি থাকেন এখানে, দোকান রেখেছেন শ্যামবাজারে। সকালের দিকে দোকানে ভাইপো বসে, উনি দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে ধীরেসুস্থে গাড়িটিতে চেপে রওনা দেন। সেইসময়ই..."

"বুঝলাম! তো গাড়ি নিয়ে কোথায় গিয়েছিল বলেছে?"

"বলবে? সেই ছেলে? বলে কিনা যেখানে ইচ্ছে সেখানে গিয়েছি। পুলিশকে বলতে আমার দায় পড়েছে।"

"অ্যাঁ!"

"তবে আর বলছি কী। শয়তানের বরপ্রাপ্ত ছেলে। আচ্ছা। ছাড়ছি। ভাবলুম খবরটা আপনাকে দিয়ে দিই। কী বলছেন? ও, না। লালবাজার থেকে নো নিউজ। তবে এই ছেলেটাকে..."

হঠাৎ ফট করে লোডশেডিং হয়ে গেল।

দু'জনেই 'ওই যা' বলে থেমে গেলেন।

মনোরমা দেবীর গলা শোনা গেল, "অ বটুক, অ গোবরা। এইবেলা দ্যাখ হ্যারিকেনে তেলভরা আছে কি না। মোমবাতিগুলো কোথায়। এখনও 'ভগবানের আলো' রয়েছে একটু।"

হ্যারিকেনগুলো থাকে দোতলায় ওঠবার সিঁড়ির চাতালে। গোবরা সেই ভগবানের আলোটুকুর ভরসায় সিঁড়িতে উঠে গেল।

আর তারপর?

পরক্ষণেই 'আঁ আঁ' করতে-করতে দুদ্দাড়িয়ে নেমে এসে "ভূ-ভূ—" করে মাটিতে বসে পড়ল কেন?

কেন আর? ভগবানের সেই আবছা আলোটুকুতেই গোবরার ভূত-দর্শন ঘটে গেছে!

"ভূত কত্তাবাবুর লাইবেরিলি ঘরের মধ্যে বই নাড়াচাড়া করছিল!"

সেই মূর্তি। পিঠ ছেঁড়া গেঞ্জি, পায়া-ফাঁসা প্যান্টুল। সেই ফাঁক থেকে চাঁদের টুকরোর মতো রং উঁকি দিচ্ছে।

"কোথা দিয়ে উঠেছে? সিঁড়ির সামনে তো সব সময় লোক!"

গোবরা কত্তাবাবুকে ধিক্কার দিয়ে বলে, "ওনারা কী সিঁড়ির ধার ধারে বাবু?"

হ্যারিকেন লণ্ঠন নামানো হয়নি। বংশীলাল দুটো বাখারিতে ন্যাকড়া জড়িয়ে কেরোসিনে ভিজিয়ে মশাল বানিয়ে 'রাম রাম! সীতারাম' করতে-করতে সিঁড়িতে উঠল। পিছনে চৌধুরীসাহেব। তার পিছনে বটুক। তার পিছনে গোবরা। তার পিছনে গোবরার মাসি।

চৌধুরীসাহেব বাদে সকলের মুখেই 'রাম রাম' ধ্বনি !

কিন্তু কোথায় কে ?

বটুক আর গোবরা সতেজে বলে, "আমরা দল বেঁধে মশাল জ্বালিয়ে দেখতে যাব বলে, উনি খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন ? সরে পড়বেন না ?"

না হলে গোবরার চোখের ভ্রম।

তাইবা বলা যায় কী করে ? টেবিলের বই তো বেশ হণ্ডুল-বাণ্ডুল। বারান্দার দিকের দরজাটা খোলা। আর সেই দরজার কাছে কী একখানা চটি বই পড়ে রয়েছে উপুড় হয়ে।

কী বই ?

এমন কিছু না। 'হিমালয়ের ভয়ঙ্কর'।

চৌধুরীসাহেবের এই মস্ত পুরনো বাড়িখানা হঠাৎ যেন রামধুন-এর আখড়া হয়ে উঠল। কাজের লোকেরা তারস্বরে 'রাম রাম' করছে আর বাড়ির গিন্নি মনে-মনে।

কালকের সেই ছেলেটাকে কী করে ভূত বলে ভাবা যায় ?…কিন্তু তার কার্যকলাপ যে তার মানবত্বের বিরুদ্ধে দারুণ সাক্ষ্য দিচ্ছে। কেউ যদি একই সময় খাবার টেবিলে এবং পোড়ো ঘোড়ার আস্তাবলে অবস্থান করতে পারে, এবং মারুতি গাড়ি নিয়ে হাওয়া হয়ে গিয়ে পুলিশকে কলা দেখাতে-দেখাতে নিখোঁজ হয়ে যায়, কী বলা যায় তাকে ? আর এখন ? থানার লকআপে থাকতে-থাকতে চৌধুরীসাহেবের দোতলার লাইব্রেরি ঘরে !…আর কাল এসেই নিজেই বলেছিল না, 'এইরকম পুরনো বাড়িতে ভূত থাকে।'

না বাবা ! মনোরমাও মনে-মনে রামনাম জপবেন না কী করবেন ?

একা চৌধুরীসাহেবই রামনামের বদলে মিনিট গুনছেন কারেন্ট আসার অপেক্ষায়। এলেই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে থানায় পৌঁছে যাবেন। নিজের চক্ষে না দেখে স্বস্তি হচ্ছে না।

তা কারেন্ট এল একটু পরেই। বেরোলেন। থানাটা নেহাত কাছে নয়। কিন্তু খানিকটা যেতেই হঠাৎ রাস্তার পাশের দিকে তাকিয়ে চৌধুরীসাহেবের টাকের চুল খাড়া হয়ে গেল।…এই এবড়ো-খেবড়ো রাস্তার ধারে একটা মোটকা গাছের গুঁড়ির ওপর বসে রাস্তার আলোয় নিমগ্ন হয়ে একখানা বই পড়ছে কে ও ?…চৌধুরী স্রেফ গোবরার মতো দেখে নেবেন ওর পায়ের গোড়ালি কোন দিকে ? চৌধুরীসাহেবও কি 'রামনাম' করবেন ?

তা অবশ্য করলেন না। ঘ্যাঁচ করে গাড়িখানাকে থামিয়ে নেমে পড়ে ওর কাছে গিয়ে বলে উঠলেন, "টম ! তুমি এখানে ?"

ছেলেটা খুব বিরক্ত হয়ে বইটা মুড়ে তাকিয়ে বলল, "আমি টম নই।"

চৌধুরী বইটার মলাট দেখতে পেলেন।

একটু আলগা হাসি হেসে বললেন, "বাঃ। কাল তো বললে তোমার নাম টম। আমায় চিনতে পারছ না ?"

"জীবনেও আমি আপনাকে দেখিনি। আমার নাম টম নয়। ব্যস।"

"জীবনেও আমায় দ্যাখোনি ? ভারী মজার কথা বলছ ? আমি সেই চৌধুরীমশাই, যে-বাড়িতে তুমি কাল চানটান করলে …"

"আমি মোটেই আপনার বাড়ি চান করিনি।"

চৌধুরী ফট করে বলে ফেলেন, "এই বইখানা কিন্তু আমার বাড়ির !"

ব্যস। দপ করে আগুন জ্বলে ওঠে নীল-নীল দুটো চোখে, "ও। তাই বুঝি বই-চোরকে ধরতে গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছেন ? নিয়ে যান আপনার বই। ভাবছিলাম কলকাতা থেকে গাড়ি এসে পড়ার মধ্যে পড়া শেষ হয়ে যাবে। দরকার নেই।"

১৯০৫ : রাইট ফ্লায়ার-৩

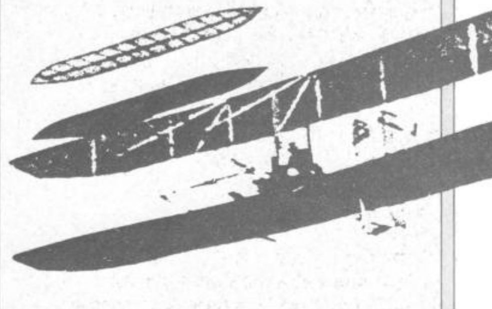

রাইট ফ্লায়ার — ৩ বিমান

খুব আশ্চর্য ব্যাপার হল, বিশ্বে এই প্রথম বাতাসের চেয়ে ভারী বিমানের আকাশে ওড়া বিশেষ প্রচার পায়নি। ইউরোপের অনেকে একে দুই পাগলের কাণ্ডকারখানা বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। রাইট ভাইয়েরা ১৯০৪ ও ১৯০৫ সালে অনেকবার বিমানে আকাশে উড়েছেন, কোনওরকম প্রচার ছাড়াই। প্রথম-প্রথম এঁরা নিজেদের তোলা ছবি ছাড়া বিমানের ছবি আর কাউকে তুলতে দিতেন না। নতুন বিমান তৈরি হল ফ্লায়ার — ২। ডেটনের কাছে ৯০ একর জমি নিয়ে তৈরি হল বিশ্বের প্রথম বিমানবন্দর। ফ্লায়ার — ২ বিমানে কিছু নতুন সংযোজন হল, যাতে এটি নিরাপদে উড়তে পারে। রাইট ভাইয়েরা আমেরিকান সরকারের কাছে পেটেন্টের জন্য আবেদন করলেন। আর দু-দু'বার সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফারদের আমন্ত্রণ জানালেন বিমান ওড়া দেখতে। কিন্তু দু'বারই যান্ত্রিক গোলযোগে বিমান উড়ল না। অনেকেই বলতে লাগলেন, বাতাসের চেয়ে ভারী বিমান আকাশে ওড়ানো বোধ হয় সফল হবে না।

অবশেষে ১৯০৫-এর জুন মাসে রাইট ভাইয়েরা তাঁদের নতুন বিমান তৈরি করলেন, নাম দিলেন ফ্লায়ার — ৩। এটি বিশ্বের প্রথম প্র্যাকটিক্যাল নকশার বিমান। ২৩ জুন পরীক্ষামূলক ওড়ানো হল, তারপর অক্টোবর অবধি চলল আরও উন্নতিসাধন। এইবার রাইট ভাইদের নাম ছড়িয়ে পড়ল দেশে-বিদেশে।

ফ্লায়ার — ৩ বিমানের বিশদ পরিচয় :

নির্মাতা : অরভিল ও উইলবার রাইট।

লম্বায় : ২৮ ফুট বা ৮·৫ মিটার।

ডানা : ৪০ ফুট বা ১২ মিটার।

খালি অবস্থায় ওজন : ৭১০ পাউন্ড বা ৩২২ কেজি।

যাত্রীসংখ্যা : একজন বৈজ্ঞানিক ও একজন যাত্রী।

গতিবেগ : ঘণ্টায় ৩৫ মাইল বা ৫৬ কিমি।

রেঞ্জ : ২৪ মাইল বা ৩৮ কিমি।

এঞ্জিন : একটি ২০ অশ্বশক্তির রাইট এঞ্জিন।

ধ্রুবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

হাত-বাড়িয়ে বইটা দিতে আসে।

চৌধুরী ব্যস্তভাবে বলেন, "রাগ করছ কেন ভাই ?··· আমি তো তোমার দাদুর মতো।"

"আমার কোনও দাদুটাদু নেই।"

"আরে বাবা, আমার তো তোমার বয়েসী একটি নাতি আছে। সে যাক, কলকাতা থেকে গাড়ি আসার কথা কী বললে বলো তো ?"

"কী আবার ! ওই ওষুধের দোকানের টেলিফোন থেকে দু' টাকা দিয়ে কলকাতার চেনা বাড়িতে ফোন করে দিলাম ডিরেকশান দিয়ে, এক্ষুনি গাড়ি নিয়ে এখানে চলে আসতে। মজা পেয়েছে ! একটা ছোট ছেলেকে থানায় আটকে রেখে দেওয়া হয়েছে···মজা বার করে দিচ্ছি !"

চৌধুরী অকূল পাথারে। "তোমায় থানায় আটকে রেখেছিল ?"

"আমায় ? হি-হি-হি। কী বুদ্ধি ! তা হলে এখানে কে ? আমার ভূত ? আটকে রেখেছে অন্য ছেলেকে ! তো পুলিশ যা পাজি ! এইবেলা গাড়ি না এলে পিটিয়ে মেরে ফেলতেও পারে।"

চৌধুরী দিশেহারা ! তবু বললেন, "না না, মেরে ফেলবে কেন ? তবে সে তো শুনলাম একটা গাড়ি-চোর !"

"চোর ? বললেই হল ? একবার চড়লেই চোর হয়ে যায় ? গাড়িটা সে নিয়ে নিয়েছে ?"

"তা হলেও··· শুনলাম কাল সারারাত না কি গাড়ির মালিক গাড়ির শোকে কেঁদেছে !"

"কেঁদেছে ? হি-হি। সেই বুড়ো ভুঁদো ? তো রাত্তিরে কোথাও শুতে হবে তো তাকে ! আস্তাবলে শুয়ে মশার কামড় খাবে ?"

"কিন্তু পুলিশ তো তাকে বলবেই 'গাড়ি-চোর'। ভোঁ করে গাড়ি নিয়ে····"

"লোকে বিশ্বাসই করবে না। ও তো জোরে গাড়ি চালাতেই জানে না। আস্তে-আস্তে চালায়। শুধু ফেরত দিতে এসেছিল। তাই তো ধরা পড়ে গেল। ইস, কখন যে আসবে গাড়িটা !"

"কলকাতার কোথা থেকে আসবে ?"

"বালিগঞ্জ থেকে।"

"ও তা হলে তো দেরি হবেই।"

"স্পিডে এলে কিছু দেরি হয় না। তো দরবারিলাল কি স্পিডে চালাবে ? যা ভিতু ! ওঃ। পুলিশ যে কী করছে এতক্ষণে !"

তা সত্যিই খানিক পরেই একখানা গাড়ি এসে গেল ঝড়ের বেগে।

"জিম ! জিম !"

"এই যা ! বাপি আবার কবে এলে ? ঠিক আছে। কাকু এখন শিগগির থানায় চলো।···এই যে আপনিও চলে আসতে পারেন। ও, আপনার তো সঙ্গে গাড়ি রয়েছে। ইচ্ছে হলে আসবেন।"

"ইচ্ছে তো হবেই।"

থানায় চলে এলেন সকলে। আর মোটরগাড়ি-চোরকে লকআপ থেকে বার করে আনা মাত্র চৌধুরীসাহেবের টাকের চুল আবার খাড়া হয়ে উঠল। তারপর বলে উঠলেন, "ও বুঝেছি ! জোড়া মানিক। লব-কুশ।"

পল্টুর দাদা বলে উঠলেন, "হ্যাঁ মশাই ! তবে ওই মানিকজোড়টিকে পৃথিবীর মাটিতে নামিয়ে রেখে ওদের মা জননীটি স্বর্গে উড়ে গেলেন। আর আমরা···"

পল্টু বলে উঠল, "তোমার কথা বোলো না দাদা, বরং আমার কথা বলো ! আমিই হাড়ে-হাড়ে জানি, এঁরা কী চিজ। ঠিক করেছি এদের নিয়ে গিয়ে বাড়ি পৌঁছেই আমি····"

"থাক থাক, সেকথা পরে হবে।" চৌধুরী বলেন, "চক্রবর্তী, মারধোর করা হয়নি তো ?"

চক্রবর্তী জিভ কাটলেন। "আপনি নিষেধ করেছেন। বরং দুটো রসগোল্লা খেতে দেওয়া হয়েছিল। ছোঁয়নি। বলেছে, 'থানার খাবার আবার মানুষে খায় ?' তো এই এনারাই গার্জেন ? বাবা-কাকা ?"

কাকা গম্ভীরভাবে বলেন, "গার্জেন বলবেন না মশাই। বলুন প্রজা ! তো একজোড়া কোহিনুর হিরে ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে কত কী লাগবে বলুন ! প্রস্তুত হয়েই এসেছি।"

চক্রবর্তী চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে আবার জিভ কাটেন। "ছি ছি। ওসব কী ? কিন্তু ব্যাপারটা কী ?"

"ব্যাপার ? এই মহাপ্রভুদেরই জিজ্ঞেস করুন।"

জিম এবার সতেজে বলে, "ব্যাপার আবার কী ! সব সময় কেবল বাবুদের ছেলে হয়ে থাকতে হবে ? একবারও যেন রাস্তার ছেলে হয়ে যা-খুশি করে বেড়াতে ইচ্ছে হয় না ? মানুষ যেন খাঁচার পাখি। চিড়িয়াখানার পোষা ভাল্লুক ! চলে আয় টম ! আবার সেই খাঁচায় ঢুকতে যাই। সাধে বলেছিলাম, আমাদের ভাগ্যে অ্যাডভেঞ্চার-টেঞ্চার নেই। কত কষ্টে জামাটামা ব্লেড দিয়ে কেটে রাস্তার ছেলে সাজা হয়েছিল ! এখন আবার সেই 'এই কর' আর 'সেই কর'। 'এই করিস না' আর 'সেই করিস না'।···এই যে একখানি কাকু আছেন আমাদের, ওঃ।"

কাকু বলে ওঠেন, "ঠিক আছে। অতপর শান্তি। আর কাকুটাকু নেই। তোমাদের বাড়ি পৌঁছে দিয়েই, গেরুয়া পরে সোজা হরিদ্বার।"

দুটি কণ্ঠ একসঙ্গে সচকিত ! "গেরুয়া পরে !"

"তাই ঠিক করেছি। ভূতের সেবা করে মরার থেকে ভগবানের ভজনা করা বেটার।"

"কী ? আমরা ভূত ?"

"ভূতের বাবা। ঠাকুরদা।"

চৌধুরীসাহেব হেসে ফেলেন, "তা এই দুটো দিন এই এক ছাঁচের দুই মহাশয়ব্যক্তি যা করে বেড়িয়েছেন। সবাই তো ভূতের কাণ্ড ভেবে····"

পল্টু বলে ওঠে, "ঠিকই ভেবেছে সবাই। ভূত নয় তো কী ? জ্যান্তভূত। ওদের বাবার সামনেই বলছি।"

ওদের বাবাও হেসে ওঠেন, "সত্যি কথা বলবি, তার ভয়টা কী ? তবে যদি মতলব করে থাকিস ওঁদেরকে আমার ঘাড়ে চাপাবি তা হলে আমিও চাকরিবাকরি ছেড়ে দিয়ে সোজা মানস কৈলাস। আমার জন্যও দু'খানা গেরুয়া ছুপিয়ে রাখিস।"

জোর হাততালি।

হঠাৎ ভূতের নেত্য শুরু হয়ে যায়। "কী মজা ! কী মজা ! ও কাকু আমাদের জন্যও। আমাদের যতসব জামা আছে ছুপিয়ে দিও ! আর টিকিট কিনে ফেলো। ওই মানস-টানসে দরকার নেই। হরিদ্বারের। এর পর তোমার কী নাম হবে কাকু ? 'পল্টু মহারাজ', না 'পল্টনানন্দ স্বামী ?' গেরুয়া পরলেই তো···ও কাকু, আমাদের কী নাম হবে ?"

চৌধুরীসাহেব বলেন, "যত দেখছি। ততই মুগ্ধ হচ্ছি।"

"একদিন-দু'দিন দেখলে তাই হয়। নিয়ে ঘরে থাকুন। আচ্ছা নমস্কার ! মিস্টার চক্রবর্তী।···মিস্টার···"

"চৌধুরী ! চৌধুরী।" টম বলে ওঠে।

তারপর গাড়িতে উঠে 'টা-টা' করে বলে ওঠে, "আপনি দিদাকে বলবেন, আবার আসব। বটুককে, গোবরাকে, গোবরার মাসিকে আর বংশীলালকেও বলবেন।···আমার এই 'দশ মিনিটের ছোট' ভাইটাকেও নিয়ে আসব। এই জিম। টা-টা কর না !"

ছবি : দেবাশিস দেব

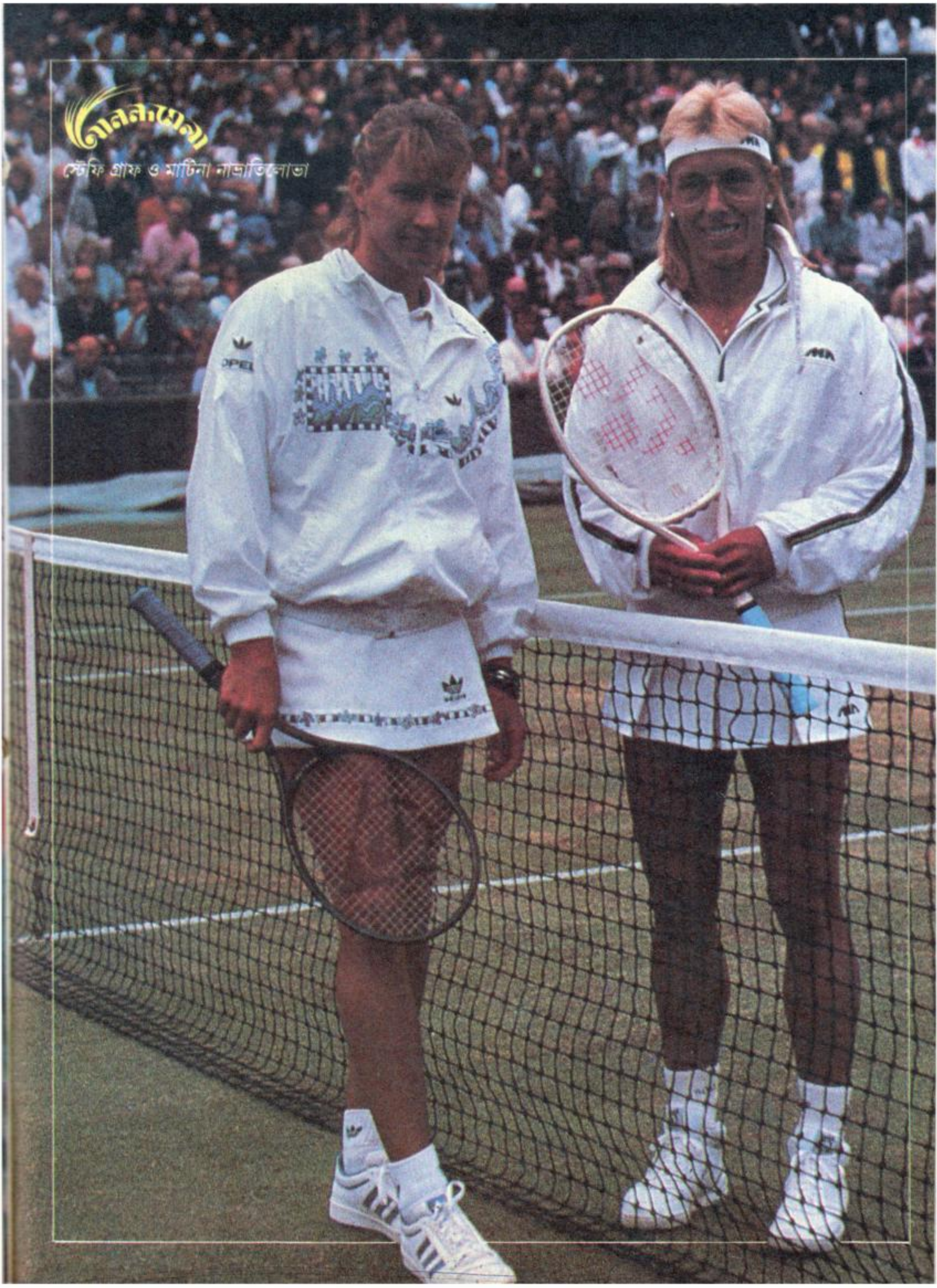

স্টেফি গ্রাফ ও মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা

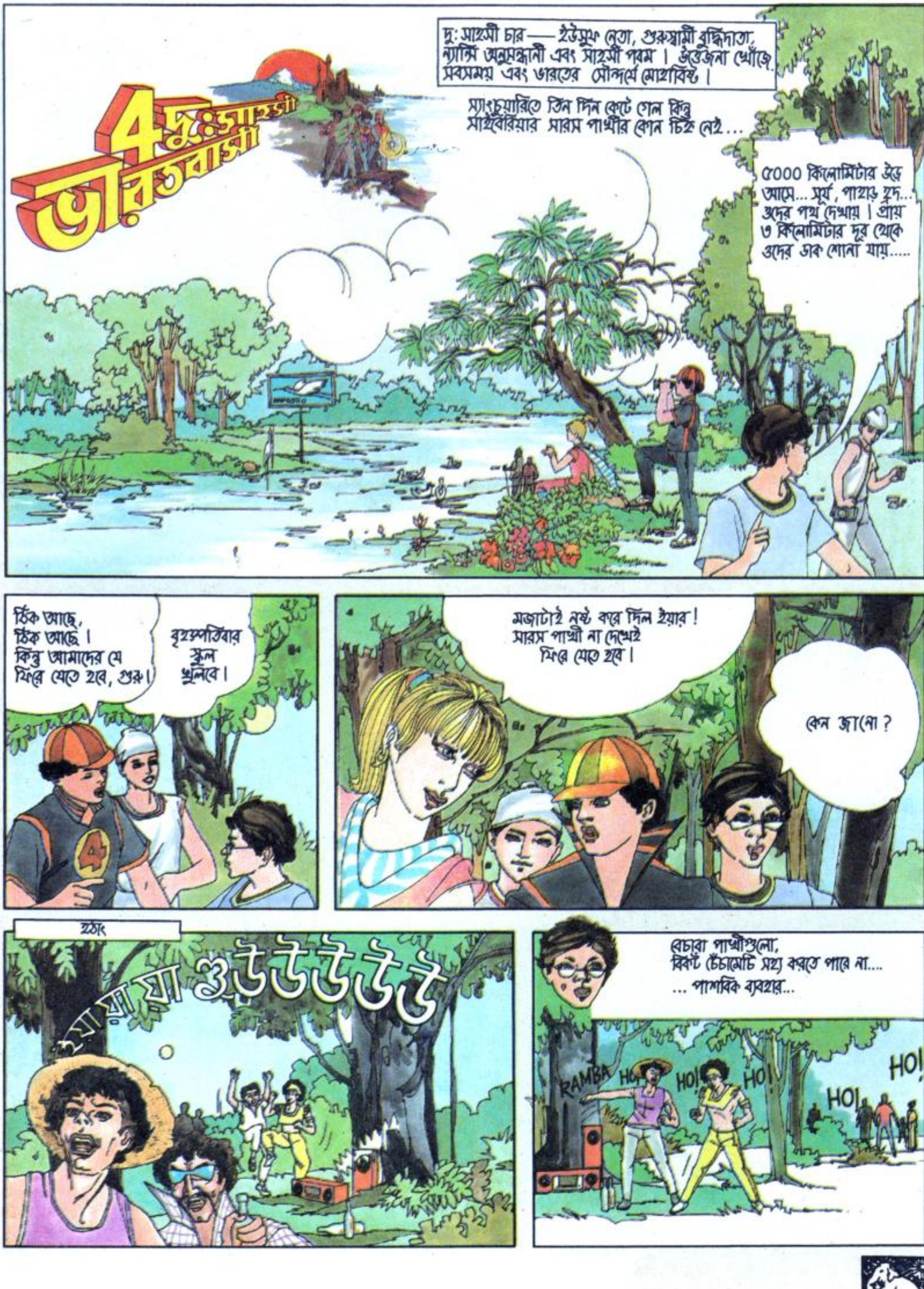
4 দুঃসাহসী ভারতবাসী
দু: সাহসী চার —— ইউসুফ নেতা, গুরুস্বামী বুদ্ধিদাতা, ন্যান্সি অনুসন্ধানী এবং সাহসী পবম। উত্তেজনা খোঁজে সবসময় এবং ভারতের সৌন্দর্যে মোহাবিষ্ট।
স্যাংচুয়্যারিতে তিন দিন কেটে গেল কিন্তু সাইবেরিয়ার সারস পাখীর কোন চিহ্ন নেই...
৫000 কিলোমিটার উড়ে আসে... সূর্য, পাহাড় হ্রদ... ওদের পথ দেখায়। প্রায় ৩ কিলোমিটার দূর থেকে ওদের ডাক শোনা যায়.....
ঠিক আছে, ঠিক আছে। কিন্তু আমাদের যে ফিরে যেতে হবে, গুরু।
বৃহস্পতিবার স্কুল খুলবে।
মজাটাই নষ্ট করে দিল ইয়ার! সারস পাখী না দেখেই ফিরে যেতে হবে।
কেন জানো?
হঠাৎ
ইয়াহ্যায়া গুউউউউউ
বেচারা পাখীগুলো, বিকট চেঁচামেচি সহ্য করতে পারে না.... ... পাশবিক ব্যবহার...
RAMBA HO HO! HO! HO! HO!

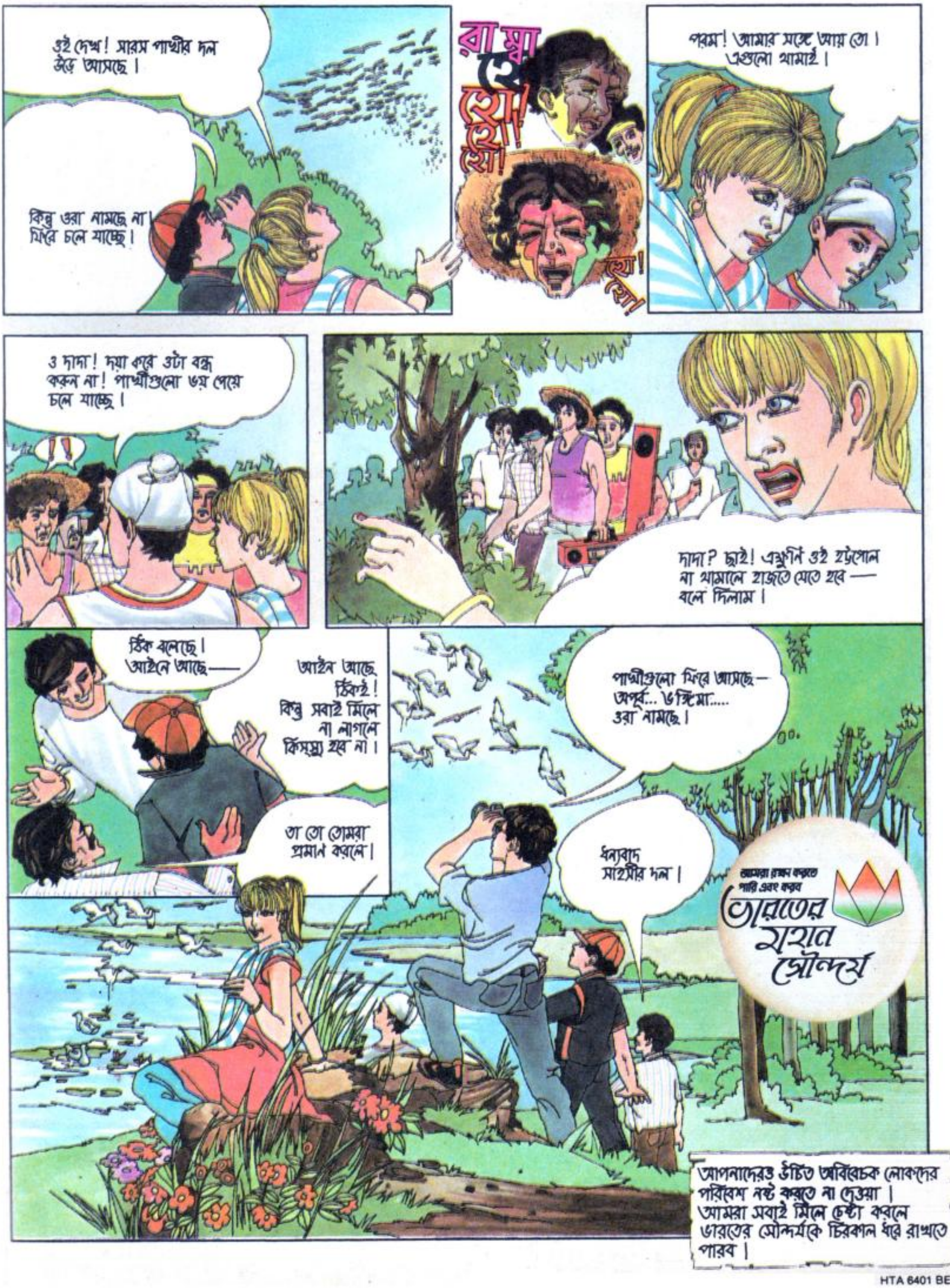
ওই দেখ! সারস পাখীর দল উড়ে আসছে।
কিন্তু ওরা নামছে না। ফিরে চলে যাচ্ছে।
রা ম্বা
হে
হো! হো! হো!
হো! হো!
পরম! আমার সঙ্গে আয় তো। এগুলো থামাই।
ও দাদা! দয়া করে ওটা বন্ধ করুন না! পাখীগুলো ভয় পেয়ে চলে যাচ্ছে।
!!
দাদা? ছাই! এক্ষুনি ওই হট্টগোল না থামালে হাজতে যেতে হবে — বলে দিলাম।
ঠিক বলেছে। আইনে আছে——
আইন আছে ঠিকই! কিন্তু সবাই মিলে না লাগলে কিস্যু হবে না।
তা তো তোমরা প্রমান করলে।
পাখীগুলো ফিরে আসছে— অপূর্ব... ভঙ্গিমা..... ওরা নামছে।
ধন্যবাদ সাহসীর দল।
আমরা রক্ষন করতে পারি এবং করব
ভারতের মহান সৌন্দর্য
আপনাদেরও উচিত অবিবেচক লোকদের পরিবেশ নষ্ট করতে না দেওয়া। আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করলে ভারতের সৌন্দর্যকে চিরকাল ধরে রাখতে পারব।

HTA 6401 BEN

আনন্দমেলা
স্টেফান এডবার্গ

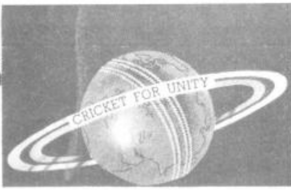

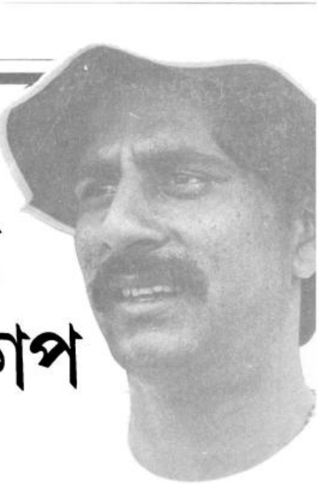

নেহরু কাপ মিনি বিশ্বকাপ কে জিতবে

তানাজি সেনগুপ্ত

দু'বছরের মধ্যেই আবার প্রায় একটি বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আসর বসতে চলেছে ভারতে। 'প্রায়' এই কারণেই যে, গত রিলায়েন্স বিশ্বকাপে যোগ দেওয়া আটটি দেশের মধ্যে দু'টি দেশ আসছে না—জিম্বাবোয়ে ও নিউজিল্যান্ড। এ ছাড়া বাকি ছ'টি দেশ—ওয়েস্ট ইন্ডিজ, অস্ট্রেলিয়া, পাকিস্তান, ইংল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা এবং ভারত যোগ দিচ্ছে একদিনের এই মহারণে। কলকাতায় হচ্ছে দু'টি ম্যাচ—পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের এবং ফাইনালটি। অর্থাৎ পুজোর পরই আমাদের উৎসব শেষ হচ্ছে না, জমজমাট উৎসব চলবে আরও কয়েকদিন।

এবারের এই ওয়ান ডে টুর্নামেন্টের উপলক্ষ—জওহরলাল নেহরুর শতবর্ষ স্মরণ। নেহরু কাপের প্রত্যেকটি ম্যাচ হবে ৫০ ওভারের এবং ছ'টি দল পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর প্রথম চারটি দল সেমিফাইনালে যাবে। এর পর প্রথম বনাম চতুর্থ এবং দ্বিতীয় বনাম তৃতীয়-র বিজয়ীরা ফাইনালে লড়াই করবে।

গত বিশ্বকাপে সুবিধা করতে পারেনি ওয়েস্ট ইন্ডিজ। কিন্তু সেটাকে অঘটন হিসেবে ধরাই ভাল। কয়েকজন নতুন খেলোয়াড় নিয়ে সেই সময় দল তৈরি হচ্ছিল।

অধিনায়ক ভিভ রিচার্ড্স নিঃসন্দেহে এখনও পৃথিবীর সেরা একদিনের খেলোয়াড়। রিচার্ড্স যদি সত্যিই ব্যাটে ঝড় তুলবেন মনে করেন, বিপক্ষ দলের খুব কম বোলারেরই সামর্থ্য আছে তাঁকে আটকানোর। বর্তমান ফর্মের বিচারে অস্ট্রেলিয়ার অল্ডারম্যান, লসন, পাকিস্তানের কাদির এবং ভারতের কপিলদেব নিখঞ্জ (একমাত্র) ছাড়া আর কেউই ভিভের কাছে সমীহ পাবেন না। ভাল ফর্মে আছেন ব্যাটসম্যান রিচি রিচার্ড্সনও। ওয়েস্ট ইন্ডিজে ভারতের বিরুদ্ধে দারুণ খেলেছিলেন তিনি। রিচার্ড্সনের সঙ্গে আছেন অভিজ্ঞ হেনেস এবং গ্রিনিজ। এ ছাড়া আর্থারটন এবং ব্যাটসম্যান লোগিও নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগ নিশ্চয় ছাড়বেন না। ফাস্ট-বোলিংয়ে ত্রাস সৃষ্টি করবেন অ্যামব্রোস, ওয়াল্স, প্যাটারসন এবং মার্শাল। যদি ওয়েস্ট ইন্ডিজ পুরো দল নিয়ে আসে তবে দৃষ্টিনন্দন ক্রিকেট অবশ্যই দেখতে পাব আমরা।

ইংল্যান্ডকে নাস্তানাবুদ করে দারুণ মেজাজে আছেন অ্যালান বর্ডার এবং তাঁর সতীর্থরা। এই সিরিজের আবিষ্কার মার্ক টেলর। সুদক্ষ ব্যাটসম্যানের সব রকম বৈশিষ্ট্যই আছে টেলরের মধ্যে। ইংল্যান্ডে সাফল্য যে আকস্মিক নয়, তা প্রমাণের দায়িত্ব এখন এই তরুণের। নেহরু কাপই প্রমাণের জায়গা হতে পারে। স্টিভ ও হলেন বর্ডারের আর এক ভরসা—ব্যাটে এবং বলে। ডিন জোন্স এবং ডেভিড বুনও ভাল ফর্মে আছেন। বোলিংয়ে অবশ্যই অল্ডারম্যান এবং লসন বিরাট অস্ত্র। গত বিশ্বকাপ জয়ের পর সাইমন ও'ডনেল ক্যানসারকেও জয় করেছেন। তিনি দলে একবছর পর ফিরেছেন। ও'ডনেলের লক্ষ্য কী এবার নেহরু কাপ?

পাকিস্তান দলে বহু যুদ্ধের তিন নায়ক আছেন—ইমরান খান, আব্দুল কাদির এবং জাভেদ মিঁয়াদাদ। একদিনের ম্যাচের রণকৌশল এঁদের মতো ক'জন জানেন সন্দেহ আছে! ব্যাটিংয়ে কম্পিউটার র‍্যাঙ্কিং-এ ওপরের দিকে আছেন মিঁয়াদাদ। পাক-আক্রমণের আর এক প্রধান অস্ত্র ওয়াসিম আক্রম। সব মিলিয়ে পাকিস্তান অত্যন্ত শক্তিশালী দল।

স্টিভ ও

নেহরু কাপের সবচেয়ে দুর্বল দু'টি দল ইংল্যান্ড এবং শ্রীলঙ্কা। অস্ট্রেলিয়ার কাছে অত্যন্ত বাজেভাবে হারার পর ইংল্যান্ড দলে অনেক তরুণকে আনা হয়েছে। দলে নেই গ্যাটিং, গাওয়ার এবং বথাম। যা কিছু ভরসা গুচ, ল্যাম্ব, ক্যাপেল এবং ডেফ্রিটাস। অর্জুন রণতুঙ্গের শ্রীলঙ্কা দলও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়াতে পারবে বলে মনে হয় না।

ভারতীয় দলে একদিনের ম্যাচের অভিজ্ঞতা অনেকেরই আছে। বিশ্রামের পর মারমুখী শ্রীকান্ত তৈরি। অভিজ্ঞ এবং তরুণদের সমন্বয়ে দল খারাপ হবে বলে মনে হয় না। হয়তো শচীন তেন্ডুলকরের আন্তর্জাতিক ম্যাচে অভিষেক হবে এই নেহরু কাপেই।

একদিনের খেলায় দলগত শক্তি মুখ্য ভূমিকা নেয় ঠিকই, কিন্তু দেখা যায়, একটি ক্যাচ, একটি আউট বা একজনের দুর্দান্ত দক্ষতা খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

যাই হোক না কেন, আমাদের একান্ত আশা, ইডেন গার্ডেন্সে ফাইনালের দিন একপক্ষে আমরা যেন ভারতীয় দলকে দেখতে পাই।

গৌতম সরকার

মাঝমাঠের লড়াই

পূর্ব প্রকাশিতের পর

মহমেডান ম্যাচের পর থেকে আমাকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। একটা বড় ম্যাচের সাফল্য ইস্টবেঙ্গল একাদশে আমার স্থান পাকা করে দিল। এর মানে এই নয় যে, একটা ম্যাচ ভাঙিয়েই আমি সারা মরসুম খেলে গেলাম। ইস্টবেঙ্গলে তখন ভাল খেলোয়াড়ের সংখ্যা এত বেশি যে, একদিন খারাপ খেলা মানেই পরের দিন অবধারিতভাবে দল থেকে বাদ পড়তেই হবে। কিন্তু আমি জুনিয়ার হলেও দলে আসতে পারব কি না এই অনিশ্চিত ভাবটা কেটে গেল সবার মন থেকে। মহমেডান ম্যাচে প্রমাণ হল, বয়স বড় ব্যাপার নয়—মাঠে খেলাই বড় কথা।

লিগে প্রায় সারা মরসুমটাই আমি মাঝমাঠে খেলার সুযোগ পেলাম। মোহনবাগানকে আমরা হারালাম হাবিবের গোলে এবং সে বছরের প্রথম ট্রোফি চলে এল ইস্টবেঙ্গল তাঁবুতে। আমি তো খুব খুশি। অবশ্য বড় ক্লাবে এসেই নিজের এবং দলের সাফল্য দেখলে কার না আনন্দ হয়!

আনন্দটা বোধ হয় বেশিই হয়েছিল, তাই যথারীতি ধাক্কা খেলাম কয়েকদিনের মধ্যেই। সেটা অবশ্য মাঠে নয়। বরদলুই খেলতে গিয়ে আমি জন্ডিসে আক্রান্ত হলাম। ডাক্তারবাবু বললেন, শরীর আমার যথেষ্ট খারাপ হয়েছে এবং আমি খেলতেও পারব না এই মরসুমটা। কথাটা শুনে শরীরের জন্য আমার মন যত না খারাপ হয়েছিল, তার চেয়েও অনেক খারাপ লেগেছিল খেলতে পারব না জেনে। আমি প্রায় ভেঙে পড়েছিলাম। ডাক্তারবাবুকে কাকুতি-মিনতি করে বললাম, "এমন কিছু ওষুধ দিন, যাতে অন্তত এ-সিজনে কিছুদিন খেলতে পারি।" ডাক্তারবাবু হেসে বলেছিলেন, "খেলবার ওষুধ আমার জানা নেই, তোমার শরীর যাতে সুস্থ হয়, সে-চেষ্টা আমি করব।"

গুয়াহাটি থেকে মনখারাপ করে ফিরে এলাম বাড়িতে। মাত্র একটা ম্যাচ খেলেছিলাম ওখানে। বিশ্রাম নিতে শুরু করলাম। এরই মধ্যে এবার এল একটা খুশির খবর—ব্যাংকে আমার চাকরি হয়েছে; যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যোগ দিতে হবে। শুনে লাফ দিতে ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু কী করব, শরীর যে বড় দুর্বল! তবে খুব আনন্দ পেলাম. আর্থিক প্রয়োজনে পরিবারের পাশে আমারও তো দাঁড়ানো উচিত! সেটা এবার পাবব।

শরীরের জন্য আই· এফ· এ· শিল্ডেও আমি খেলতে পারলাম না। ফাইনালে মুখোমুখি হল ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান। মোহনবাগানের সুকু (সুকল্যাণ ঘোষদস্তিদার) একটা অবিস্মরণীয় গোল করেছিল মাঝমাঠ থেকে, এখনও মনে আছে। অবশ্য গোলের পরই ইস্টবেঙ্গল দারুণ চেপে ধরে। কিন্তু খেলা বন্ধ হয়ে যায় প্রবল বৃষ্টির জন্য। বেশ কিছুদিন পর আবার যখন এই ফাইনালের খেলা দেওয়া হয়, মোহনবাগান খেলতে চাইল না। ইস্টবেঙ্গল দল মাঠে নেমেছিল এবং ওয়াকওভার পায়। সেই দলে আমি ছিলাম।

এরই মধ্যে আমি মনে শক্তি সঞ্চয় করে প্র্যাকটিস শুরু করেছিলাম, এবং রিপ্লে ফাইনালের আগেই 'ফিট' করে তুলেছিলাম নিজেকে। আমার সৌভাগ্য, আমি বেশ কিছুদিন ম্যাচ না খেললেও প্রদীপদা আমার প্র্যাকটিস দেখেই আমাকে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে খেলার উপযুক্ত মনে করেছিলেন।

এই আস্থা আমার মনের জোর আরও বাড়িয়ে দিল। রোভার্সে ইস্টবেঙ্গল ভারতের কোনও দলকেই প্রায় দাঁড়াতে দিল না। অবশ্য ভাল খেলেও আমরা গোলশূন্য ফাইনাল শেষ করলাম মোহনবাগানের সঙ্গে। যুগ্ম চ্যাম্পিয়ান হলাম ওদের সঙ্গে।

ডুরান্ডে আমরা একক চ্যাম্পিয়ানই হয়েছিলাম, মোহনবাগান আমাদের সামনে সুবিধে করতে পারল না। হাবিবই বোধ হয় দিল্লির মাঠে গোলটা করেছিল।

যাই হোক, আই· এফ· এ· শিল্ড, রোভার্স, ডুরান্ড জয়ের সুবাদে আমরা ত্রিমুকুট পেলাম। ভারতবর্ষের প্রথম ক্লাব হিসেবে ইস্টবেঙ্গল এই গৌরবের অধিকারী হল। নিঃসন্দেহে, ক্লাবের সম্মানের দিক দিয়ে এটা বড় ব্যাপার। এবং এই বিরাট কীর্তির অন্তর্ভুক্ত হলাম আমিও। দলের সবচেয়ে জুনিয়ার সদস্য হিসেবে আমার আনন্দের সীমা-পরিসীমা রইল না।

আর-একটা ব্যাপারেও আমার খুব আনন্দ হয়েছিল। আগেই জানিয়েছি, আমার প্রিয় দল মোহনবাগান। ইস্টবেঙ্গল যখন ত্রিমুকুট জয় করল, মোহনবাগানই প্রথম হোটেলে আমাদের সংবর্ধনা জানিয়েছিল। খেলোয়াড়সুলভ মনোবৃত্তিতে আমার প্রিয় ক্লাব কারও চেয়ে পিছিয়ে নেই, এটা দেখে খুব ভাল লেগেছিল। অর্থাৎ, সব দিক দিয়েই আমার সেটা খুশির সময়।

অনেকেই জিজ্ঞেস করেন, ১৯৭২ সালে ইস্টবেঙ্গলের এই অভূতপূর্ব সাফল্যের কারণ কী? আমার মনে হয়, ভাল খেলোয়াড় তো ছিলই—স্বপন, অশোকলাল ব্যানার্জি, মোহন, পিন্টু দারুণ খেলেছিল, এবং আরও দু'জন হয়ে উঠেছিল অসাধারণ—হাবিব আর সুধীর। এর সঙ্গে ছিল প্রদীপদার কোচিং। একসঙ্গে একঝাঁক ভাল ছেলে পেয়ে প্রদীপদাও মনেপ্রাণে জড়িয়ে পড়েছিলেন। আর ছিল কর্মকর্তাদের সহায়তা। বিশেষত, শ্রীমানীদার কথা বলব। শ্রীমানীদা শুধুমাত্র আমাকেই তুলে আনেননি, যথার্থ অভিভাবকের মতো ক্লাবের সবার প্রতি সমান নজর দিতেন।

ত্রিমুকুট জয়ে আমার আনন্দ হয়েছিল খুব, তা আগেই বলেছি। আরও ভাল লাগল, আমার বন্ধু সুধীরের অধিনায়কত্বে ব্যাপারটা হল বলে।

আমার মা-বাবাও· আমাদের সাফল্যে দারুণ খুশি হয়েছিলেন। বাবা-মাকে সুখী দেখতে পাচ্ছি এরচেয়ে বড় কৃতিত্ব আর কী হতে পারে! মনে আছে, ডুরান্ড ফাইনালের পরে সন্ধেবেলায় আমি বাবাকে টেলিফোনে জয়ের সংবাদটা জানিয়েছিলাম। আনন্দের চোটে আমি কেঁদে ফেলেছিলাম, ওদিকে বাবাও। আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে ছিল সুধীর। ফোনটা ওর হাতে দিয়েছিলাম। ত্রিমুকুট জয়ী অধিনায়ক হিসেবে সুধীরকে বাবা অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

(ক্রমশ)

অনুলিখন : তানাজি সেনগুপ্ত

জন্মেছি :
১৯৬২ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি ।
থাকি :
নাকতলা, কলকাতায় ।
মা-বাবার :
ছোট ছেলে । ওপরে আর এক দাদা আছেন ।
পরিচিতজনের কাছে যে নামে পরিচিত :
রণ্টু ।
প্রথম মনে রাখার মতো গোল :
১৯৮০ সালে, ওড়িশার বহরমপুরে, জুনিয়ার ন্যাশনাল টুর্নামেন্টে, একটা ম্যাচে তিন-চারজনকে কাটিয়ে । গোলটা করে খুব তৃপ্তি পাই ।
সেরা উপহার :
জীবনের প্রথম বুট । পরিচিত শাণ্টুদা কিনে দিয়েছিলেন ।
উপহার পেয়ে ভেবেছিলাম :
শুধু পায়ে পরে থাকি । মাঠে নামতে কষ্ট হত । যদি কাদা, ময়লা লেগে যায় !
সেরা গোল :
একটাও নয় । সেরা গোল দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছি । দেখা যাক, কবে দিতে পারি !
যে গোল দিয়ে তৃপ্তি পেয়েছিলাম :
অনেক গোল । তাদের মধ্যে 'সেরা'টি হচ্ছে এবারের এস এস এস ট্রোফিতে । বিকাশের কাছ থেকে মহমেডান অর্ধে বল পেয়ে প্রথমে বিজয় কুমারকে কাটাই, এরপর অমিতকে ছিটকে দিই । তারপর আর একজনকে, ঠিক কাকে মনে নেই । এরপর সামনে পাই পাশাকে, ওকে কাটাই । দেখতে পাই, তনুময় গোল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে । ওই অবস্থায় পড়ে যেতে যেতে আমি ছোট একটা টোকায় ওর পাশ দিয়ে বল রাখি, বল জালে জড়ায় ।
মাঠের সেরা বন্ধু :
বিকাশ পাঁজি, ইস্টবেঙ্গল দলে আমার সহ-খেলোয়াড় ।
পছন্দ করি :
কম কথা বলা ।
অখুশি হই :
পায়ে আঘাত লাগলে ।

আমি

কৃশানু দে

এবারের 'আমি' বিভাগে 'শিল্পী' ফুটবলার কৃশানু দে । শুধু বল-প্লের শিল্প-সৌন্দর্যের গুণে সারা ভারতে এখনও দর্শককে মাঠে নিয়ে আসার দক্ষতা একমাত্র বোধহয় কৃশানুরই আছে । এই পাতায় উপস্থিত হলেন অকপট কৃশানু নানা বিষয়ে । আগামী 'আমি' প্রখ্যাত ক্রিকেটার ।

খেতে দারুণ পছন্দ করি :
আমিষ । চাইনিজ খুব ভাল লাগে ।
অবসর কাটাই :
ভিডিও-তে খেলার ফিল্ম দেখে । আর গান শুনতেও ভাল লাগে ।
এখানকার সেরা ফুটবলার বলে মনে করি :
টুলুদা, সুদীপ চ্যাটার্জিকে । কমপ্লিট ফুটবলার বলতে ওকেই মনে হয় ।
বিশ্বের সেরা মনে হয় :
মারাদোনাকে, টিভি-তে দেখে যা বুঝেছি ওঁর তুলনা হয় না । প্রকৃতপক্ষে তিনি একা একটা দলকে টানছেন ।
বিশ্বের যে দলে খেলার স্বপ্ন দেখি :
ব্রাজিল দলে । গত দুটো বিশ্বকাপে হারলেও ওদের খেলায় আলাদা একটা সৌন্দর্য আছে । ওদের স্কিল দুর্দান্ত, দলগত খেলাও দারুণ । পেলে, গ্যারিঞ্চার দল তো !
আমার প্রিয় খেলোয়াড়, এখানে :
সুরজিৎদা, শ্যামদা অর্থাৎ সুরজিৎ সেনগুপ্ত আর শ্যাম থাপা ।
এখানে যে তিন ফরোয়ার্ডের সঙ্গে খেলার স্বপ্ন দেখি :
সুরজিৎ দা, শ্যামদা আর বিদেশ বসুর সঙ্গে ।
বিরাট মাপের খেলোয়াড়দের মধ্যে যার সঙ্গে প্রথমেই দেখা করতে চাই :
সুনীল গাওস্কর ।
যে ডিফেন্ডারকে ভয় পাই :
এখন কাউকেই ভয় পাই না । আগে মনাদাকে (মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য) ভয় পেতাম ।
নিজেকে গর্বিত মনে করব সেদিনই, যেদিন :
দেশের হয়ে সেরা খেলা খেলতে পারব । ভারতের সম্মান বাড়াতে পারব ।
দুঃখ পাই :
যখন দেখি ফুটবলে সব দেশ এগোচ্ছে, আর আমরা পিছোচ্ছি ।
রেগে যাই :
যখন বিপক্ষের কোনও খেলোয়াড় ইচ্ছে করে কাউকে মেরে ফেলে দেয়, অথচ রেফারি কিছু বলেন না !
স্বপ্ন দেখি :
খেলা ছেড়ে দেবার পরও যেন ফুটবলার হিসেবে লোকের মনে স্থান পাই, তাঁরা যেন আমায় ভুলে না যান ।
পুজোর চারদিন কীভাবে কাটাব :
যদি কলকাতায় থাকি, কাছাকাছি কোথাও বেড়াতে যাব এখানে ঘোরাই যায় না । সবাই চিনে ফেলে··· ।

ফোটো : সৌমেন চট্টোপাধ্যায়

বিদায় ক্রিস

কিশোর রায়

ষোলো বছর বয়সে, ১৯৭১ সালে মাথায় বিনুনি ঝুলিয়ে ক্রিস এভার্ট যখন জীবনের প্রথম টুর্নামেন্টটি খেলছেন, জিনা গ্যারিসনের বয়স তখন সাত। ১৯৭৪ সালে জীবনের ১৮টি গ্র্যান্ড স্লাম টুর্নামেন্টের প্রথমটি জেতেন ক্রিস। তখন থেকেই ক্রিসের ফ্যান দশ বছরের জিনা। এবং তাঁর খেলা দেখা, অটোগ্রাফ নেওয়া হয়ে দাঁড়ায় জিনাসহ সেই সময়ের কিশোর-কিশোরীদের দারুণ গর্বের ব্যাপার।

সেই জিনা এবার ক্রিসকে হারালেন ইউ· এস· ওপেন-এ। জিতেও চোখের জলে ভাসলেন তিনি। কারণ ৩৪ বছরের ক্রিসের এটাই শেষ বড় ম্যাচ। জিনা বলেছেন, "আমি শেষ পর্যন্ত ভিলেন হলাম! তবে একটাই সান্ত্বনা, সবাই ক্রিসের সঙ্গে-সঙ্গে আমাকেও মনে রাখবে।"

মনে রাখারই মতো টেনিস খেলেছেন ক্রিস এভার্ট, উনিশ বছর ধরে। একটানা এতদিন ধরে ভাল খেলা এবং সাফল্যের নজির ক্রিসের বন্ধু ও চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা ছাড়া আর কারও নেই। প্রকৃতপক্ষে, সত্তরের দশকের পুরোটা এবং আশির প্রথমার্ধ টেনিস-জগতকে শাসন করেছেন এই দুই মহিলাই। পুরুষদের মধ্যেও এরকম সাফল্য সমসাময়িক আর কারও নেই। ক্রিসের কৃতিত্ব আরও বেশি। কারণ, তিনি জিতেছেন বিভিন্ন সারফেসে, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কোর্টে। একদিকে তিনি যেমন জিতেছেন উইম্বলডন, অন্যদিকে তেমনই ইউ· এস·, ফ্রেঞ্চ এবং অস্ট্রেলিয়ান ওপেনও তাঁর জয়ের তালিকায় আছে।

ক্রিস এভার্ট জিতেছেন মোট ১৮টি গ্র্যান্ড স্লাম টুর্নামেন্ট। এর মধ্যে ইউ· এস· ওপেন ছ' বার, ফরাসি ওপেন সাত বার, অস্ট্রেলীয় ওপেন দু' বার এবং উইম্বলডন তিনবার।

যেসব বছরে ক্রিস জিততে পারেননি, সেসব বছরেও প্রত্যেক টুর্নামেন্টেই একটা নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত গেছেন। হঠাৎ ভাল খেলা এবং তারপর খারাপ—এটা তাঁর জীবনে কখনও ঘটেনি। উইম্বলডনে ১৮ বছরে ১৭ বার সেমিফাইনাল খেলেছেন তিনি। চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন ১৯৭৪, '৭৬ এবং '৮১ সালে। এই সেদিন ইউ· এস· ওপেনে 'সেঞ্চুরি' জয় পেলেন ১১২টি ম্যাচ খেলে। দুর্দান্ত সাফল্য! ক্রিস বলেছেন, "আমি সংখ্যাতত্ত্বের ধার ধারি না। ধারাবাহিকতা বজায় রাখাই আমার কাছে বড় ব্যাপার। সতেরো বছর বয়স থেকে আমি কোনওদিন চার নম্বরের নীচে নামিনি। বড় বিপর্যয়ের মধ্যে কখনও পড়িনি। আমার মনে হয়, এটাই সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব।"

আমেরিকার ফ্লোরিডার ফোর্ট লডারডেল-এর কিশোরী ক্রিস্টিন মেরি এভার্ট বাবা জিমি এবং মা কোলেটের দ্বিতীয় সন্তান। বাবা জিমির কাছেই টেনিসের প্রাথমিক শিক্ষা নেন ক্রিস। টেনিস বিশেষজ্ঞদের নজরে আসেন যখন তিনি জুনিয়ার হাই স্কুলের ছাত্রী। আঠারো বছরের কমবয়সী মেয়েদের আমেরিকান জুনিয়ার সিঙ্গল্‌স প্রতিযোগিতায় জয়ের পর। এর পর ১৯৭১ সালে তিনি অনায়াসে পৌঁছে যান যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের সেমিফাইনাল পর্যায়ে। সেখানে পরাজিত হলেও তাঁর খেলা দেখে খুব খুশি হয়েছিলেন সেই সময়ের সেরা মহিলা টেনিস খেলোয়াড় বিলি জিন কিং। বলেছিলেন কিং, "এক নতুন প্রতিভা আগামী দিনে টেনিস-জগতে আলোড়ন তুলতে আসছে।" কিংয়ের কথার সম্মান ও মর্যাদা রাখতেই যেন, তিন বছরের মধ্যে, ১৯৭৪ সালে একইসঙ্গে ফরাসি ওপেন ও উইম্বলডন জিতে নিলেন ক্রিস এভার্ট।

মার্টিনা নাভ্রাতিলোভার সঙ্গে ক্রিসের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে তীব্র। কখনও ক্রিস তাঁর 'বেস লাইন'-নির্ভর টাচ প্লেতে পর্যুদস্ত করেছেন মার্টিনাকে, কখনও মার্টিনা হারিয়েছেন ক্রিসকে তাঁর 'পাওয়ার'-নির্ভর খেলায়। সাফল্যের দিক দিয়ে মার্টিনা এগিয়ে, দু'জনের সাক্ষাতে মার্টিনা জিতেছেন ৪৩টি ম্যাচ এবং ক্রিসের জয়ের সংখ্যা ৩৭। তবু ক্রিসের চোখ-জুড়নো টাচ প্লেতেই বেশি আকৃষ্ট হয়েছেন দর্শকরা। অবশ্য শুধু টেনিসে কেন, 'শিল্পী'দের কদর সর্বত্রই সর্বাগ্রে।

শান্ত স্বভাব, বরফ-শীতল কাঠিন্য এবং নিয়মনিষ্ঠ মনোভাব—এই তিনের সমন্বয়েই ক্রিসের চরিত্র গড়ে উঠেছে। কোর্টে কখনও উত্তেজিত হননি তিনি। প্রতিদ্বন্দ্বিতা যতই তীব্র হোক না কেন, নিজের খেলা খেলে গেছেন তিনি শান্তভাবে। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, জয়ী হয়েই তিনি কোর্ট ছাড়ছেন।

এত দীর্ঘ সময় শরীর সুস্থ রেখে একই মানের টেনিস খেলে গেলেন ক্রিস। এটা কম কৃতিত্বের নয়! বিশেষত, বিশ্ব-টেনিসে এখন যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অত্যন্ত তীব্র। এই ধারাবাহিকতার রহস্য কী? ক্রিস জানিয়েছেন, "প্রবল ইচ্ছে। ধারাবাহিকভাবে ভাল খেলার জন্য মানসিক দৃঢ়তা খুবই দরকার। সেটা আমার ছিল।"

৩৪ বছর বয়সে সেটারই অভাব অনুভব করছেন ক্রিস। এবং তাই এখন বিদায় জানাচ্ছেন টেনিসকে। উনিশ বছর পর ক্রিস এবার সময় পাবেন তাঁর বর্ণময়, রঙিন টেনিস-জীবনকে পিছন ফিরে দেখার!

দু' দশক বিস্তৃত ক্রিসের টেনিস-জীবনের সাফল্য ঈর্ষণীয়। জিতেছেন ১৩০৪টি ম্যাচ এবং ১৫৭টি খেতাব।

প্রেসিডেন্টের ফুটবল খেলা

শুধু দেশ চালাতেই নয়, ফুটবল খেলাতেও দারুণ দক্ষ আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট কার্লোস মেনেস। উনষাট বছরেও শারীরিকভাবে তিনি পটু, এমনকী বল নাচাতেও কম যান না। সম্প্রতি ৫৫ হাজার দর্শকের সামনে ভেলেজ সারসফিল্ড স্টেডিয়ামে আর্জেন্টিনার জাতীয় দলের হয়ে মাঠে নেমেছিলেন তিনি এক প্রদর্শনী ম্যাচে। যে দলটি দক্ষিণ আমেরিকান কাপে খেলে এল, সেই দলেরই পাঁচ নম্বর খেলোয়াড় ব্যাতিস্তার বদলে খেলেছেন তিনি। মারাদোনার একমাত্র গোলে শেষ পর্যন্ত তাঁর দল জেতে। তিনি পুরো নব্বই মিনিটই মাঠে ছিলেন, বাড়িয়েছেন কয়েকটি সুন্দর পাসও। কিন্তু তার সঙ্গে কড়া ট্যাক্‌লে যাননি বিপক্ষের কোনও খেলোয়াড়। এটুকু সুবিধা পেতেই পারেন বই কী দেশের প্রেসিডেন্ট!

ছবির গল্প

ছবি অনেক কথা বলে। এখানে অনেক নয়, সব কথাই বলেছে। বর্ডারের অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দলের ইংল্যান্ডকে বিধ্বস্ত করার গল্প বলা হয়েছে পোস্টারটিতে ছন্দের আকারে, সুন্দর পদ্যে। শুধু দু' একটি নাম-সূত্র দেওয়া যেতে পারে ও (দ্বিতীয় লাইনে)— অস্ট্রেলিয়া দলের সফল ব্যাটসম্যান। ডেক্সটার (তৃতীয় লাইনে)— ইংল্যান্ডের নির্বাচক কমিটির প্রধান। অল-ডার-ম্যান (শেষ লাইনে)— একের পর এক উইকেট নিয়ে ইংল্যান্ডকে মুখ থুবড়ে পড়তে বাধ্য করেছেন ইনি। এই চমৎকার পোস্টারটি সত্যিই প্রশংসার যোগ্য।

বই হাতে ওলিম্পিক চ্যাম্পিয়ান

দু'বারের ওলিম্পিক হার্ড্‌ল চ্যাম্পিয়ান রজার কিংডম-এর এখন বিমানযাত্রার সঙ্গী ঢাউস একটা ব্যাগ। এতে রানিং শু, কিট্‌স বা এই ধরনের কোনও খেলার সরঞ্জাম থাকে না। তার বদলে থাকে মোটা মোটা বই—অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্বের। সাতাশ বছরের এই মার্কিন তরুণ পিটস্‌বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। কিন্তু সারা বছর এত অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা থাকে যে, আলাদাভাবে আর পড়ার সময়ই পান না রজার। তাই এই ব্যবস্থা। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, আগামী বার্সিলোনা ওলিম্পিকে ১১০ মিটার হার্ড্‌লসে যদি কিংডম জয়ী হতে পারেন, তবে পরপর তিনবার জয়ের এক অনন্য রেকর্ড গড়বেন তিনি।

রেকর্ডের বিশ্বভ্রমণ

দিল্লি থেকে মোটরে বিশ্ব পরিক্রমায় বেরোলেন বাঙালি দম্পতি শালু ও নীনা চৌধুরী। বিশ্ব-পরিক্রমার বিশ্ব রেকর্ড বর্তমানে আছে কেন ল্যাঙ্গলে এবং গ্যারি সোদাররির, তাঁরা ১৯৮০ সালে চারটি মহাদেশ পরিক্রমা করেন। শালু ও নীনা চৌধুরীর আশা, তাঁরা ৩০ হাজার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করবেন ৬৫ দিনে। যাবেন, ছ'টি মহাদেশের ২৫টি দেশে। এটি যদি করতে পারেন, তা হলে তা গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে স্থান পাবে। তাঁরা ফিরবেন ১১ নভেম্বর। শ্রী ও শ্রীমতী চৌধুরীর প্রতি আমাদের আগাম অভিনন্দন রইল।

জার্মানিতে টেনিস হাওয়া

বরিস বেকার এবং স্টেফি গ্রাফ উইম্বলডনের পর এবার ইউ· এস·ওপেন জিতে আবার জার্মান 'ডবল' করলেন। পশ্চিম জার্মানির সমর্থকরা এঁদের নিয়ে গর্বিত ঠিকই, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, এই দুই তরুণ-তরুণী খেলার আসরে আসার পরই জার্মানির খেলার জগৎটাই বদলে গেছে। জার্মানিতে আগে কিশোরদের স্বপ্ন ছিল ফুটবলার বেকেনবাওয়ারের মতো হওয়া, এখন বেকারই আদর্শ। টেনিস ছিল অভিজাতদের খেলা, এখন ন'হাজার টেনিস ক্লাবে হাজার হাজার কিশোর-কিশোরী টেনিস শিখছে। চল্লিশ হাজার টেনিস কোর্টও এখন সেখানে কম মনে হচ্ছে!

সফল দিব্যেন্দু

বাংলার ছেলে দিব্যেন্দু বড়ুয়া অবশেষে গ্র্যান্ডমাস্টার নর্ম পেলেন। লন্ডন দাবা অ্যাসোসিয়েশনের গ্র্যান্ডমাস্টারদের প্রতিযোগিতায় জিতে দিব্যেন্দুর এই স্বপ্ন সফল হল। উল্লেখ করা যেতে পারে, ভারত থেকে আর মাত্র দু'জন এই নর্ম পেয়েছেন—প্রথমে বিশ্বনাথন আনন্দ এবং পরে প্রবীণ থিপ্‌সে।

দর্শক

ঘুসি মারার আরও কৌশল

শিবাজি গঙ্গোপাধ্যায়

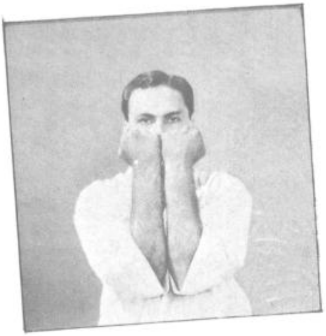

গত সংখ্যায় আমি কিওকুশিন ক্যারাটের পাঞ্চ বা ঘুসি মারার কৌশল নিয়ে আলোচনা করেছি। এই সংখ্যায় অন্য দু'রকম ঘুসি মারার কৌশল নিয়ে আলোচনা করব। এ ছাড়া আরও কয়েক রকমভাবে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ঘুসি মারা যায়।

প্রথম ঘুসি মারার যে কৌশলটি নিয়ে আলোচনা করছি, তার জাপানি নাম সিকেন আগো উচি। ঘুসি মারার দ্বিতীয় কৌশলটি হল উরাকেন সোমান উচি।

সিকেন আগো উচি 'সিকেন' কথার অর্থ মুঠো, 'আগো' কথার অর্থ থুতনি আর 'উচি' কথার অর্থ আঘাত। প্রথমে নিজের কাঁধের সমান চওড়া, দু'পা ফাঁক করে দাঁড়াও। আগে যেভাবে বলেছি, সেইভাবে হাত দুটো শরীরের দু'পাশে মুঠো শক্ত রেখে দাঁড়াতে হবে। তারপর গত সংখ্যায় যেভাবে ইওই দাচিতে দাঁড়াতে বলা হয়েছে সেইভাবে দাঁড়াতে হবে। তারপর ইওই দাচি থেকে হাতের এবং পায়ের অবস্থানের পরিবর্তন করে সানচিন দাচিতে দাঁড়াতে হবে। আগেই বলেছি যে, সাধারণত হাতের বিভিন্ন কৌশল কিওকুশিন ক্যারাটেতে সানচিন দাচি থেকে অভ্যাস করা হয়। সানচিন দাচিতে দাঁড়ানোর পর পায়ের অবস্থান ঠিকভাবে রেখে হাত দুটো কনুই থেকে মুড়ে মুখের দু'পাশে রাখতে হবে। হাতের মুঠো শক্ত রাখতে হবে এবং হাতের মুঠো দুটো পরস্পর পরস্পরের মুখোমুখি থাকবে। হাতের মুঠো দুটো নাকের সমান উচ্চতায় থাকবে। ঠিক ভাবে দাঁড়ানো হলে প্রথমে ডান হাত দিয়ে প্রথম ঘুসি মারতে হবে। হাত যেখানে রাখা হয়েছে সেখান থেকে একটু নামিয়ে সোজাসুজি নিজের থুতনির উচ্চতার মাপে সামনের দিকে হাত ছুঁড়তে হবে এবং সঙ্গে-সঙ্গে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাতটা আবার প্রথম অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে। ডান হাত হয়ে গেলে বাঁ হাত ছুঁড়তে হবে। এইভাবে প্রতি হাতে ২০ বার করে অনুশীলন করতে হবে ঘুসি মারার সময় শরীরের ওপর ভাগ সোজা থাকবে। মনে রাখতে হবে যেন হাতের মুঠোর প্রথম সন্ধিস্থলের (তর্জনী ও মধ্যমার) যে হাড় উঁচু হয়ে থাকবে সেই অংশ দিয়েই আঘাত করতে হবে।

উরাকেন সোমান উচি 'উরাকেন' কথা অর্থ হল মুঠোর পেছনের অংশ,' সোমান উচি' কথার অর্থ সামনের মধ্যভাগে আঘাত। দু'হাতের মুঠো শক্ত রেখে হাত দুটো কনুই থেকে মুড়ে মুখের সামনের দিকে পাশাপাশি স্পর্শ করে রাখতে হবে। হাতের মুঠো দুটো নাক স্পর্শ করবে না, নাক থেকে তিন ইঞ্চির মতো ফাঁক থাকবে। এবার সেই সানচিন দাচি থেকেই প্রথম ডান হাত সামনের দিকে ছুঁড়তে হবে। হাতের মুঠোর পিছনের অংশ (তর্জনী ও মধ্যমার প্রথম সন্ধিস্থলের পেছনের অংশ) দিয়ে সামনের দিকে প্রতিপক্ষকে আঘাত করা যাবে। ডান হাত ছুঁড়ে সামনের দিকে মারার পর সঙ্গে-সঙ্গে হাতকে আবার প্রথম অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে। এবার বাঁ হাত একইভাবে ছুঁড়তে হবে। এইভাবে প্রতি হাতে ২০ বার অনুশীলন করতে হবে। সামনে ছোঁড়ার সময় হাত সম্পূর্ণ সোজা করা উচিত নয়। কনুই থেকে মোড়া থাকবে এবং যেখানে আঘাত করতে হবে ঠিক তার আগে হাতের কবজি থেকে বাইরের দিকে মুড়ে আঘাত করে আবার প্রথম অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে। প্রথমে আস্তে-আস্তে অনুশীলন করতে হবে, তারপর কিছুদিন অভ্যেস হয়ে গেলে দ্রুত করা যাবে। প্রথম থেকে তাড়াতাড়ি অভ্যেস করতে গেলে হাতের পেশীতে টান পড়তে পারে।

ফোটো উৎপল সরকার

উইল্‌হেম কন্‌রাড রন্টজেন

চঞ্চল পাল

বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীদের মধ্যে উইল্‌হেম কন্‌রাড রন্টজেন-এর (১৮৪৫—১৯২৩) নাম অবশ্যই করতে হবে। কারণ, তিনি আধুনিক যুগের অতিপ্রয়োজনীয় রঞ্জনরশ্মির আবিষ্কারক। কিন্তু এই আবিষ্কারের জন্য তাঁকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে গবেষণা করতে হয়নি। এমনকী, স্কুল-কলেজের পরীক্ষাতেও তিনি কখনও অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি। অনেক বিশিষ্ট বিজ্ঞানীই এর আগে রঞ্জনরশ্মির প্রচ্ছন্ন রূপ লক্ষ করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের কেউই এ-ব্যাপারে গুরুত্ব দেননি। রন্ট্‌জেনই প্রথম বুঝতে পারেন যে, এই রশ্মির ভেতর আগামী যুগের বিরাট সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে।

হল্যান্ডের ছোট্ট শহর রাইনল্যান্ড-এ তাঁর জন্ম। বাবা ছিলেন বস্ত্র-ব্যবসায়ী। লেখাপড়ার চর্চা তাঁর পরিবারে ছিলই না। বাবা চেয়েছিলেন, তাঁর ছেলে ব্যবসায়ে দক্ষ হয়ে উঠুক। তাই ধনীদের জমকালো শহর অ্যাপেলডুর্ন-এ তিনি কাপড়ের দোকান খুললেন, আর ছোট্ট রন্ট্‌জেনকেও নিয়ে গেলেন তাঁর সঙ্গে। কিন্তু রন্ট্‌জেনের একদম ভাল লাগত না বেচাকেনার কাজ। অথচ স্কুলে গিয়ে যে মন দিয়ে লেখাপড়া করবেন তাও তাঁর ধাতে সইল না। একটি সামান্য অজুহাতে স্কুল থেকে তাঁকে বার করে দেওয়া হল। সামান্য হাসির ব্যাপার হলেই তিনি হোহো করে হাসতেন। তাঁর স্কুলের বন্ধুরাও তাই তাঁকে হাসিয়ে খুব মজা পেত। একদিন ক্লাসের ভেতরে একজন শিক্ষক পড়াচ্ছিলেন, আর রন্ট্‌জেনের এক বন্ধু ক্লাসের বেঞ্চিতে বসেই সেই শিক্ষকের হাব-ভাব নকল করে দেখাচ্ছিল। তাই দেখে রন্টজেন আর হাসি চাপতে পারেননি। ফলে ধরা পড়ে গেলেন শিক্ষকের কাছে। বিতাড়িত হলেন বন্টজেন।

এই ঘটনায় রন্ট্‌জেন খুবই আহত হলেন। কিন্তু এর ফলে তাঁর রোখ চেপে গেল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন, শুধু স্কুলেরই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রিও জয় করে নিতে হবে। তাই স্কুলের পড়া শেষ করে তিনি বাবার ব্যবসায় হাত পাকাতে চাইলেন না। তার বদলে ভর্তি হলেন জুরিখ শহরের

পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট-এ। যদিও লেখাপড়ায় তিনি অবহেলা করেননি কোনওদিন, তবু অন্য একটি ব্যাপারে তাঁর সময় কাটাতে খুব ভাল লাগত। সেটি হচ্ছে, তাঁর পাহাড়ে চড়ার নেশা। পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের চারপাশে ছিল উঁচু উঁচু পাহাড়। নতুন নতুন পথ খুঁজে সেইসব পাহাড়ের চুড়োয় উঠতে তাঁর সবচেয়ে ভাল লাগত। এই পাহাড়ঘেরা মনোরম পরিবেশে ছিল একটি সরাইখানা। এটির নাম ছিল 'জুম গ্রুনেন গ্লাস'—যার অর্থ সবুজ কাচ, এর মালিক ছিলেন এক জার্মান-বিপ্লবী, যাঁর দখল ছিল নানা বিষয়ে। সুযোগ পেলেই রন্টজেন চলে আসতেন তাঁর কাছে গল্প শোনার জন্য। শুধু গল্পই নয়, লাতিন ভাষা আর তলোয়ার খেলাও রন্টজেন শিখেছিলেন তাঁর কাছে।

এসব সত্ত্বেও লেখাপড়া ছেড়ে দেবার কথা তাঁর মনে হয়নি, পরীক্ষাতেও অকৃতকার্য হননি কখনও। যেদিন তিনি ডক্টরেট ডিগ্রি পেলেন, সেদিন তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ২৪ বছর। এর পর শুরু হল পদার্থবিজ্ঞানে তাঁর গবেষণা। পেশা হিসেবে বেছে নিলেন অধ্যাপনা।

অথচ একটি মাত্র বিষয় নিয়ে দীর্ঘকাল গবেষণা চালানো তাঁর ধাতে সইত না। ফলে বিজ্ঞানের বহু বিষয়েই তিনি প্রখর পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। তাই তিনি সহজেই জার্মানির ভুর্জবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে 'প্রোফেসর' পদটি পেয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু বিশেষ কোনও বিষয়ে স্মরণীয় অবদান রাখার মতো গবেষণা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

এভাবে ২৬ বছর কেটে গেল সাদামাটা গবেষণা ও শিক্ষকতা করে। তারপর ১৮৯৫ সালে তিনি শুরু করলেন 'ক্যাথোড রে ডিসচার্জ টিউব' নিয়ে গবেষণা। তখন তিনি পঞ্চাশে পা দিয়েছেন। একদিন তিনি টিউবটিকে কার্ডবোর্ড দিয়ে মুড়ে পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন। এই অবস্থায় কোনও আলোকরশ্মি টিউব থেকে বেরিয়ে আসার কথা নয়। পাশেই পড়ে ছিল একটি কাগজের টুকরো। কাগজে লাগানো ছিল 'বেরিয়াম প্লাটিনো-সায়ানাইড' নামে একটি রাসায়নিক পদার্থ। টিউবটিকে কার্ডবোর্ড দিয়ে মুড়ে দেবার পর হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল, কাগজটি অন্ধকারেও জ্বলজ্বল করছে। এরকম ঘটনা আগেও অনেকে লক্ষ করেছেন, এমনকী ক্যাথোড রশ্মি বিশেষজ্ঞ জে জে থমসনও এ-সম্বন্ধে নিবন্ধ লিখেছেন। কিন্তু এঁদের কেউই একে আশ্চর্য ঘটনা বলা ছাড়া বিশেষ আমল দেননি।

রন্টজেনও হয়তো তাই করতেন, যদি না তাঁর হাত সেই রশ্মির ওপর গিয়ে পড়ত। কাচ ও কার্ডবোর্ড ভেদ করে সেই রশ্মি বাইরে বেরিয়ে আসছে দেখে তিনি বুঝলেন, সেই রশ্মি অস্বচ্ছ পদার্থের ভেতর দিয়েও চলাচল করতে পারে। টিউবের পাশেই রাখা ছিল সিসার একটি চাকতি। সেটা হাতে নিয়ে তিনি রশ্মির ওপর ধরলেন। তখনই অবাক হয়ে লক্ষ করলেন, সিসার চাকতিটি ধরে আছে যেন কোনও কঙ্কালের হাত। অর্থাৎ তাঁর আঙুলের ভেতরকার হাড়গুলো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল, কিন্তু হাতের চামড়াটা প্রায় দেখাই যাচ্ছিল না। এর ফলে বোঝা গেল, এই রশ্মি চামড়া ও স্নায়ু ভেদ করে চলে যেতে পারে, কিন্তু হাড় ভেদ করতে পারে না।

সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর মাথায় খেলে গেল এক

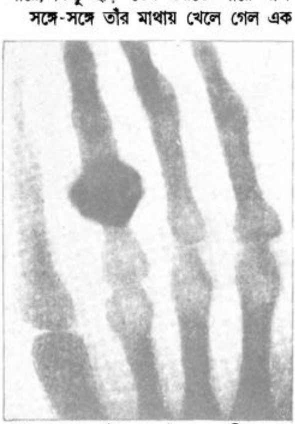

প্রথম এক্স-রে ফোটোগ্রাফ। রন্টজেন-এর স্ত্রীর ডান হাতের চারটি আঙুল

বিপুল সম্ভাবনার কথা। প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে হাতের কাছে যা পেলেন, তাই রশ্মির ওপর রেখে দেখতে লাগলেন। তা ছাড়া এই রশ্মির গুণাগুণ যাচাই করার জন্য যত রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা সম্ভব তা তখনই করে দেখার জন্য ছটফট করতে লাগলেন। দেড় মাস তিনি পরীক্ষাগার থেকে বেরোলেন না। সেখানেই খেতেন, সেখানেই ঘুমোতেন।

এর আগে রন্টজেন অন্য কোনও গবেষণায় এত প্রাণপাত পরিশ্রম করেননি। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে মাত্র দেড় মাসের মধ্যে সেই রশ্মির অনেক গুণই আবিষ্কার করে ফেললেন। বাতাসের মধ্য দিয়ে এই রশ্মি ছ' ফুট দূরত্বে পৌঁছতে পারে। কিন্তু সিসার মধ্য দিয়ে যেতে পারে মাত্র এক মিলিমিটার। তা ছাড়া এটি একটি তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ। কারণ, একে চুম্বকের ভেতর দিয়ে চালনা করলে এর গতিপথের হেরফের হয় না। এই ধরনের কোনও রশ্মির কথা আগে জানা যায়নি। তাই রন্টজেন এর নাম দিলেন 'এক্স-রে', কারণ গণিতশাস্ত্রে অজানা সংখ্যাকে চিহ্নিত করা হয় ইংরেজি অক্ষর 'এক্স' দিয়ে।

আবিষ্কারটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে-সঙ্গে সারা পৃথিবীতে এমন আলোড়ন সৃষ্টি হল যে, রন্টজেনের নাম লোকের মুখে মুখে ফিরতে লাগল। তাই অনেকেই এই রশ্মিকে বলতে লাগলেন 'রন্টজেন-রশ্মি'। এই রন্টজেন-রশ্মিই বাংলায় সম্ভবত রঞ্জন রশ্মি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এক্স-রে আবিষ্কারের দু' মাসের মধ্যেই শুরু হয়ে যায় তার প্রয়োগ। নিউ হ্যাম্পশায়ার হাসপাতালে হাড়-ভাঙার পরীক্ষা শুরু হয় এক্স-রে দিয়ে। এই রশ্মি আবিষ্কারের সূত্র ধরেই হেনরি বেক্‌রেল গবেষণা শুরু করেন ফসফোরেসেন্স ও তেজস্ক্রিয়তা নিয়ে। আর এক বছরের মধ্যেই পৃথিবীর বেশিরভাগ নাম-করা হাসপাতালেই এক্স-রে ছবি তোলা আবশ্যিক হয়ে ওঠে। এ-প্রসঙ্গে অনেকেরই মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, প্রথম এক্স-রে ছবি কোনটি? সেটি হচ্ছে রন্টজেনের স্ত্রী বার্থা'র ডান হাতের চারটি আঙুলের ছবি, যা এখানে মুদ্রিত হল। ছবিটি তোলার সময়ে বার্থার হাতে যে আংটি পরা ছিল, সেটির ছায়াও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।

যুগান্তকারী আবিষ্করের সম্মান পেয়েছেন রন্টজেন, কিন্তু নিজেকে তার যোগ্য ভাবতে বোধ হয় দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। কারণ, তিনি জানতেন এই আবিষ্কারের অনেকটাই আকস্মিক অথবা ভাগ্যের দয়া। জীবনে বহুবার বহু জায়গায় তাঁকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল এক্স-রে নিয়ে বক্তৃতা দেবার জন্য। কিন্তু তিনি যেতে রাজি হননি। এমনকী, তাঁকে পুরস্কার ও খেতাব দেওয়ার জন্য যেসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হত, সেখানেও তিনি কখনও যাননি। অভিনন্দনের চাপে ক্লান্ত রন্টজেন কয়েক বছর বাদে তাঁর আবিষ্কারের পীঠস্থান ভুর্জবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়েই চলে আসেন মিউনিখে।

অবশ্য, আরও একটি কারণ ছিল এর পিছনে। এই বৃদ্ধ বয়সে আবার সেই প্রথম যৌবনের নেশা তাঁকে পেয়ে বসে ছিল। মিউনিখের মনোরম সুউচ্চ পাহাড়গুলি তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকত। জীবনের বাকি ক'টি বছর তিনি আর বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণার কথা মনেই আনেননি। তার বদলে সারা দিন একা একা ঘুরে বেড়াতেন এ-পাহাড় থেকে ও-পাহাড়ে। কিসের সন্ধানে তা আজও জানা যায়নি।

মেডিকেল পড়তে হলে

অমর দাশ

> আমাদের এই দেশে আর্তের সেবার জন্য দরকার অনেক চিকিৎসকের। তা ছাড়া সামাজিক সম্মান, জনসেবা এবং সুন্দর জীবিকা হিসেবে এই বৃত্তিকে এখন বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রী বেছে নিচ্ছেন। আমাদের দেশের বিভিন্ন রাজ্যে মেডিকেল পড়ার নিয়মকানুন সম্পর্কে অনেকেরই স্বচ্ছ ধারণা নেই। একথা ভেবেই মেডিকেল পড়ার বিভিন্ন সুযোগসুবিধের কথা জানানো হয়েছে এবারে।

ছাত্রছাত্রীরা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করার পর এম· বি· বি· এস· কোর্সে ভর্তি হতে চায়। তবে এই কোর্সে ভর্তি হওয়ার জন্য জয়েন্ট এনট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করতে হয়। পশ্চিমবঙ্গে মেডিকেল কলেজ রয়েছে মোট ৭টি। (১) বর্ধমান মেডিকেল কলেজ (৫০টি আসন), (২) বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ (৫০টি আসন), (৩) কলকাতা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ (১৫০টি আসন), (৪) মেডিকেল কলেজ (১৫৫টি আসন), (৫) নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ (১৫০টি আসন), (৬) উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল কলেজ (৫০টি আসন), (৭) আর জি কর মেডিকেল কলেজ (১৫০টি আসন)। এই আসনের মধ্যে আবার তফসিলি জাতি ও উপজাতির প্রার্থীদের জন্য আসন সংরক্ষিত আছে। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় (১০+২ পর্যায়ে) ইংরেজি, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজিসহ পাশ করলে জয়েন্ট এনট্রান্স পরীক্ষায় বসা যায়। প্রার্থীকে কমপক্ষে পশ্চিমবঙ্গে একটানা দশ বছর স্থায়ীভাবে বসবাস করে থাকতে হবে এবং তার বয়স হবে ভর্তির বছরের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে কমপক্ষে ১৭ বছর। ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে ফর্ম দেওয়া হয়। পরীক্ষা হয় এপ্রিল মাসে। জয়েন্ট এনট্রান্স পরীক্ষার ফলাফলের মেরিট-লিস্ট অনুসারে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়।

এম· বি· বি· এস· কোর্সে ভর্তির জন্য অল ইন্ডিয়া এনট্রান্স এগজামিনেশন অর্থাৎ সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাক। নতুন দিল্লির সেন্ট্রাল বোর্ড অব সেকেন্ডারি এডুকেশন, এম· বি· বি· এস· কোর্সে ভর্তির মোট আসনের শতকরা ১৫ ভাগ আসনের জন্য সর্বভারতীয় স্তরে পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। তবে অন্ধ্রপ্রদেশ এবং জম্মু ও কাশ্মিরের মেডিকেল কলেজগুলোর আসন এই পরীক্ষার আওতায় পড়ে না।

এই পরীক্ষা-সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় জানুয়ারি মাসের দিকে। দশ টাকার ব্যাঙ্ক ড্রাফটের বিনিময়ে (সি· বি· এস· ই·-কে প্রদেয়) কনট্রোলার অব এগজামিনেশনস, সেন্ট্রাল বোর্ড অব সেকেন্ডারি এডুকেশন, এমবিয়া হাউস, ২২/২৩বি আনসারি রোড, দরিয়াগঞ্জ, নতুন দিল্লি-১১০০০২ অফিস থেকে আবেদনের ফর্ম পাওয়া যেতে পারে। তবে ডাকযোগে নিতে হলে নিজের নাম-ঠিকানা লেখা তিন টাকার ডাকটিকিট লাগানো ২৬×২০ সেমি মাপের একটি খাম অনুরোধপত্রের সঙ্গে পাঠাতে হবে। এ ছাড়া নগদ দশ টাকার বিনিময়ে (ক) রিজিওনাল অফিসার, সি· বি· এস· ই, ২৬ সাউথ মাদা স্ট্রিট, শ্রীনগর কলোনি, সইদাপেট, মাদ্রাজ-৬০০০১৫ অথবা (খ) রিজিওনাল অফিসার, সি· বি· এস· ই, আর জি বরুয়া রোড, বাই লেন নং ১ (ডিজনিল্যান্ড স্কুলের কাছে) গুয়াহাটি-৭৮১০০৩ ঠিকানা থেকেও আবেদনপত্র পাওয়া যেতে পারে।

দু' ঘণ্টার পরীক্ষা নেওয়া হয় ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি এবং বটানি ও জুলজির ওপর। সারা ভারতের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোতে অর্থাৎ আগরতলা, আমেদাবাদ, আইজল, বাঙ্গালোর, ভোপাল, ভুবনেশ্বর, বোম্বাই, কলকাতা, চণ্ডীগড়, দাদরা ও নগরহাভেলি, দিল্লি, গ্যাংটক, গোয়া, গুয়াহাটি, ইমফল, ইটানগর, জব্বলপুর, জয়পুর, কানপুর, কার্নালি, কোহিমা, লখনউ, মাদ্রাজ, নাগপুর, পোর্টব্লেয়ার, পাটনা, পণ্ডিচেরি, সিমলা, শিলং, ত্রিবান্দ্রম, উদয়পুর প্রভৃতি শহরে পরীক্ষাকেন্দ্র রয়েছে।

রাজ্যভিত্তিক মেডিকেল কলেজ

অন্ধ্রপ্রদেশে মেডিকেল কলেজ রয়েছে ৯টি। মোট আসন ৯২০টি। তবে এসব কলেজে ভর্তির একটি অন্যতম শর্ত হচ্ছে অন্ধ্রের যে-কোনও শিক্ষায়তনে অন্ততপক্ষে একটানা সাত বছর পড়াশুনো করে থাকতে হবে। ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা আমাদের রাজ্যের মতোই। তবে কিছু আসন রয়েছে বি·এসসি এবং এম·এসসি পাশ ছাত্রছাত্রীর জন্য। এ ছাড়া ভারত সরকারের প্রেরিত প্রার্থীদের জন্য রয়েছে ১২টি আসন। অসমের ৩টি মেডিকেল কলেজে মোট আসন আছে ৩৩০টি। এখানেও ভারত সরকারের মনোনীত প্রার্থীদের জন্য আসন রয়েছে। সাধারণ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২০ বছরের স্থায়ী বাসিন্দা না হলে ভর্তির আবেদন করা যাবে না।

বিহারে ন'টি মেডিকেল কলেজ রয়েছে। ভাগলপুর মেডিকেল কলেজ, শ্রীকৃষ্ণ মেডিকেল কলেজ, এ· এন মগধ মেডিকেল কলেজ, নালন্দা মেডিকেল কলেজ, দ্বারভাঙা মেডিকেল কলেজ, পাটনা মেডিকেল কলেজ, এম· জি· এম মেডিকেল কলেজ, পাটলিপুত্র মেডিকেল কলেজ, রাজেন্দ্র মেডিকেল কলেজ। মোট আসন ৬৯০টি। ভর্তির ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা—ইংরেজি, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজিসহ ইন্টার-সায়েন্স-এ পাশ করে থাকতে হবে। প্রার্থীর বয়স হতে হবে কমপক্ষে ১৭ বছর। প্রার্থীকে বিহারের কোনও শিক্ষায়তনে একটানা দশবছর পড়াশুনো করে থাকতে হবে। তবে ভারত সরকারের মনোনীত প্রার্থী, টিসকো, এস· এস· এল· এন· ট্রাস্ট এবং কোলমাইনস ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের মনোনীত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম শিথিলযোগ্য।

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় দিল্লির তিনটি মেডিকেল কলেজে এম· বি· বি· এস· কোর্সে ভর্তির জন্য এনট্রান্স পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। এই তিনটি মেডিকেল কলেজ হল—নতুন দিল্লির লেডি হার্ডিঞ্জ মেডিকেল কলেজ (১৩০টি আসন), মৌলানা আজাদ মেডিকেল কলেজ (১৮০টি আসন), এবং ইউনিভার্সিটি কলেজ অব মেডিকেল সায়েন্স (১০০টি আসন)। ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা একই।

সাধারণত এপ্রিল মাসে আবেদনের ফর্ম দেওয়া হয়। দু' টাকার পোস্টাল অর্ডারের বিনিময়ে (রেজিস্ট্রার, ইউনিভার্সিটি অব দিল্লি অনুকূলে প্রদেয়) দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সায়েন্স ফ্যাকাল্টি থেকে অথবা উল্লিখিত বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের অফিস থেকে আবেদনপত্র পাওয়া যায়। তিরিশ টাকার পোস্টাল অর্ডারসহ পূরণ করা আবেদনপত্র জমা দিতে হয় ফ্যাকাল্টি অব মেডিকেল সায়েন্সের ডেপুটি রেজিস্ট্রারের অফিসে।

আর-একটি বিশিষ্ট মেডিকেল কলেজ, নতুন দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্স। এই কলেজ স্বাধীনভাবে নিজের মতো করে ভর্তির পরীক্ষা গ্রহণ করেন। মেধার ভিত্তিতে ছাত্র ভর্তি করা হয়। ভর্তির পরীক্ষা নেওয়া হয় ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি এবং সাধারণ জ্ঞানের ওপর। এখানে ভর্তি হতে হলে প্রার্থীকে কমপক্ষে শতকরা ৬০ নম্বরসহ সিনিয়ার স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা অথবা সমতুল অন্যান্য অনুমোদিত পরীক্ষায় (যেমন আমাদের রাজ্যের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা) পাশ করতে হবে। তফসিলি জাতি ও উপজাতি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এই নম্বরের হার শতকরা ৫০। বিষয় হিসেবে অবশ্যই ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি এবং ইংরেজি নিয়ে পাশ করা চাই। প্রার্থীর বয়স হওয়া চাই কমপক্ষে ১৭ বছর।

সাধারণত জানুয়ারি মাসে কিংবা ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিকে আবেদন পত্র দেওয়া হয়। ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যেই পূরণ করা ফর্ম জমা দিতে হয়। প্রবেশিকা অর্থাৎ এনট্রান্স পরীক্ষা নেওয়া হয় জুন মাসে। ফলাফল প্রকাশিত হয় জুলাই মাসে। পরীক্ষার ফি তিরিশ টাকা। পোস্টাল অর্ডার সমেত আবেদনপত্র জমা দিতে হয়। পাঁচ টাকার পোস্টাল অর্ডারের বিনিময়ে (ডিরেক্টর, অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্স, নতুন দিল্লির অনুকূলে) এ· আই· আই· এম· এস·-এর রেজিস্ট্রারের অফিস থেকে ফর্ম পাওয়া যায়। অবশ্য অনুরোধপত্রের সঙ্গে ১০×৬ ইঞ্চি মাপের নাম–ঠিকানা লেখা এক টাকা নব্বই পয়সার ডাকটিকিট লাগানো একটি খাম থাকা চাই।

গুজরাতের পাঁচটি মেডিকেল কলেজে মোট আসন রয়েছে ৭০০টি। বরোদার গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ, আমেদাবাদের বি· জে· মেডিকেল কলেজ, জামনগরের গভর্নমেন্ট শাহ এম· পি· মেডিকেল কলেজ এবং সুরাটের গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ—চারটিতে ৬০০টি আসনের মধ্যে ভারত সরকার মনোনীত প্রার্থীদের জন্য ১০টি, প্রাক্তন সামরিক কর্মীর সন্তানদের জন্য ৫টি এবং ডোনারদের প্রতিনিধিদের জন্য ১২টি আসন রয়েছে। তা ছাড়া সাধারণভাবে এই রাজ্যে বসবাসকারী না হলে ভর্তির জন্য আবেদন করা যাবে না।

জম্মু ও কাশ্মিরের দুটি মেডিকেল কলেজে মোট আসন আছে ১৩৬টি। শতকরা ৫০টি আসন সংরক্ষিত রয়েছে বিভিন্ন ক্যাটিগরির জন্য। বাকি আসনে পরীক্ষার নম্বর + মৌখিক এবং লিখিত পরীক্ষার ভিত্তিতে প্রার্থী ভর্তি করা হয়। প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা চাই সি· বি· এস· ই-র ১০+২ অথবা সমতুল পরীক্ষায় পাশ। ইংরেজি এবং বিজ্ঞান বিষয়ে একসঙ্গে শতকরা ৫০ নম্বর থাকা চাই। জুন মাসে আবেদনপত্র দেওয়া হয়। গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ, জম্মু-১৮০০১০ অথবা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ, শ্রীনগর-১৯০০১০, কলেজের অধ্যক্ষের অফিস থেকে পনেরো টাকার পোস্টাল অর্ডারের বিনিময়ে আবেদনপত্র পাওয়া যেতে পারে। পূরণ-করা আবেদনপত্র সংশ্লিষ্ট কলেজের অধ্যক্ষের অফিসে নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে (সাধারণত জুলাই মাসে) পঞ্চাশ টাকার ব্যাঙ্ক ড্রাফটসহ জমা দিতে হয়।

কর্ণাটকে চারটি সরকারি মেডিকেল কলেজে মোট আসন আছে ৪৮৩টি। এসব কলেজে ভারত সরকারের মনোনীত প্রতিরক্ষাবাহিনীর কর্মীদের সন্তানদের জন্য, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জন্য আসন সংরক্ষিত আছে। সাধারণ আসনে ভর্তি হতে হলে কর্নাটকের কোনও শিক্ষায়তনে একাদিক্রমে পাঁচ বছর পড়াশুনো করা দরকার। তবে কর্ণাটকে আরও কয়েকটি কলেজ রয়েছে, যেখানে অন্যান্য রাজ্যের প্রার্থীরাও ভর্তি হতে পারেন।

(১) ডঃ বি· আর· আম্বেদকর মেডিকেল কলেজ, ১/৩৬ ক্লাইন রোড কুকস টাউন, বাঙ্গালোর-৫৬০০০৫, মোট আসন ১৩০টি। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজিসহ শতকরা ৫০ ভাগ নম্বর নিয়ে দু' বছরের প্রি-ইউনিভার্সিটি কোর্স পাশ করে থাকলে (আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে উচ্চ মাধ্যমিক) অথবা দ্বিতীয় বিভাগে এইসব বিষয়সহ বি·এসসি পাশ করে থাকলে ভর্তির জন্য আবেদন করা যেতে পারে। এপ্রিল মাস নাগাদ আবেদনপত্র পাওয়া যায়। ভর্তির জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষা নেওয়া হয় মে মাসে। কলেজের অধ্যক্ষের অফিস থেকে বাষট্টি টাকার ব্যাঙ্ক ড্রাফট অথবা পোস্টাল অর্ডারের বিনিময়ে আবেদনপত্র পাওয়া যায়।

(২) কাম্পগৌড়া ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্স, আর কে রোড, বিশ্বেশ্বরপুরম, বাঙ্গালোর-৫৬০০০৪। মোট আসন ১৫০টি। ইন্টারভিউয়ের ভিত্তিতে সিলেকশন কমিটি প্রার্থী মনোনীত করেন। বয়স এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা একই ধরনের। মে-জুন মাসে ভর্তির আবেদনপত্র দেওয়া হয়। নাম-ঠিকানা লেখা ৬×১২ ইঞ্চি মাপের একটি খাম এবং পঞ্চান্ন টাকার ব্যাঙ্ক ড্রাফট পাঠালে অধ্যক্ষের অফিস থেকে আবেদনপত্র পাওয়া যায়।

(৩) এম· এস· রামাইয়া মেডিকেল কলেজ, গোকুলা এক্সটেনশন, বাঙ্গালোর-৫৬০০৫৪। মোট আসন-১৮০টি। ম্যানেজমেন্ট কোটায় ১০০টি, সরকার মনোনীত প্রার্থীদের জন্য ৪০টি আসন সংরক্ষিত আছে। ভর্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা আগের মতো। একশো দশ টাকার মানি অর্ডার পাঠালে অধ্যক্ষের অফিস থেকে আবেদনপত্র পাওয়া যায়।

(৪) সেন্ট জোনস মেডিকেল কলেজ, জোন নগর, বাঙ্গালোর-৫৬০০৩৪। মোট আসন ৬০টি। প্রবেশিকা পরীক্ষার নম্বর, ইন্টারভিউর ভিত্তিতে ভর্তি করা হয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং বয়স একই। আবেদনপত্র দেওয়া হয় মার্চ মাসে, এপ্রিল মাসের মধ্যে জমা দিতে হয়। প্রবেশিকা পরীক্ষা নেওয়া হয় মে মাসে। ফলাফল প্রকাশ করা হয় জুলাই-অগস্ট মাসে। পঞ্চাশ টাকার ব্যাঙ্ক ড্রাফট পাঠালে কলেজের অধ্যক্ষের অফিস থেকে আবেদনপত্র পাওয়া যায়।

(৫) কস্তুরবা মেডিকেল কলেজ, মণিপাল-৫৭৬১১৯। মোট আসন ২৯০টি।

এখানে ভর্তি হতে ইচ্ছুক প্রার্থীকে শতকরা ৭৫ ভাগ নম্বরসহ ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি নিয়ে একবারে উচ্চ মাধ্যমিক অথবা ইন্টার-সায়েন্স বা প্রি-ইউনিভার্সিটি পরীক্ষায় পাশ করে থাকতে হবে। মে-জুন মাসে আবেদনপত্র দেওয়া হয়। পঁচিশ টাকার ব্যাঙ্ক ড্রাফটের বিনিময়ে ডিরেক্টর অব অ্যাডমিশন, ডঃ টি· এম· এ· পাই ফাউন্ডেশন, অকাদেমি হাউস, পোস্ট বক্স নং-২, মণিপাল, কর্ণাটক অফিস থেকে ফর্ম পাওয়া যায়।

(৬) জে· এস· এস· মেডিকেল কলেজ, মহীশূর-৫৭০০১৫। মোট আসন ১৭০টি। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজিসহ শতকরা ৫০ নম্বর নিয়ে পাশ করতে হবে। কেমিস্ট্রি, বটানি ও জুলজিতে শতকরা ৫০ নম্বরসহ বি·এসসি পাশ করলে আবেদন করা যায়। পঞ্চান্ন টাকার ব্যাঙ্ক ড্রাফট পাঠালে কলেজ থেকে ফর্ম পাওয়া যায়।

(৭) বি· এল· ডি· ই· এ'স মেডিকেল কলেজ, সোলাপুর রোড, বিজাপুর-৫৮৬১০৩। মোট আসন ১৩০টি।

ভর্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা একই ধরনের। জুলাই মাসে আবেদনপত্র দেওয়া হয়। পাঁচ টাকার পোস্টাল অর্ডার কিংবা ব্যাঙ্ক ড্রাফটের বিনিময়ে আবেদনপত্র পাওয়া যায়।

কেরলে পাঁচটি মেডিকেল কলেজে মোট আসন আছে ৭০০টি। কমিশনার ফর এনট্রান্স এগজামিনেশন, ত্রিবান্দ্রম এনট্রান্স পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন কলেজে ছাত্র ভর্তি করেন। ভারত সরকারের মনোনীত প্রার্থীদের জন্য ২৪টি, হোমিওপ্যাথি এবং আয়ুর্বেদ পাশ প্রার্থীদের জন্য ২টি, অসাধারণ ভাল খেলোয়াড়দের জন্য ৫টি, নার্সদের জন্য ১টি, যুদ্ধে মৃত সৈনিকদের সন্তানদের জন্য ৪টি, প্রাক্তন সামরিক কর্মীদের জন্য ৪টি, দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য ১টি, তফসিলি জাতির জন্য ৫২টি, তফসিলি উপজাতির জন্য ১৩টি আসন সংরক্ষিত আছে। প্রার্থীর বয়স হওয়া চাই ১৭ বছর। প্রার্থীকে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজিসহ কমপক্ষে শতকরা ৫০ নম্বর (তফসিলি জাতি ও উপজাতির ক্ষেত্রে ৪০ নম্বর) পেয়ে প্রি-ডিগ্রি পরীক্ষা পাশ করতে হবে। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, জুলজি, বটানি বা বায়ো-কেমিস্ট্রি নিয়ে যারা এগ্রিগেটে শতকরা ৫০ নম্বর পেয়ে বি· এসসি পাশ করেছেন ও আবেদন করতে পারবেন। ইউনিসেফ অথবা ইউ· এন· ও-র বিভিন্ন এজেন্সির কর্মীর সন্তানসন্ততিদের জন্যও বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে আসন সংরক্ষিত আছে।

সাধারণত জুন মাসে ভর্তির আবেদনপত্র পাওয়া যায়। আশি টাকার মানি অর্ডার পাঠালে কমিশনার ফর এনট্রান্স এগজামিনেশন, ত্রিবান্দ্রম-৬৯৫০৪১ ঠিকানা থেকে আবেদনপত্র পাওয়া যেতে পারে।

মহারাষ্ট্রের আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ, সোলাপুর রোড, পুনে-৪১১০৪০। এখানে মোট আসন আছে ১৩০টি। ছেলেদের জন্য ১০৫টি এবং মেয়েদের জন্য ২৫টি। যেসব ছাত্রছাত্রী উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজিসহ শতকরা ৬০ নম্বর পেয়ে পাশ করেছেন, ইংরেজি এবং বিজ্ঞানের প্রতিটি বিষয়ে শতকরা ৫০ নম্বর পেয়েছেন, তাঁরা ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারেন। তবে মাধ্যমিক পরীক্ষায় তাঁদের অবশ্যই ম্যাথমেটিকসে পাশ করতে হবে। প্রার্থীর বয়স হওয়া চাই ৩১ ডিসেম্বর তারিখে ১৭ থেকে ২২ বছরের মধ্যে। প্রার্থী বি· এসসি পাশ হলে, বয়স হওয়া চাই ২৪ বছরের কম।

সাধারণত জানুয়ারি মাসে ভর্তির আবেদনপত্র দেওয়া হয়। ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে আবেদনপত্র পূরণ করে জমা দিতে হয়। লিখিত প্রবেশিকা পরীক্ষা নেওয়া হয় মে-জুন মাসে। পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয় জুলাই মাসে। কমান্ড্যান্ট, এ· এফ· এম· সি, পুনের অনুকূলে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, পুনে শাখায় পঁচিশ টাকার ব্যাঙ্ক ড্রাফট পাঠালে অফিস ইনচার্জ, অ্যাডমিশন অব এ· এফ· এম· সি, পুনে-র কাছ থেকে আবেদনপত্র পাওয়া যাবে।

এখানেও এনট্রান্স পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে ভর্তি করা হয়। কলেজে যেসব ছাত্রছাত্রী ভর্তি হন, তাঁরা এম· বি· বি· এস পাশ করার পর আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল সার্ভিসে যোগদানে বাধ্য থাকেন।

এ ছাড়া মহারাষ্ট্রে কয়েকটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ আছে যেখানে সর্বভারতীয় প্রার্থীরা ভর্তি হতে পারেন।

(১) ডঃ পঞ্জাবসা ও দেশমুখ মেমোরিয়াল মেডিকেল কলেজ, শিবাজি নগর, অমরাবতী। মোট আসন ১০০টি। সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ২০টি এবং ম্যানেজমেন্ট কোটায় ৬টি আসন রয়েছে।

১০+২ পর্যায়ে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি এবং ইংরেজিসহ শতকরা ৫০ নম্বর (এগ্রিগেটে) পেয়ে পাশ করলে আবেদন করা যাবে। বয়স হওয়া চাই কমপক্ষে ১৭ বছর। মে মাস নাগাদ ভর্তির আবেদনপত্র দেওয়া হয়। জুন-জুলাই মাসের মধ্যে আবেদনপত্র জমা দিতে হয়। কলেজের অধ্যক্ষের ঠিকানায় পঁয়ষট্টি টাকার ব্যাঙ্ক ড্রাফট পাঠালে ভর্তির আবেদনপত্র পাওয়া যায়। ম্যানেজমেন্ট কোটায় যাঁরা ভর্তি হতে ইচ্ছুক, তাঁদের, অধ্যক্ষের কাছে ভর্তির আবেদন করা ছাড়াও সেক্রেটারি, শ্রী শিবাজি এডুকেশন সোসাইটি, অমরাবতী-৪৪৪৬০৩ এই ঠিকানায় আবেদন করতে হয়।

(২) মহাত্মা গান্ধী ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্সেস, পোঃ সেবাগ্রাম-৪৪২১০২, ওয়ার্ধা। মোট আসন ৬৩টি। দিল্লি এবং নাগপুরে এনট্রান্স টেস্ট নেওয়া হয়। এই পরীক্ষার ভিত্তিতেই ছাত্র ভর্তি করা হয়। শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং বয়স একই রকম। আবেদনপত্র দেওয়া হয় জানুয়ারি থেকে এপ্রিলের মধ্যে। পরীক্ষা হয় মে মাসে। ফলাফল প্রকাশিত হয় জুলাই মাসে। ডিনের ঠিকানায় চল্লিশ টাকার মানি অর্ডার পাঠালে ভর্তির জন্য আবেদনপত্র পাওয়া যাবে। এ ছাড়া আবেদনপত্র জমা দেওয়ার সময় এনট্রান্স পরীক্ষার ফি-বাবদ একশো টাকার পোস্টাল অর্ডার দিতে হয়।

(৩) কৃষ্ণ ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্স, জেলা-সাতারা, করাড়-৪১৫১১০। মোট আসন ১০০টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং বয়সের মাপকাঠি একই। কলেজের অধ্যক্ষের নামে একশো টাকার ডিমান্ড ড্রাফট বা পোস্টাল অর্ডার পাঠালে ভর্তির আবেদনপত্র পাওয়া যাবে।

ইমফলের রিজিওনাল মেডিকেল কলেজে মোট আসন আছে ৭৫টি। এই কলেজে অরুণাচলপ্রদেশ, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড এবং ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য আসন সংরক্ষিত আছে।

পণ্ডিচেরির জওহরলাল ইনস্টিটিউট অব পোস্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিকেল এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ। এখানে মোট আসন আছে ৬৫টি। এনট্রান্স পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ভর্তি করা হয়। পরীক্ষার বিষয়ের মধ্যে থাকে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি এবং ইংরেজি। ১০+২ পর্যায়ে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি নিয়ে পাশ

করলে বা সিনিয়ার স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা পাশ করলে এনট্রান্স পরীক্ষায় বসা যেতে পারে। অন্যান্য রাজ্যর প্রার্থীদের জন্য আসনের সংখ্যা ৩৫।

ভর্তির আবেদনপত্র দেওয়া হয় এপ্রিল মাসে, জমা দিতে হয় মে মাসের মধ্যে। এনট্রান্স পরীক্ষা নেওয়া হয় জুন মাসে। ফলাফল বেরোয় জুলাই মাসে। পাঁচ টাকার মানি অর্ডার পাঠালে ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টরের অফিস থেকে আবেদনপত্র পাওয়া যাবে।

লুধিয়ানার ক্রিশ্চিয়ান মেডিকেল কলেজে আসন আছে ৫০টি। লিখিত প্রবেশিকা পরীক্ষার ভিত্তিতে ছাত্র ভর্তি করা হয়। এই প্রবেশিকা পরীক্ষায় ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি এবং ইংরেজি বিষয়ের ওপর প্রশ্ন থাকে। প্রার্থীর ন্যূনতম বয়স হওয়া চাই ১৭ বছর। প্রার্থীকে প্রি-মেডিকেল অথবা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি এবং ইংরেজিসহ শতকরা ৫০ নম্বর নিয়ে পাশ করতে হবে। আবেদনপত্র দেওয়া হয় মে মাসে। পরীক্ষা হয় জুন-জুলাই মাসে। কুড়ি টাকার ব্যাঙ্ক ড্রাফট পাঠালে কলেজের রেজিস্ট্রারের কাছ থেকে আবেদনপত্র পাওয়া যায়। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার সময় আরও ষাট টাকার ব্যাঙ্ক ড্রাফট দিতে হয় প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসার জন্য।

লুধিয়ানায় আর-একটি বেসরকারি কলেজ রয়েছে—দয়ানন্দ মেডিকেল কলেজ, লুধিয়ানা-১৪১০০১। মোট আসন ৫০টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা একই রকম। ২০ টাকার মানি অর্ডার বা পোস্টাল অর্ডার পাঠালে অধ্যক্ষের অফিস থেকে আবেদনপত্র পাওয়া যায়।

তামিলনাড়ুর ন'টি সরকারি মেডিকেল কলেজে মোট আসন আছে ১১২০টি। এই আসনের মধ্যে ভারত সরকারের মনোনীত প্রার্থীদের জন্য, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জন্য, ভাল খেলোয়াড়দের জন্য আসন সংরক্ষিত আছে। তা ছাড়া অন্যান্য রাজ্যের প্রার্থীদের জন্য ৪৫টি আসন রয়েছে। এনট্রান্স পরীক্ষা এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ভর্তি করা হয়। এগ্রিগেটে শতকরা ৬০ নম্বরসহ প্রার্থীকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি নিয়ে পাশ করে থাকা চাই। তা ছাড়া প্রার্থীকে বিজ্ঞানের বিষয়গুলোতে পেতে হবে শতকরা ৭০ নম্বর। মে-জুন মাসে আবেদনপত্র দেওয়া হয়। পনেরো টাকার বিনিময়ে কলেজের অধ্যক্ষের অফিস থেকে আবেদনপত্র পাওয়া যায়। এর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কলেজের নাম হল (১) কোয়েম্বাটুর মেডিকেল কলেজ, কোয়েম্বাটুর-৬৪১০১৪, (২) মাদ্রাজ মেডিকেল কলেজ, পার্ক টাউন, মাদ্রাজ-৬০০০০৩, (৩) স্ট্যানলি মেডিকেল কলেজ, মাদ্রাজ-৬০০০০১, (৪) মাদুরাই মেডিকেল কলেজ, মাদুরাই-৬২৫০২০, (৫) তিরুনেলভেলি মেডিকেল কলেজ, তিরুনেলভেলি-৬২৭০১১, (৬) সালেম মেডিকেল কলেজ, সালেম, (৭) গভর্নমেন্ট কিলপৌক মেডিকেল কলেজ, মাদ্রাজ-৬০০০১০, (৮) তাঞ্জাভুর মেডিকেল কলেজ, তাঞ্জাভুর-৬১৩০০৪, (৯) চিংলাপেট মেডিকেল কলেজ, চিংলাপেট-৬০৩০০১।

বেসরকারি কলেজের মধ্যে ক্রিশ্চিয়ান মেডিকেল কলেজ, ভেলোর-৬৩২০০৪, বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মোট আসন ৬০টি। লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে প্রার্থী মনোনীত করা হয়। লিখিত পরীক্ষার বিষয়সূচির মধ্যে আছে বায়োলজি, কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, জেনারেল এবিলিটি। প্রার্থীকে ১০+২ পর্যায়ে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজিসহ পাশ করতে হবে। কমপক্ষে বয়স হওয়া চাই ১৭ বছর। আবেদনপত্র দেওয়া হয় ফেব্রুয়ারি মাসে। এপ্রিল মাসের মধ্যে আবেদনপত্র জমা দিতে হয়, পরীক্ষা নেওয়া হয় মে মাসে। ২০ টাকার ক্রসড ডিমান্ড ড্রাফট পাঠালে রেজিস্ট্রারের অফিস থেকে আবেদনপত্র পাওয়া যায়। রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ আরও আশি টাকার ব্যাঙ্ক ড্রাফট দিতে হয় আবেদনপত্র জমা দেওয়ার সময়।

এ ছাড়া আরও দুটি কলেজ রয়েছে যেখানে সর্বভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি হওয়ার সুযোগ আছে। (ক) রাজা মুথিয়া ইনস্টিটিউট অব হেলথ সায়েন্সেস, আন্নামালাই নগর-৬০৮০০২। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি নিয়ে শতকরা ৭০ নম্বর পেয়ে পাশ করলে আবেদন করা যায়, তবে আলাদাভাবে প্রতিটি বিষয়ে শতকরা ৬০ নম্বর পেয়ে পাশ করা দরকার। মে-জুন মাসে আবেদনপত্র দেওয়া হয়। দু'শো আট টাকার ড্রাফট পাঠালে রেজিস্ট্রার, আন্নামালাই ইউনিভার্সিটি, আন্নামালাইনগর-৬০৮০০২, অফিস থেকে আবেদনপত্র এবং প্রসপেক্টাস পাওয়া যায়। (খ) পি·এস·জি· ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল কলেজ, পিলামেডু, কোয়েম্বাটুর-৬৪১০০৪। মোট আসন ৭৫টি।

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় একই বিষয় নিয়ে শতকরা ৫০ নম্বরসহ পাশ করলেই আবেদন করা যাবে। বয়স হওয়া চাই ১৭ বছর। জুন মাসে আবেদনপত্র দেওয়া হয়, জমা দিতে হয় জুলাই মাসের মধ্যে।

আরও দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির সুযোগ আছে। যেমন—(ক) জওহরলাল নেহরু মেডিকেল কলেজ, আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি, আলিগড়-২০২০০১। মোট আসন ৫০টি। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্র ভর্তি করা হয়। প্রবেশিকা পরীক্ষায় ফিজিক্স, জুলজি, বটানি এবং ইংরেজি বিষয়ের ওপর প্রশ্ন থাকে। বয়স এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা একই। মে-জুন মাসে আবেদনপত্র দেওয়া হয়। পরীক্ষা নেওয়া হয় অগস্ট মাসে, ফলাফল বেরোয় অক্টোবর মাসে। তিন টাকার পোস্টাল অর্ডার পাঠালে অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার (অ্যাডমিশন), পোস্ট বক্স নং ৫২, আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি, আলিগড় এই ঠিকানা থেকে আবেদনপত্র পাওয়া যাবে। তবে অনুরোধপত্রের সঙ্গে নাম-ঠিকানা লেখা ৯×৬ ইঞ্চি মাপের পাঁচ টাকা ষাট পয়সার ডাকটিকিট লাগানো একটি খাম পাঠাতে হবে।

দ্বিতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি হল—ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্স, বারাণসী-২২১০০৫। মোট আসন ৫৯টি। প্রি-মেডিকেল টেস্ট এবং ইন্টারভিউয়ের ভিত্তিতে ছাত্র ভর্তি করা হয়। প্রার্থীর বয়স হওয়া চাই ১৭ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসেবে প্রার্থীকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজিসহ শতকরা ৫০ নম্বর পেয়ে পাশ করতে হবে। আবেদনপত্র দেওয়া হয় জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে, জমা দিতে হয় মার্চ মাসের মধ্যে। পরীক্ষা নেওয়া হয় (অবজেকটিভ টাইপের) জুন মাসে। ফলাফল বেরোয় জুলাই মাসে। পাঁচ টাকার ব্যাঙ্ক ড্রাফট পাঠালে ডেপুটি রেজিস্ট্রার, ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্স, বারাণসী-২২১০০৫, থেকে আবেদনপত্র পাওয়া যায়। অনুরোধপত্রের সঙ্গে ২৮×১৩ সে·মি· মাপের নাম-ঠিকানা লেখা তিন টাকার ডাকটিকিট যুক্ত একটি খাম পাঠাতে হয়।

এখানে বেশির ভাগ রাজ্যের মেডিকেল কোর্সে ভর্তির সুযোগসুবিধে নিয়ে আলোচনা করা হল। কয়েকটি রাজ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হল না। কেননা, সেসব রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দা না হলে কিংবা সেই রাজ্যের শিক্ষায়তনে পড়াশুনো না করলে সেখানকার মেডিকেল কলেজে পড়ার সুযোগ পাওয়া যায় না।

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

সোনার গনপতি 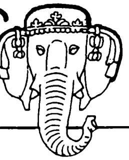 হিরের চোখ

ভাগ্য ভালই বলতে হবে। না হলে এই দুর্যোগে কখনও ট্রেন চলে ? ট্রেন অবশ্য যথাসময়ে না ছেড়ে মিনিট কুড়ি দেরিতে ছাড়ল। তাতে কী ? এ তো বিদেশ-বিভুঁইয়ে যাত্রা নয়। এ-বাড়ি থেকে ও-বাড়িতে যাওয়া। যখনই পৌঁছক না কেন কোনও অসুবিধেই হবে না।

বিল্টুর মনে উত্তেজনার ঝড় বইলেও শুভঙ্করের এখন ভাল লাগছে খুব। বাবার পুলিশের চাকরি। ডিস্ট্রিক্টে আছেন। তাই সব সময় বাইরে থাকতে হয় বলে কোথাও বেড়াতে যাওয়ার ব্যাপারটা ওর ভাগ্যে হয়েই ওঠে না। ওর যখন সাত বছর বয়স তখন মনে আছে, একবার শুধু দুর্গাপুরে গিয়েছিল ওর ছোট মাসির বিয়েতে। সেই ওর প্রথম। তারপরে এই। অথচ বিল্টু কেমন ইচ্ছে হলেই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। বছরে একবার দেশের বাড়িতে বাবা-মায়ের সঙ্গে তো যায়ই, তা ছাড়াও মাঝেমধ্যে নিজেও চলে যায়। বিল্টুরা চার ভাই। তার মধ্যে ও-ই বড়। কাজেই সময়ে-অসময়ে ওকেই যেতে হয়। তবে আজকের এই যাওয়াটা একটু অন্যরকম।

এই বর্ষণমুখর দিনশেষে ট্রেনের দুলুনিতে সব কিছুই কেমন যেন স্বপ্নময় হয়ে ওঠে ওদের কাছে। ওদের দু'জনেরই কল্পচোখে ভেসে ওঠে এক নৃত্যরত ধাতব গণপতি। যাঁর সোনার শরীর। হিরের চোখ। ওদের দু'জনেরই তাজা দুটি প্রাণে এখন উত্তেজনার ঢেউ। ওদের মানস-নয়নে সুদূরের হাতছানি। শুভঙ্কর মনে-মনে ভাবে, যদি সত্যিই ওই সোনার গণপতিকে উদ্ধার করতে পারে ওরা, তা হলে বিল্টু একা নয়, শুভঙ্করও সঙ্গী হবে ওর। ওই দূর দুর্গমে যাওয়ার ছাড়পত্র বাড়ি থেকে কখনওই পাওয়া যাবে না। তবুও যাবে। কতদিন আর সময় লাগতে পারে ? একমাস, দু'মাস, তিনমাস ? তার বেশি তো নয় ? মা, ঠাকুরমা, বাবা প্রথম-প্রথম হয়তো একটু কান্নাকাটি করবেন, তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে। যাওয়ার দিন টেবিলের ওপর 'চললাম' বলে ছোট্ট একটা চিঠি রেখে একেবারেই উধাও হয়ে যাবে ও।

ট্রেন হু-হু করে ছুটে চলেছে। অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারায় ভেসে যাচ্ছে দেশ। ভিড় একদম নেই বলেই বেশ ভালভাবে বসার জায়গা পেয়েছে ওরা। মাঝেমধ্যে কফিওয়ালাদের আনাগোনা। পুরোপুরি ভেজাল ঠাণ্ডা পানীয়ও আসছে।

বিল্টু বলল, "কফি খাবি ?"

শুভঙ্কর বলল, "তা খেলে একটু মন্দ হয় না।"

নরম প্লাস্টিক কাপে কফিওয়ালা কফি দিল। উঃ। কী গরম। হাত দিয়ে যেন ধরা যায় না।

দু' বন্ধুতে ঘনিষ্ঠ হয়ে কফি খেতে-খেতে খুব চাপা গলায় ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। অ্যাডভেঞ্চারের নেশায়, আনন্দের উত্তেজনায় অভিভূত দু'জনে।

শুভঙ্কর বলল, "দ্যাখ বিল্টু, তুই তো মাঝেমধ্যে প্রায়ই ঘর থেকে বেরোস। একা-একা কেমন তোদের দেশের বাড়িতে আসিস। আমার কিন্তু এই প্রথম। এই দুর্যোগ মাথায় নিয়ে এইভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে আসা, এইরকম ঝড়ের গতিতে ট্রেনে চেপে হু-হু করে ছুটে চলা, এ যে কী দারুণ ফ্যানটাস্টিক, তা তোকে বলে বোঝাতে পারব না। আজ বুঝেছি, ঘরকুনো হয়ে বসে থাকার চেয়ে ঘর ছাড়ার আনন্দ কত! এইটুকু সময়ের মধ্যেই আমার যেন নেশা ধরে গেল রে ভাই।"

"তোকে পেয়ে আমারও খুব ভাল লাগছে রে। এখন সত্যি কথা বলতে কী, আমার আর মনেই হচ্ছে না যে বাড়ি ফিরি।"

"আমারও। ভাবছি কাল সকালের ডাকেই বাড়িতে একটা চিঠি লিখে দেব যে, আমাদের ফিরতে একটু দেরি হবে। অন্তত হপ্তা-খানেকের আগে ফিরছি না।"

"ও, চিঠি আমিও দেব।"

কফি খাওয়া শেষ করে বেশ ভাল করে একটু গুছিয়ে বসে বিল্টু বলল, "আজ বাড়িতে গিয়ে রাতদুপুরে আর গোয়েন্দাগিরি করব না। যা করব কাল দুপুরে। আজ পেট ভরে ভাত-টাত খেয়ে ওপরের ঘরে খাটে শুয়ে তেড়ে একটা ঘুম দেব দু'জনে। তারপর কাল খুব ভোর-ভোর উঠে যদি দেখি বৃষ্টি নেই, আকাশ পরিষ্কার, তা হলে তোকে নিয়ে অনেক দূরে বেড়াতে যাব। ভিজে লাল মাটি মাড়িয়ে চলে যাব শাল-মহুয়ার বনের দিকে। কত ছোট-ছোট টিলা আমাদের ওখানে, ঘুরে কূল পাবি না। একটু দূরে সুবর্ণরেখা নদীও পাবি। আর ঘাটশিলা ? সেখানে যেন অসীম অপার সৌন্দর্য হাতছানি দিয়ে ডাকছে।"

"তবে যে সবাই বলে ঘাটশিলায় এখন আর দেখবার কিছুই নেই ?"

"কথাটা যে খুব একটা মিথ্যে তা নয়। অরণ্য নিধনের কর্মযজ্ঞে আক্রান্ত হয়ে ঘাটশিলা তার অনেক সৌন্দর্যই হারিয়েছে। তবে বেশির ভাগ লোকই ফুলডুংরি টিলা, ঘাটশিলা স্টেশন, আর মউভাণ্ডার দেখে ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে আসে। কিন্তু ঘাটশিলা তো এখন ঘাটশিলাতেই নেই। ঘাটশিলা দেখতে গেলে যেতে হবে হরিণধুবড়ি, রাতমোহনা, ধারাগিরির ঝরনা। সুবর্ণরেখা পার হয়ে মুসাবনির দিকে কিংবা ডান দিকে বাঁক নিয়ে রাখা-র জঙ্গল ফেলে রঙ্কিণী। অথবা তামুকপালের বনে। তামুকপালের বন অবশ্য দেখা যাবে না আর। সম্প্রতি কাটা হয়েছে নৃশংসভাবে। তবে এখানে দাঁড়িয়ে ঢেউ খেলানো টিলার সারি ও দূরের পাহাড়গুলো দেখলে মন ভরে যাবে। ধলভূমগড় থেকে রেলের লাইন ধরে হেঁটেও আসা যায় তামুকপাল। সেখান থেকে ঘাটশিলায়।"

"আমরা তো ঘাটশিলাতেই নামছি।"

"নামলেই বা। ওখানে তো থাকছি না। ওখানে নেমে অটো মিনি যা পাব তাতে চেপেই ফিরে আসব ধলভূমগড়ে। আর যদি আমাদের স্টেশনেই ট্রেন থামে তা হলে তো কথাই নেই।"

ধীর শ্লথ গতিতে ট্রেন থামল খড়্গপুরে।

বিল্টু বলল, "বাবাঃ। এর মধ্যেই খড়্গপুর এসে গেল ? এই তো চাপলাম ট্রেনে !"

পাশের সিটে বসা একজন ভদ্রলোক বললেন, "আজ এই দুর্যোগের দিনে এইভাবে যে লাইন ক্লিয়ার পাব তা কিন্তু স্বপ্নেও ভাবিনি। ট্রেন ছাড়ার সময় যে কুড়ি মিনিট লেট ছিল সেটাকেও মেকআপ করে নিয়েছে।"

খড়্গপুরে অনেক লোক নেমে গেল। আবার উঠলও অনেক। তবে অন্যদিনের মতো নয়। এদের মধ্যে বিল্টুর পরিচিত শশিমাস্টারও উঠলেন। ভারী সুন্দর দেখতে ভদ্রলোককে। পঞ্চাশ-পঞ্চান্নের কাছাকাছি বয়স। ঘাড় অবধি লটকানো চুল। শশিমাস্টার একেবারে ওদের মুখোমুখি এসে বসলেন। তারপর খুশিতে মুখ উজ্জ্বল করে বললেন, "আরে ! বিল্টুবাবু যে ?"

বিল্টু শশিমাস্টারের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলল, "মাস্টারমশাই, আপনি !"

"খড়্গপুরে আই আই টি-তে একবার এসেছিলাম। একজনের সঙ্গে দেখা করতে।"

বিল্টুর দেখাদেখি শুভঙ্করও প্রণাম করল।

মাস্টারমশাই বললেন, "এ ছেলেটি কে ?"

"আমার বন্ধু। ওর অনেক দিনের সাধ আমাদের দেশের বাড়িতে আসবার। তা কিছুতেই আসা আর হয়ে উঠছিল না। ক'দিন ধরে দুর্যোগ ওখানে এমনই ঘনিয়ে উঠেছে যে, বিরক্তি ধরে গেল। তাই পালিয়ে এলাম একটু হাঁফ ছাড়ব বলে।"

"এসেছ বেশ করেছ। তবে কিনা এখানেও বৃষ্টি বেশ ভালই হচ্ছে।"

"এখানে বৃষ্টি হলে আর যাই হোক প্যাচপ্যাচে কাদা তো হচ্ছে না।"

"তা হচ্ছে না। তবে সব সময় যে বৃষ্টি হচ্ছে তা নয়। মাঝেমধ্যে মেঘ দাঁড়াচ্ছে জল হচ্ছে। শরৎকালে যা হয়। তার চেয়ে একটু বেশি।"

অন্য এক ভদ্রলোক একমনে একটি ইংরেজি জার্নাল পড়ছিলেন। এবার পাতা থেকে চোখ তুলে বললেন, "কলকাতার মেঘ সরে যাবে এবার। সাইক্লোন যেটা হবার আশঙ্কা ছিল সেটা চট্টগ্রামের দিকে চলে গেছে।"

মাস্টারমশাই বললেন, "গেলেই ভাল।"

বিল্টু বলল, "মাসিমা কেমন আছেন ?"

"ভাল।"

"মউ ?"

"ওর কথা আর বোলো না বাবা। দিনকে-দিন কী যে হচ্ছে মেয়েটার, তা ভগবানই জানেন। যত বড় হচ্ছে তত ওর দুরন্তপনা বাড়ছে। বায়নারও তেমনি শেষ নেই। আজ ঘড়ি কিনে দাও, কাল রেডিও কিনে দাও, পরশু ক্যামেরা কিনে দাও। কেনার আর শেষ নেই। না দিলেই অভিমান। কান্নাকাটি, খাওয়া-দাওয়া বন্ধ।"

বিল্টু হেসে বলল, "তা ওই একটিই তো মেয়ে আপনার। যা চায় দিয়েই দিন না।"

"দিতে-দিতে আকাশের চাঁদ চাইছে সে। এই কিছুদিন আগে সাইকেল কিনে দিয়েছি। এখন বলছে মোটরবাইক কিনে দাও।"

আবদারের কথা শুনে শুভঙ্করও হেসে ফেলল। বলল, "কত বছর বয়স আপনার মেয়ের ?"

"তোমাদেরই বয়সী। তেরো-চোদ্দ বছরের।"

শুভঙ্কর বলল, "আমার বয়স পনেরো।"

"ওই হল।"

খড়্গপুর থেকে ছাড়ার পর ট্রেনটা অসম্ভব রকমের স্পিড নিল। এত জোর যে, এক-এক সময় মনে হচ্ছে লাইন থেকেই ছিটকে যাবে বুঝি।

মাস্টারমশাই বিল্টুকে বললেন, "হ্যাঁ। ভাল কথা, শুনলাম নাকি তোমার বাবা বাড়িটাকে বিক্রি করে দিচ্ছেন ?"

"ঠিকই শুনেছেন।"

"বাড়িটা কি গায়ে কামড়াচ্ছে তোমার বাবার ? একে ওইরকম বাড়ি, তায় পিতৃপুরুষের ভিটে। ও কেউ বেচে ?"

"কী বলব বলুন। আমি তো ছেলেমানুষ।"

"তোমার বাবাকে একবার বোলো আমার সঙ্গে দেখা করতে।"

"বলব। আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হল। একসঙ্গেই যাওয়া যাবে। আমরা তো অটো নেব। আপনি আমাদের সঙ্গে অটোতেই যাবেন।"

"অটো ? অটো নেবে কেন ?"

"ট্রেন যদি ধলভূমে না দাঁড়ায়, তা হলে ? ঘাটশিলায় নামলে অটো তো করতেই হবে। না হলে এই রাতদুপুরে অতটা পথ যাব কী করে ?"

"ট্রেন ধলভূমেই থামবে। গাড়িতে ওঠার আগেই আমি জেনে নিয়েছি। রেলের কিছু মালপত্তর নামবে। তাই।"

"তবে তো ভালই হল।"

খড়্গপুরের পর ঝাড়গ্রামে থামল ট্রেন। তারপর আবার চলতে শুরু করল। বিল্টু মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে খোশ গল্পে মেতে উঠল।

একজন কফিওয়ালা 'কফি কফি' করে হেঁকে গেল।

বিল্টু কফিওয়ালাকে ডেকে তিন কাপ কফি নিল। গরম কফি। সবে এক চুমুক দিয়েছে, এমন সময় হঠাৎ বখাটে চেহারার পাঁচজন যুবককে একটু বিশেষ রকমের সক্রিয় হয়ে উঠতে দেখা গেল। এরা ঝাড়গ্রামে উঠেই গেট আগলে দাঁড়িয়ে ছিল। নিজেদের মধ্যে কী সব আলোচনা করছিল ফিসফিস করে। মাঝেমধ্যে আড়চোখে দেখছিল। ট্রেন একটু জোরে চলতেই প্যাসেঞ্জারদের দিকে এগিয়ে এল ওরা। ওদের গুপ্তস্থান থেকে বেরিয়ে এল ছোরা, পিস্তল ইত্যাদি। চারজনের হাতে রইল চারটে ছোরা। একজনের হাতে পিস্তল।

বসে থাকা যাত্রীদের মুখ ভয়ে শুকিয়ে গেল এবার। ওরা যে কারা তা বুঝতে আর বাকি রইল না কারও।

একজন যুবক এগিয়ে এসে মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়াল। তারপর বেশ লেকচারের ভঙ্গিতেই বলল, "লেডিজ অ্যান্ড জেন্টেলম্যান ! আপনারা নিশ্চয়ই এতক্ষণে বুঝতে পেরেছেন যে আমরা কারা। তবে কিনা আজকে একটু রঙ টার্গেট হয়ে গেছে আমাদের। এই সামান্য বৃষ্টিতেই কাপুরুষের দল যে ঘর থেকে বেরোবে না তা আমরা ভাবতেও পারিনি। এখন আমরা যা বলি, তা মন দিয়ে শুনুন। না না, আমরা সাধারণ চোর-ডাকাতদের মতো নই। ওসব চুরি-ছিনতাই আমরা করি না। শিক্ষিত ভদ্রলোকের ছেলে আমরা। আমাদের প্রত্যেকের নামের পিছনে একটা করে ইউনিভার্সিটির ছাপ আছে। কাজেই আমরা ভদ্র সন্তানরা অযথা রক্তপাত ঘটাতে চাই না। আশা করি আপনারা চাইবেন না সেটা। যার কাছে যা আছে, মানে টাকাকড়ি সোনাদানা, সব এনে আমাদের সর্দার 'শিকারি বাজ'-এর পায়ের ওপর রেখে যা"

গভীর আতঙ্কের ছায়া নামল সকলের মুখে।

যুবক বলল, "নিন, একটু তাড়াতাড়ি করুন। কেননা, এই কামরার ভেতর দিয়ে অন্য কামরায় যাওয়া যায়। বলা যায় না হয়তো কোনও দুঃসাহসী ডানপিটে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে আমাদের ওপর।

যদিও তা কেউ করে না। কেননা, জীবন নিয়ে জুয়া খেলতে কেউই চায় না আজকাল। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল আমাদের এই পিস্তলটাও আসল কি নকল, তাও কেউ পরখ করে দ্যাখে না। এই তো, আমরা হচ্ছি পাঁচজন আর আপনারা পঞ্চাশজন। আসুন না, ঝাঁপিয়ে পড়ুন আমাদের ওপর।"

ছোরা হাতে আর-এক যুবক হেসে বলল, "ঝাঁপিয়ে পড়বে কী। ভয়ে মুখের চেহারা কেমন হয়েছে দ্যাখ।"

আগের যুবক বলল, "আমাদের হাতে সময় কিন্তু কম। দেরি হয়ে যাচ্ছে খুব। যার কাছে যা কিছু আছে বার করুন। আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি, চুরি-ছিনতাই আমরা করি না। শুধু মানুষের ভালবাসার দান আমরা গ্রহণ করি। তবে জোর করে যদি আমাদের আদায় করতে হয় তা হলে কিন্তু ভয়ানক ব্যাপার ঘটে যাবে। আমি মেয়েদেরও বলছি, আপনারা আপনাদের গলার হার, কানের দুল, হাতের চুড়ি ইত্যাদি সোনার জিনিস যার যা-কিছু আছে তা শিকারি বাজের পায়ের ওপর ফেলে দিন। দেশের স্বার্থে দশের স্বার্থে এই কাজ করুন আপনারা। মনে রাখবেন, আপনাদের এই ভালবাসার দান নিয়ে কয়েকজন বেকার যুবক বাড়ি-গাড়ি করে বিনা মেহনতে বড়লোক হবার যে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে, তা কিন্তু আগামী দিনের যুবসমাজের আদর্শ হবে। এই গত সোমবার এক বৃদ্ধ কেরানি তাঁর সারা মাসের মাইনের টাকাটা আমাদের হাতে হাসিমুখে তুলে দিয়েছেন। কন্যাদায়গ্রস্ত এক পিতা ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে ফেরার সময় আমরা বলা-মাত্রই সব টাকা আমাদের সর্দারের পায়ের ওপর রেখে গেছেন। তা হলে আপনারাই বা পারবেন না কেন? রেডি, ওয়ান···টু···।"

এক ভদ্রমহিলা ভয়ে-ভয়ে তাঁর হাতের চারগাছা চুড়ি এনে শিকারি বাজের পায়ের ওপর রাখলেন।

শিকারি বলল, "এগুলো সোনার তো? যদি না হয় তোমার সিঁথির সিঁদুর কিন্তু মুছে যাবে। তুমি টাটানগরের সাকচিতে থাকো। তোমাকে আমি চিনি।"

মহিলা কোনওরকমে "হ্যাঁ" বলে চলে গেলেন।

ট্রেনের অন্য যাত্রীরাও তখন পকেট হাতড়ে যার কাছে যা কিছু ছিল তা বার করতে লেগে গেছে।

শুভঙ্কর আর বিল্টু কফি হাতে ভয়ে জড়োসড় হয়ে বসে রইল এক পাশে।

আর-এক ভদ্রলোক তাঁর মানিব্যাগটা বার করে যেই না উঠতে যাবেন অমনি শশিমাস্টার তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, "দাঁড়ান। ওটা আমাকে দিন। ওদের যদি ক্ষমতা থাকে তা হলে আমার কাছ থেকে এসে নিয়ে যাক।"

কুতকুতে পায়রা-চোখের ছিপছিপে লম্বা চাপদাড়ির শিকারি বাজ হিংস্র বাঘের মতন গর্জন করে উঠল, "মা-স্টা-র-ম-শা-ই— ।"

শশিমাস্টার একদৃষ্টে কিছুক্ষণ শিকারি বাজের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "তুই মধু মাইতির ছেলে রঘু না?"

"চিনতে পেরেছেন দেখছি। তা আপনার হঠাৎ বুড়ো বয়সে এ ভীমরতি কেন? হিন্দি ফিল্মের হিরো হতে চান?"

"যদি ভাল চাস তা হলে এখনও নেমে যা বলছি।"

"মাস্টারমশাই! আপনি তো দিব্যি বিদ্যের জাহাজ হয়ে বসে আছেন। একদিন আমিও আপনার ছাত্র ছিলাম।"

"এখনও তুই নামলি না?"

শিকারি এবার গম্ভীর গলায় বলল, "তুই-তোকারি করছেন কাকে? মধু মাইতির ছেলে রঘু মাইতি এখন শিকারি বাজ। আমার সামনে দাঁড়িয়ে চোখ রাঙিয়ে কথা বলার স্পর্ধা কী করে হল? এর পরিণাম জানেন?"

"জানি। তুই আমায় খুন করবি। এই তো?"

শিকারি হোহো করে হেসে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল মাস্টারমশাইয়ের উপর।

এর পরে আর থাকা যায় না। বিল্টু হঠাৎ রুখে দাঁড়িয়ে কাপসুদ্ধু গরম কফিটা ছুঁড়ে মারল শিকারির চোখে।

শিকারি 'মাই গড' বলে লাফিয়ে উঠে দু' হাতে চোখ ঢাকল একবার। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে এক হাতে বিল্টুর কলার ধরে শূন্যে তুলে নিল ওকে।

ওর পেটের মধ্যে গুঁজে রাখা দাদুর ডায়েরিটা ঠক করে পড়ে গেল নীচে।

ছোরা হাতে আর-এক যুবক কুড়িয়ে নিল সেটা।

বিল্টু চিৎকার করে উঠল, "শুভ! কেড়ে নে ওটা।"

শিকারি তখন বিল্টুকে অনেকটা ওপরে উঠিয়ে নিয়েছে।

বিল্টু অসহায়ভাবে ছটফট করতে লাগল।

শিকারি বলল, "অদ্যই তোর শেষ রজনী। সুবর্ণরেখার বালিগুলো আজকাল সোনার রেণুর অভাবে বড় বেশি কালো হয়ে যাচ্ছে। তোর রক্তে ওই বালির চরটা আমি লাল করে দেব আজ। আমি তোর মৃত্যুদণ্ড দিলাম।" বলেই আবার নামিয়ে দিল ওকে।

আর ঠিক সেই সময়ই শিকারির অন্যমনস্কতার সুযোগে মাস্টারমশাই ওর হাত থেকে কেড়ে নিলেন পিস্তলটা। নিয়ে ওরই দিকে তাগ করে বললেন, "শয়তান! কে কার মৃত্যুদণ্ড দেয় এবার দ্যাখ। আজ তোর দিন কি আমার দিন।"

শিকারি একটুও ভয় না পেয়ে হেসে বলল, "কী ভুলভাল বকছেন মাস্টার। এখন দিন, না রাত? ওটা ফেরত দিন। ও জিনিস আপনার হাতে মানায় না।"

"তোকে বিশ্বাস নেই পাপী। তুই এখন কেউটে সাপ। এ জিনিস তোর হাতে আমি কিছুতেই ফিরিয়ে দেব না।"

"দেবেন না?" বলেই আচমকা মাস্টারের হাত ধরে কবজিতে একটা মোচড় দিতেই পিস্তলটা খসে পড়ল হাত থেকে।

শিকারি সেটা কুড়িয়ে নিয়েই মাস্টারের দিকে তাগ করে বলল, "এটা পাঠশালার দেওয়ালে ঝোলানো বেত নয় যে, ইচ্ছেমতো পেড়ে নিয়ে যাকে খুশি পেটাবেন। পিস্তল চালাতে গেলে ট্রেনিং নিতে হয়। এখন দেখে নিন পিস্তল কীভাবে চালাতে হয়। অ্যা-অ্যা-অ্যাই। এই দেখুন, রেডি? ওয়ান-টু-ডিস্যুম···।"

পিস্তলের গুলিটা মাস্টারমশাইয়ের বুকে লাগল। রক্তে ভেসে গেল বুক। মাস্টারমশাই আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়লেন মেঝের ওপর। কেউ তাঁকে ধরবার জন্য এগিয়ে এল না।

শিকারি বাজ এর পর চলন্ত ট্রেনের চেন টেনে মাঝপথেই ট্রেন থামাল। তারপর অসহায় যাত্রীদের মুখের দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে থেকে রক্তচক্ষুতে তাকাল বিল্টুর দিকে।

বিল্টুর বুক টিপটিপ করছে তখন।

শিকারি একবার ওর দিকে এগিয়ে এসে কী ভেবে যেন আবার পিছিয়ে গেল। তারপর সঙ্গীদের ইশারায় নেমে যেতে বলে নিজেও নেমে গেল ঝুপ করে।

বিল্টু শুভঙ্করকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠল, "শুভ রে! দাদুর ডায়েরিটা?"

শুভঙ্করের চোখেও তখন জল এসে গেছে। এই ডায়েরির সূত্র ধরে কী কাণ্ড করে দুর্যোগের মধ্যে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে, বাড়িতে মিথ্যে কথা বলে, গুরুজনদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে এইভাবে আসা। আর সেই ডায়েরিটাই পড়ে গেল এমন দুর্বৃত্তদের হাতে, যারা কিনা খেলার ছলে

সত্যিকারের একজন আদর্শবাদী মানুষের জীবনটাকেই নষ্ট করে দিল।

খবর পেয়ে জি আর পি-র লোকেরা এল। জিজ্ঞাসাবাদের পর শশিমাস্টারের ডেড বডি নামানো হল চাকুলিয়ায়।

তিন

এর পর ট্রেন ধলভূমগড়েই থামল। মাত্র এক মিনিট। তাই সই। নেমে পড়ল দু'জনেই। দুর্যোগ তখন কেটে গেছে।

বিল্টু বলল, "এই দুঃসংবাদটা যে কী করে দেব মাস্টারমশাইয়ের বাড়িতে, তা ভেবে পাচ্ছি না।"

"তোদের বাড়ি থেকে মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি কতদূর?"

"বেশি দূরে নয়।"

"তা হলে দিতেই হবে। এ-খবর তো চেপে রাখা যায় না!"

"আমি ভাবছি মউটার কথা। ওর কী হবে বল তো? কী সুন্দর ফুলের মতো দেখতে মেয়েটাকে। মাস্টারমশাই তো চলে গেলেন। শিকারি বাজ যদি সত্যিই এবার ওর দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তা হলে?"

"এটা অবশ্য চিন্তার কথা। যেভাবে ওরা শাসিয়ে গেল তাতে রীতিমত ভয়ের ব্যাপার বইকী। বিশেষ করে সাইকেল নিয়ে একা-একা ঘোরে যখন মেয়েটা, তখন যে-কোনও মুহূর্তে ওদের খপ্পরে পড়ে যেতে পারে।"

"দাদুর ডায়েরিটাও হাতছাড়া হল। এখন ভাবছি কাল সকালে এলেই হত। খুব বেশি লাফিয়েছিলুম কিনা, গুরুজনদের মিথ্যে কথা বলেছিলুম। তারই ফল হাতেনাতে পেলাম।"

শুভঙ্কর বলল, "দ্যাখ বিল্টু ওই ডায়েরিটা যে আমাদের কাছে এক অমূল্য সম্পদ তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তা ছাড়া ওটা তোর দাদুর স্মৃতি। আমরা যখন জেনে গেছি সোনার গণপতি কোথায় আছেন, তখন আর ভয় কী? মূর্তি উদ্ধার আমরা করবই। তবে ডায়েরিটা আর কখনও ফেরত পাব না এইটাই যা দুঃখ। যা হবার তা হয়ে গেছে। ও নিয়ে তুই মনখারাপ করিসনি। তুই যেভাবে শিকারির মুখে গরম কফিটা ছুঁড়ে দিয়েছিলি বা তার পরে ও যে কথা বলেছিল তাতে সত্যি-সত্যিই যে ও তোকে তুলে নিয়ে যায়নি বা তোর কোনও ক্ষতি করেনি, এইটাই আমাদের সৌভাগ্য।"

স্টেশন থেকে নেমে শালবনের ভেতর দিয়ে হাঁটা-পথে ওরা বাড়ির দিকে চলল। কোথা থেকে যেন বিচ্ছিরি একটা ডাক ভেসে আসছে।

শুভঙ্কর বলল, "ওটা কিসের ডাক রে বিল্টু?"

"ও তক্ষকের ডাক।"

তক্ষক কী তা জানে না শুভঙ্কর। তাই নামটা শোনামাত্রই এক অজানা আতঙ্কে কেঁপে উঠল ওর বুক। একটা জলঢোঁড়া সাপ পায়ের পাশ দিয়ে হিলহিল করে বেরিয়ে গেল। শুভঙ্কর লাফিয়ে উঠল ভয়ে।

বিল্টু বলল, "কী আশ্চর্য! টর্চটা আমার ব্যাগেই রয়েছে অথচ আমরা অন্ধকারে পথ চলছি এতক্ষণ।" বলে টর্চ বার করে এ-পথ সে-পথ ঘুরে ঝোপঝাড়ের পাশ দিয়ে এক প্রাসাদোপম বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। বিল্টু বলল, "এই হচ্ছে আমাদের বাড়ি।"

শুভঙ্কর অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল বাড়িটার দিকে।

এই বাড়ির সামনে বাগানের অংশে কয়েকটি টালির চালের বাড়ি। বিল্টু সেদিকে তাকিয়ে হাঁক দিল, "তিন্নি।"

বারো-তেরো বছরের একটি ফ্রক-পরা ফুটফুটে কিশোরী বেণী দুলিয়ে ছুটে এল, "কে! বিল্টুদা! আসুন আসুন, ভেতরে আসুন।"

ওরা ঘরের দাওয়ার কাছে এগিয়ে গেল। মিটমিট করে হ্যারিকেনের আলো জ্বলছিল ঘরের ভেতর। বিল্টুর গলা পেয়ে আলো হাতে তিন্নির বাবা পুণ্ডরীককাকাও বেরিয়ে এলেন। এলেন কাকিমাও।

পুণ্ডরীককাকা বললেন, "খবর না দিয়ে হঠাৎ? তা কলকাতায় বৃষ্টি কেমন চলছে? এখানে তো দুর্যোগ খুব।"

বিল্টু বলল, "ওখানকার অবস্থা আরও খারাপ।"

"রেডিওর খবরে তাই শুনছিলাম," বলে শুভঙ্করের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ও ছেলেটি কে?"

"আমার বন্ধু। আমাদের দেশ দেখতে এসেছে।"

কাকিমা বললেন, "বাইরে দাঁড়িয়ে কেন বাবা? ভেতরে এসো। একটা চিঠি দিয়ে যদি আসতে তা হলে রেঁধেও রাখতে পারতাম।"

"কোনও ঠিক ছিল না। হঠাৎই ঠিক করে চলে এসেছি আমরা।"

"বেশ করেছ। তা বাবা, ঘরদোর সবই তো বেচে দেবে তোমরা। এমন বাড়ি দেখলে মায়া হয়। যে ব্যবসায়ী কিনছে সে কি আর এ-বাড়ি রাখবে? ভেঙে মাঠ করে দেবে।"

বিল্টু আর শুভঙ্কর পা ধুয়ে ঘরে ঢুকল।

তিন্নি হাসিমুখে পরম সমাদরে ওদের ঘরে নিয়ে বসাল।

পুণ্ডরীককাকা বললেন, "আর সব খবর ভাল তো? মা-বাবা-ভাইদের শরীর ভাল আছে? জেঠুর খবর ভাল?"

বিল্টু বলল, "সব খবরই ভাল। কিন্তু একটা খবর খুবই খারাপ আছে কাকাবাবু। ট্রেনে আসতে-আসতে এমন এক বিচ্ছিরি কাণ্ড ঘটে গেল যে, তা বলবার নয়।"

কাকাবাবু-কাকিমা দু'জনেই উৎকণ্ঠিত হয়ে বললেন, "কী হয়েছে বাবা?"

"আমাদের চোখের সামনে শশিমাস্টার খুন হলেন।"

"খুন!" শিউরে উঠলেন সকলে।

তিন্নি দারুণ ভয় পেয়ে বলল, "কোথায়?"

বিল্টু তখন আগাগোড়া সব কথা খুলে বলল।

পুণ্ডরীককাকা বললেন, "ইস্‌স রে। সংসারটা ভেসে গেল একেবারে। অমন মানুষ কালেভদ্রে দেখা যায় বাবা। ওইরকম মানুষের এই পরিণাম?"

বিল্টু বলল, "তাই তো হয় কাকাবাবু। এইসব মানুষ তো পরহিতেই জীবন দান করেন।"

পুণ্ডরীককাকা বললেন, "ঠিক আছে। যা ব্যবস্থা করবার এক্ষুনি আমি সব করছি।"

বিল্টু বলল, "আমি কি যাব কাকাবাবু আপনার সঙ্গে?"

"যাবে? এসো।"

বিল্টু বলল, "তুই একটু বোস শুভঙ্কর। তিন্নির সঙ্গে গল্প কর। তিন্নি খুব ভাল চা করতে পারে। ওর হাতের চা খা। আমি কাকাবাবুর সঙ্গে একটু ও-বাড়ি থেকে আসি।"

কাকিমা বললেন, "তোমরা ঘুরে এসো। তারপর তিন্নিকে নিয়ে আমিও একবার যাব ওদের বাড়ি।"

ধলভূমগড়ের মাটি কাঁপিয়ে একটা মালগাড়ি তখন ঝড়ের বেগে হাওড়ার দিকে ছুটে চলেছে।

বিল্টু চলে গেলে তিন্নি বলল, "আপনি বসুন দাদা, আমি আপনার জন্য চা করে আনি। কী খবর যে শোনালেন না আপনারা? আজই বিকেলবেলা শিবতলাতে দেখা হল মউয়ের সঙ্গে। কে জানত তখন যে, এত তাড়াতাড়ি মেয়েটি পিতৃহীন হবে।"

শুভঙ্কর বলল, "সবই কপালের লেখা।"

আকাশের ঈশান কোণে তখন বিদ্যুতের ঝিলিক মারল। সেইসঙ্গে মেঘের গর্জনও শোনা গেল, গুড়-গুড়-গুড়-গুড়ুম। (ক্রমশ)

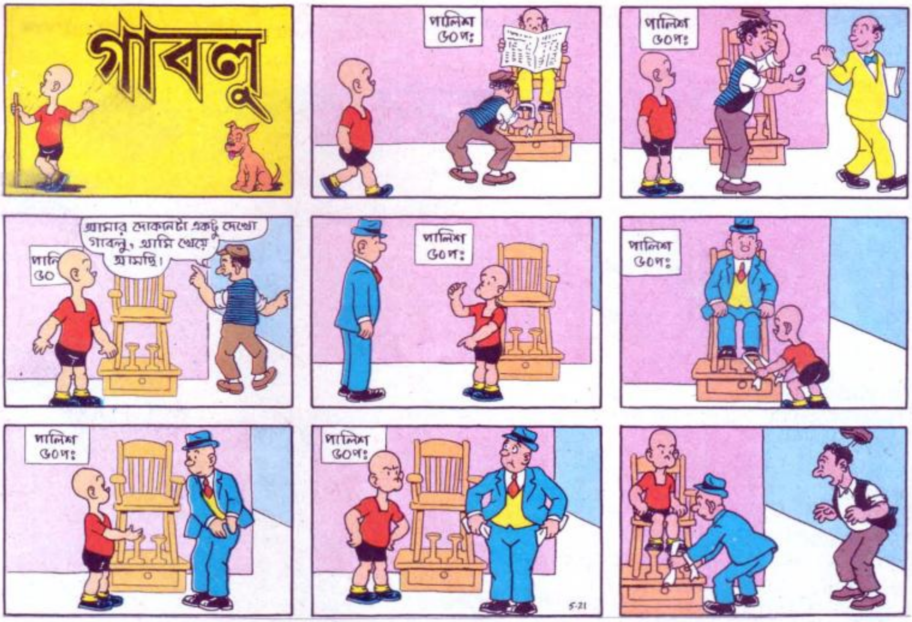
গাবলু
পালিশ ৩০পঃ
পালিশ ৩০পঃ
আমার দোকানটা একটু দেখো গাবলু, আমি খেয়ে আসছি।
পালিশ ৩০পঃ
পালিশ ৩০পঃ
পালিশ ৩০পঃ
পালিশ ৩০পঃ
5-21

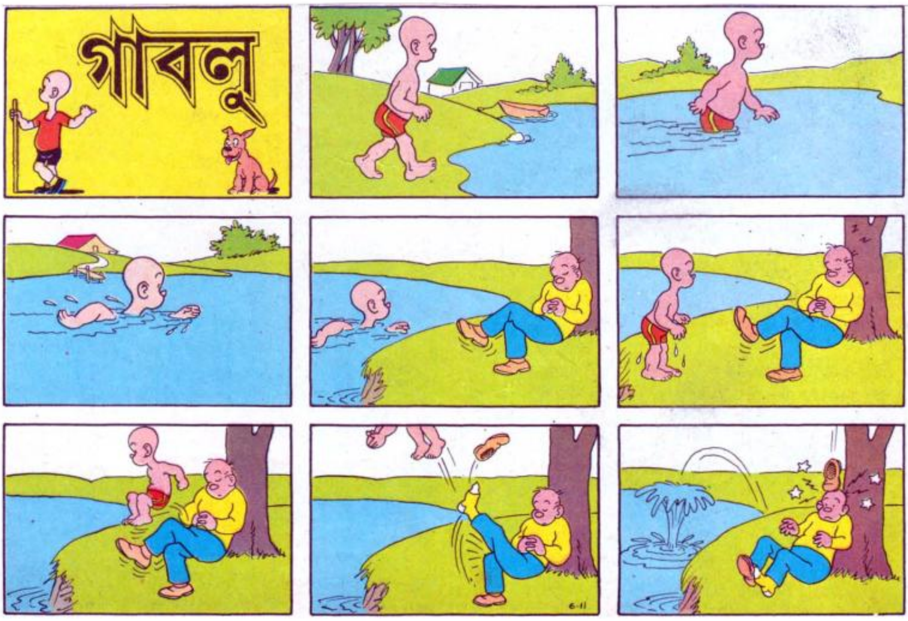
গাবলু
6-11

পান্না-পাথরের বুদ্ধমূর্তি

অদ্রীশ বর্ধন

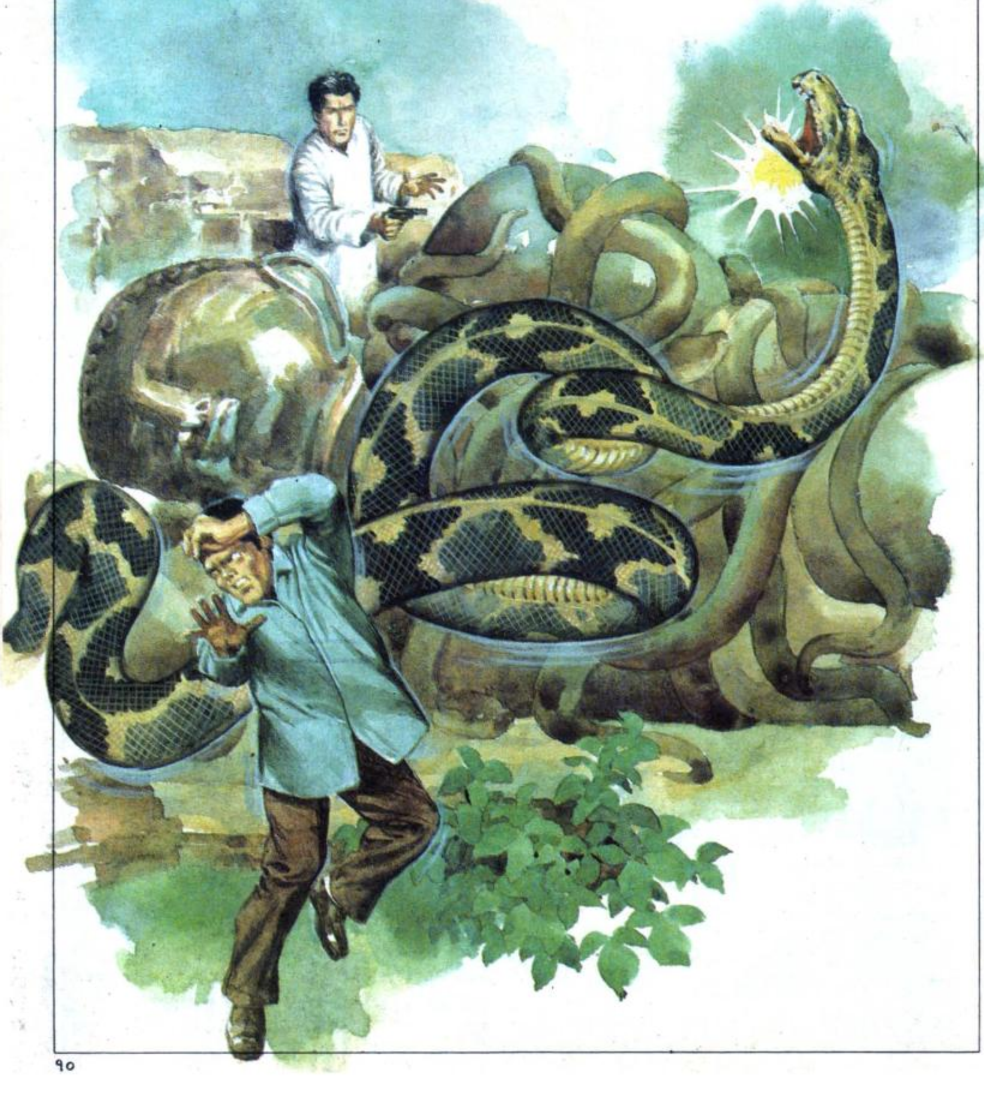

মেকং নদীর একদিকে শ্যামদেশ, আর একদিকে লাওস। পশ্চিম দিকে এসে এই নদীই আবার সোজা উত্তরমুখো হয়ে লাওসের ঠিক মাঝখান দিয়ে গেছে। নদী এখানে অনেক সরু। পাহাড় থেকে আও আর জেঙ নদী নেমে এসে এক হয়ে গিয়ে যেখান থেকে মেকং শুরু হয়েছে, সোনার চর জেগে উঠেছে ঠিক সেইখানে।

জায়গাটা অপরূপ। একদিকে চুনাপাথরের পাহাড়, নদীর পাড় থেকে খাড়াইভাবে উঠে গেছে হাজার ফুট উঁচুতে। বহুদিন আগে একটা চৈনিক তৈলচিত্রে এইরকম চোখ জুড়নো অপূর্ব দৃশ্য দেখেছিলাম। সাদা পাথরের গা থেকে রোদ্দুর ঠিকরে যাচ্ছে হাজার হাজার কিরণরেখায়। ডাইনে আর বাঁয়ে সবুজ টিলার পর টিলা।

ঠিক নীচেই জেগে উঠেছে একটা চড়া। হলুদ কাঁকর, কালচে বালি আর এদিকে-ওদিকে অজস্র কাঁটাঝোপ ছাড়া সেখানে কিচ্ছু নেই। অনেক বেতের চুপড়ি উপুড় করে ছড়ানো ছোট্ট চড়াটার নানান দিকে। জলের ধারে খানকয়েক বেতের বাস্কেট। তার পাশে একটা উপুড় করা লোহার কড়াই।

নৌকোর ছাদে দাঁড়িয়ে দেখতে পাচ্ছি আরও দূরের সবুজ আর ধূসর পাহাড় আর পাহাড়। নদীর দুই পাড়েই। ধোঁয়ার মতো মিলিয়ে রয়েছে দূর দিগন্তে।

কিন্তু সোনা এখানে কোথায়? চিলের মতো বোসবাবু চেঁচিয়ে যাচ্ছেন ঠিকই, এক কণা সোনাও তো কোত্থাও দেখছি না। কাঁকর, বালি আর কাঁটাঝোপের মধ্যে অত দামি পাথর লুকিয়ে রয়েছে সবার চোখ এড়িয়ে— এটাও তো বিশ্বাস করতে পারছি না।

দুটি মাত্র প্রাণী নদীর জলে কোমর পর্যন্ত ডুবিয়ে আমাদের দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। বোসবাবুর বিকট চিৎকারে চমকে উঠে তারা ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

একজন একটি মেয়ে। লাও মেয়ে। মাথায় খোঁপা। পরনে সায়া-শেমিজের মতো পোশাক। হাতে একটা বেতের চুপড়ি। নুড়ি আর বালি তুলে জল ছেঁকে বের করছে। বদখত চিৎকার শুনে ভীষণ চমকে উঠে তাকিয়ে রয়েছে চোখ বড়-বড় করে।

তার পাশের লাও পুরুষটিও ঘুরে দাঁড়িয়েছে। লাফ দিয়ে জল ছেড়ে ডাঙায় উঠে পড়ছে। সে যে কত গরিব, তার প্রমাণ তার পরনের শতচ্ছিন্ন হাফপ্যান্টখানা ছিঁড়ে গিয়ে সুতো ঝুলছে হাঁটু পর্যন্ত। গায়ের জ্যাকেটটা ময়লায় কয়লার মতো কালো হয়ে গেছে। মাথায় গোল উলের টুপি। হাতে এক চুপড়ি বালি আর কাঁকর। জল ছেঁকে বের করে দিচ্ছিল এতক্ষণ। আঁতকে উঠেছে বোসবাবুর বাজখাঁই চিৎকারে।

"সোনা! সোনা! সোনা!" তখনও লাফাচ্ছেন আর চেঁচাচ্ছেন বোসবাবু।

মৃদু ধমকের সুরে ইন্দ্রনাথ বললে, "আঃ! কান যে ঝালাপালা হয়ে গেল! পান্না-বুদ্ধ খুঁজতে এসে সোনার জন্য হেঁকে মরছেন কেন?"

জ্বলজ্বলে বেড়াল-চোখে তাকিয়ে বললেন বোসবাবু, "কে জানে, এখানেই পান্না-বুদ্ধদের লুকিয়ে রাখা হয়েছে কি না। শুকনো ঋতুতেই তো কেবল ভেসে ওঠে চড়াটা, ডুবে থাকে অন্য ক'টা মাস।"

"এখানে!" ভুরু কুঁচকে যায় ইন্দ্রনাথের।

"অনেক ভেবেই আপনাদের এখানে এনেছি, মিঃ রুদ্র। মরবার সময়ে মা বলেছিল কলসির মাঠে দৈত্যদের উনুন। মনে আছে?"

"আছে…"

"সেরকম উনুন এখানেও তো থাকতে পারে! বলতে গেলে বারোমাসই জলে ডুবে থাকে, তার মধ্যেই হয়তো আছে…"

"পান্না-বুদ্ধ!"

"রাইট! রাইট!"

"কিন্তু এটা তো মাঠ নয়। পাহাড় রয়েছে আশেপাশে।"

"কী মুশকিল! চড়াটাকেই মাঠ বলে ধরে নিন না।"

"ধরে নেব?" সকৌতুকে বললে ইন্দ্রনাথ।

"আলবত ধরবেন। যদিও আমার মনের পটে স্পষ্ট ছবি এখনও ভাসছে না, তবে চড়ায় নেমে একটা চক্কর মারলেই হয়তো ভেসে উঠবে, ঠিক পিটার হারকোসের ক্ষেত্রে যা ঘটত।"

"পিটার হারকোস!" এতক্ষণে মুখে কথা ফুটল আমার, "নামটা যেন শুনেছি মনে হচ্ছে?"

"শুনবেনই তো। আপনি হলেন গিয়ে লেখক মানুষ, জ্ঞানী মানুষ। পিটার হারকোস মাটির ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে বলে দিত পায়ের তলায় কোথায় আছে সোনার খনি, কোথায় আছে পেট্রল।"

"অতীন্দ্রিয় অতি-অনুভূতির খেলা," বিড়বিড় করে বলেছিলাম আমি।

"সে-খেলা আমিও দেখাই, সার, তবে পিটার হারকোসের মতো অত জোরালো সাইকিক আমি নই। এই, কী করছিস তোরা?" শেষ প্রশ্নটা ঝোঁকের মাথায় খাস্ বাংলাতেই ছুঁড়ে দিয়েছিলেন বোসবাবু হতভম্ব লাও মেয়ে আর পুরুষটার দিকে। পরক্ষণেই লাও ভাষায় তড়বড় করে মাথা নেড়ে হাত-পা ছুঁড়ে অনেক কথা বলে গেলেন।

মিনমিন করে ওরা জবাব দিয়ে গুটিগুটি সরে পড়বার তালে ছিল। কিন্তু দাবড়ানি দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলেন বোসবাবু। তারপর বিকট এক হাসি হেসে হলুদ দাঁতের নোংরা দেখিয়ে বললেন আমাদের, "দেখবেন? কাদা আর বালি থেকে সোনা তৈরি হয় কী করে, দেখবেন? দেখুন, দেখুন, আমি ততক্ষণে এক চক্কর মেরে আসি চড়ায়, পিটার হারকোস, হে পিটার হারকোস, একটু দয়া করো, বাবা!"

নৌকো ঠেকেছে চড়ায়। পাটাতন নামিয়ে দিতেই আগে লাফাতে লাফাতে নেমে পড়ে পাঁইপাঁই করে ছুটে গিয়ে কাঁটাঝোপের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন বোসবাবু।

মাথার ওপর দিয়ে কলরব করে উড়ে গেল অনেক পাখি। তারপর শুধু জলের ছলাৎ-ছলাৎ শব্দ।

মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম আমি আর ইন্দ্রনাথ।

কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না কাঠের পুতুলের মতো। হেসে-হেসে হাতছানি দিয়ে আমাদের ডাকছে লাও মেয়ে আর পুরুষটা। বড় নির্মল, বড় সরল হাসি। গায়ে ময়লা আছে, কিন্তু মনে ময়লা নেই।

নেমে গেলাম তীরে। ওরা সোনা তৈরি করল আমাদের সামনেই। চুপড়ি দিয়ে জল ছেঁকে বের করে নেওয়া বালি আর কাদা নিয়ে ঢেলে দিল লোহার কড়ায়। একটা বোতল থেকে চকচকে ভারী একটা তরল পদার্থ ঢেলে দিল তার ওপর।

"পারা," মৃদুস্বরে বললে ইন্দ্রনাথ।

হ্যাঁ, পারা-ই বটে। বালি আর কাদার মধ্যে সোনার গায়ে লেগে গিয়ে গুটলি-গুটলি বল হয়ে গেল। শুকনো কাঁটাগাছ জড়ো করে আগুন ধরিয়ে তাতে কড়া চাপিয়ে দিল ওরা। তারপর একটা ব্লোপাইপ দিয়ে জোরে ফুঁ দিতেই গরম পারা উবে গিয়ে রেখে গেল সোনার ছোট-ছোট গুলি। সাইজে কড়ে আঙুলের নখের সমান। তেলতেলে মসৃণ নয়, অজস্র সোনার কণা যেন চেপে গুলি পাকানো।

হাসিমুখে ওরা আমাদের দিকে তাকিয়ে একমুঠো সোনার গুলি তুলে দিলে ইন্দ্রনাথের হাতে।

না নিয়ে ফিরিয়ে দিয়ে ইঙ্গিতে কী যেন বলতে যাচ্ছে ইন্দ্র, এমন সময়ে চড়ার ভেতর দিক থেকে ভেসে এল উৎকট আর্তনাদ, "মেরে

ফেললে। মেরে ফেললে! ওঃ! ওঃ! ওঃ!"
বোসবাবুর চিৎকার!

পান্না-বুদ্ধ! পান্না-বুদ্ধ!

কিম্ভূতকিমাকার মূর্তিটার দিকে চেয়ে থেকে ইন্দ্রনাথ বললে, "মৃগাঙ্ক, গোটা দুনিয়ায় মাকড়সা কতরকম জাতের আছে?"

"প্রায় চল্লিশ হাজার। কিন্তু এখন..."

"এদের বিষে মানুষ কি মারা যায়?"

"কখনওই না। তবে কামড়ের জায়গার কোষগুলো বিষিয়ে গিয়ে রক্তকে বিষিয়ে দিতে পারে। ইন্দ্র..."

"তা হলে বোসবাবুর মরণ নেই। কিন্তু ভোগান্তি আছে," এই বলে নির্বিকারভাবে চেয়ে রইল ইন্দ্রনাথ। ওর চোখের সামনে উদ্দাম নাচ নেচে চলেছেন বোসবাবু। তাঁর পা থেকে মাথা পর্যন্ত ছেয়ে গেছে কালো কুচকুচে মাকড়সায়। সাইজে এক-একটা কালো ডুমুরের মতন।

পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছেন ভদ্রলোক। চেঁচানি শুনে লাও মেয়ে আর পুরুষটা চুপড়ি-টুপড়ি ফেলেই দৌড়ে এসেছে আমাদের সঙ্গে। ওরাও বোসবাবুর নৃত্য উপভোগ করছে। মিটিমিটি হাসছে।

"বাঁচান! বাঁচান! খেয়ে ফেললে!"

নস্যির ডিবে বের করল ইন্দ্রনাথ। একটিপ নস্যি নিতে-নিতে তৃপ্ত স্বরে বললে, "দূর মশাই, আপনি কি, ও তো মাকড়সা।"

"মা...মা...মানে? ওঃ! ওঃ! ওঃ!"

"তা আপনার গায়ে উঠল কেন?"

"পান্না-বুদ্ধ! পান্না-বুদ্ধ!"

এইবার ইন্দ্রনাথের চোখে ঝিলিক দেখা গেল। লাও মেয়ে-পুরুষটার দিকে তাকিয়ে স্রেফ বাংলায় এক ধমক মেরে বলে উঠল, "হাঁ করে দেখছিস কী? আগুন জ্বালা!" বলে, নিজেই শুকনো কাঁটাগাছ উপড়ে এনে ফস করে দেশলাই জ্বেলে তাতে আগুন লাগিয়ে আগুন-ধরা কাঁটাগাছ দুলিয়ে গেল বোসবাবুর পা থেকে মাথা পর্যন্ত।

টুপটুপ করে খসে পড়ল গুটলি-গুটলি কালো মাকড়সাবাহিনী। পোকা নয় বলেই আটঠেঙে এই প্রাণীদের বুদ্ধি নিশ্চয় আছে। তাই 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' নীতি অনুসরণ করে চোঁচা দৌড় মারল মাটির একটা গর্তের দিকে। দেখতে-দেখতে যেন একটা কালো কালির স্রোত নেমে গেল গর্তের ভেতরে। নিঃশব্দে, অবিশ্বাস্য বেগে অদৃশ্য হয়ে গেল গা-ঘিনঘিনে অষ্টপদ ভয়ঙ্কররা।

বোসবাবু ধড়াস করে পড়ে গেলেন মাটিতে। চোখ কপালে তুলে গোঁ-গোঁ করে উঠলেন, "জল! জল!" প্রথমে বললেন বাংলায়, তারপর লাও ভাষায়। নিশ্চয় জলই চেয়েছিলেন, তাই লাও মেয়ে আর পুরুষটা নক্ষত্রবেগে দৌড়ল জল আনতে।

চোখের আড়ালে ওরা যেতে-না-যেতেই তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন বোসবাবু। চক্রান্তকারীর মতো গলার স্বর খাদে নামিয়ে এনে বললেন ফিসফিস করে, "পান্না-বুদ্ধ! পান্না-বুদ্ধ!"

"কোথায়?" ইন্দ্রনাথের প্রশ্ন একটাই।

"মাকড়সাদের গর্তে!"

"আপনি দেখেছেন?"

"ছবি দেখেছি, মাথার মধ্যে। হাত ঢোকাতেই ব্যাটারা পিলপিল করে বেরিয়ে এসে..."

থেমে গেলেন বোসবাবু। জল নিয়ে দৌড়ে আসছে লাও মেয়ে আর ছেলেটা। কাছে আসতেই ওদের হাত থেকে মাটির কুঁজোটা কেড়ে নিয়ে ঢকঢক করে জল খেলেন বোসবাবু। কুঁজো বাড়িয়ে দিলেন আমাদের দিকে, "খাবেন?"

নীরস স্বরে বললে ইন্দ্রনাথ, "না।"

কুঁজো ফিরিয়ে দিয়ে লাও ভাষায় তেরিমেরি করে বোসবাবু যা বললেন, নিশ্চয় তার বাংলা মানেটা এই, "যা পালা!"

তা পালিয়েই গেল ওরা।

আমরা এখন মাকড়সার গর্ত ঘিরে দাঁড়িয়ে আছি। তিনজনের হাতেই শুকনো কাঁটাগাছের আঁটি। ইন্দ্রনাথের হাতে দেশলাই।

কাঠি জ্বলল। একে-একে জ্বলে উঠল তিনটে আঁটি। ইন্দ্রনাথ বললে, "এক, দুই, তিন।" তিন বলার সঙ্গে-সঙ্গে তিনজনেই মশাল তিনটে গর্তের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়ে তিনলাফে সরে এলাম অনেকটা দূরে।

গর্তের মুখটা বেশ বড়। একটা মানুষ গলে যেতে পারে অনায়াসে। ভেতরে কাদামাটি, বালি, কাঁকর, কিচ্ছু নেই। কত গভীর, তা জানতে হলে গর্তের কিনারায় যেতে হবে বলে সে চেষ্টাও কেউ করিনি। তবে বেশ গভীর নিঃসন্দেহে। তিন-তিনটে মশালের ঝপ করে আছড়ে পড়ার শব্দটা শুনলাম সেকেন্ড কয়েক পরে। তারপরেই গলগল করে ধোঁয়া বেরিয়ে এল গর্ত দিয়ে। সেই সঙ্গে পিলপিল করে কালো মাকড়সাদের স্রোত।

আরও খানিকটা দূরে সরে গেলাম। দূর থেকেই যখন দেখলাম আর একটাও মাকড়সা বেরোচ্ছে না গর্ত থেকে, প্রথমেই লাফ মেরে এগিয়ে গেলেন বোসবাবু। ওঁর ট্যাঁকে যে একটা সরু টর্চ গোঁজা ছিল, তা জানতাম না। গর্তের কিনারায় হুমড়ি খেয়ে পড়েই টর্চ মেরে চেঁচিয়ে উঠলেন, "এই যাঃ!"

ততক্ষণে আমরা পৌঁছে গেছি কিনারায়। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে দেখছি গর্তের তলদেশ। সেখানে রয়েছে একটা মাটির জালা।

শূন্য জালা। ভেতরে কিছু ছিল, এখন নেই। কিছু অগ্নিদগ্ধ মাকড়সা আট পা গুটিয়ে উলটে পড়ে রয়েছে তলায়।

বজরায় উঠে মুখখানা উৎকট গম্ভীর করে বসে রইলেন বোসবাবু। কথা বলতে গেলেই খ্যাঁক করে উঠছেন দেখে ইন্দ্রনাথকে নিয়ে আমি সরে এলাম অন্যদিকে। বললাম চাপা গলায়, "খটকা লাগছে একটা ব্যাপারে।"

"যথা?" ইন্দ্রনাথের চোখে নাচছে হাসি।

"চড়াটা জলের তলায় ছিল অ্যাদ্দিন?"

"ছিল।"

"জল থেকে উঠেছে এই কিছুদিন?"

"উঠেছে।"

"গর্তের মধ্যে কাদামাটি, বালি, কাঁকর থাকা উচিত ছিল না কি?"

"উচিত ছিল।"

"কিন্তু তা নেই কেন?"

"কেউ এসে চেটেপুটে রেখেছে বলে।"

"সে কে?"

"চুপ করে যা, মৃগ। আর বকিসনি!"

চুপ করেই গেলাম। শুধু বুঝলাম, বোসবাবু জবরদস্ত সাইকিক। খুঁজে-খুঁজে ঠিক জায়গাতেই এসেছিলেন। গর্তের জালায় নিশ্চয় কিছু ছিল, তার দামও অনেক। তাই আমাদের আগেভাগে কোনও মূর্তিমান এসে মাকড়সাদের তাড়িয়ে মাটি খুঁড়ে জালা সাফ করে রেখে গেছে।

সে কে?

কলসি-মাঠের গুপ্তধন

রোখ চেপেছে বোসবাবুর। চাহনিও যেন কীরকম-কীরকম। চোখের মধ্যে থেকে যেন আর-এক চোখ কটমট করে চেয়েছে। এই কি ওঁর অদৃশ্য চোখ?

উনি এখন তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন আমাকে আর ইন্দ্রনাথকে। সোনার চড়া থেকে নৌকো ফিরিয়ে এনে জিপ ভাড়া নিয়েছেন। ওঁর ইচ্ছে ছিল, সেই রাতেই বেরিয়ে পড়া। কিন্তু বেঁকে বসেছিল ইন্দ্রনাথ। বিদেশ বিভুঁইয়ে অজানার অভিযানে রাতে বেরনো সমীচীন নয়। ফলে ভদ্রলোক সারারাত ছটফট করেছেন। এ হোটেলে আর ঘর না থাকায়, একটা ঘরেই রাত কাটিয়েছি তিনজনে। সমস্ত রাত ঘুমের ঘোরে উনি চেঁচিয়ে গেছেন লাও ভাষায়, তর্জন-গর্জন করেছেন, এই মারেন কি সেই মারেন করে রাত ভোর করে দিয়েই আমাদের ঠেলে তুলেছেন, "চলুন, চলুন, কলসি-মাঠে এবার হানা দেওয়া যাক।"

কোনওমতে কলঘর থেকে বেরিয়ে ধড়াচূড়া পরতে-পরতেই নেমে এসে উঠে পড়েছি জিপে। উর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে চার চাকার যন্ত্রযান। এবং সেই প্রথম সটান প্রশ্ন করেছে ইন্দ্রনাথ, "মশাই কি এবার বলবেন, কোথায় যাচ্ছেন?"

জুলজুল করে তাকিয়ে বোসবাবু বলেছেন, "বলতে কি বাকি রেখেছি?"

"কিস্‌সু বলেননি। শুধু কলসি-মাঠ, কলসি-মাঠ বলে চেঁচাচ্ছেন।"

"ও হো! মাথার ঠিক নেই সার। পাগল-পাগল মনে হচ্ছে নিজেকে।"

মনে-মনে আমি বললাম, 'খাস পাগল তুমি! বদ্ধ পাগল, উন্মাদ কোথাকার! সাইকিক না ঘেঁচু! খুবই লটঘটে কেস!'

মুখে কুলুপ এঁটে রইলাম ইন্দ্রনাথের দাবড়ানির ভয়ে।

বোসবাবু বলে গেলেন, "ওই জালাটা দেখেই হঠাৎ মাথার মধ্যে খেলে গেল একটা আইডিয়া।"

"কিসের আইডিয়া?"

"ইন্দ্রনাথবাবু, এমন একটা জায়গায় আপনাদের এখন নিয়ে যাচ্ছি যা দু'হাজার বছর ধরে অনেক রহস্য সৃষ্টি করে রেখেছে। অনেক পণ্ডিতকে ভাবিয়ে তুলেছে, কিন্তু কেউই আজ পর্যন্ত সেগুলোর সমাধান করতে পারেনি। দিন, নস্যি দিন।"

নস্যির ডিবে বাড়িয়ে দিয়ে বললে ইন্দ্রনাথ, "দু'হাজার বছরের রহস্য?"

"আজ্ঞে।" শব্দ করে নস্যি নিলেন বোসবাবু, "লাওসের ঠিক মাঝখানের উপত্যকায় দু'হাজার বছর ধরে রয়েছে অগুনতি জালা। বালিমাটি দিয়ে তৈরি বিশাল-বিশাল কলসি। এত কলসি কারা বানিয়েছে, কেন বানিয়েছে, তা কেউ হাজার গবেষণা করেও আঁচ করে উঠতে পারছে না। আমরা যাচ্ছি সেইখানেই।"

"কলসি-মাঠে গুপ্তধনের খোঁজে?"

"আজ্ঞে। আমার মন বলছে, পান্না-বুদ্ধদের লুকিয়ে রাখা হয়েছে ওই কলসিগুলোর মধ্যে," বলতে-বলতে চোখ জ্বলে উঠল বোসবাবুর।

পাগলের চাহনি মনে হচ্ছে?

আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি কলসি-মাঠে।

এ-এক আশ্চর্য প্রান্তর। আমার চোখে তা অপূর্ব। ধু-ধু ধূসরাভা আর সবুজাভা মেশানো মূর্তিমান নির্জনতা যদি কিছু থাকে, তবে তা এই কলসি-মাঠ। মানুষসমান উঁচু-উঁচু ঘাস কোথাও রোদে জ্বলে হলুদ হয়ে নেতিয়ে পড়েছে, কোথাও সতেজ সবুজ আকারে মাথা উঁচিয়ে হাওয়ায় দুলছে। উঁচু-নিচু এবড়ো-খেবড়ো প্রান্তরের বহু দূরে ধূসর ন্যাড়া টিলার পর টিলা। গাছপালার চিহ্ন নেই কোথাও। অতিকায় কলসিগুলোকে তাই আরও দানবিক মনে হচ্ছে।

প্রত্যেকটা কলসি আটফুট উঁচু। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা। হাইটে গরমিল নেই কোথাও। এ-পর্যন্ত যত কলসির হাইট মেপেছি, সবই পাক্কা আটফুট উঁচু। মুখের বেড় প্রত্যেকের ছাব্বিশ ফুট। এ-মাপেও হেরফের নেই এক ইঞ্চিও। যে ক'টার মুখের মাপ নিতে পেরেছি কলসির মাথায় চেপে, সবক'টাই পাক্কা ছাব্বিশ ফুট।

একটা কলসির মাথায় দাঁড়িয়ে দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তরভরা কলসি-সমারোহের দিকে তাকিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেছি। এ কী পাগলামি, না, উদ্ভট পরিকল্পনামাফিক অবিশ্বাস্য সৃষ্টির প্রয়াস? যতদূর চোখ যায়, একই মাপের কলসি দূর হতে দূরে মিলিয়ে গেছে। দেখতে তাদের উনুনের মতো চৌকোনো। গায়ে শ্যাওলা আর রকমারি বুনো ফুল। কোনওটা ভেঙে পড়েছে, কোনওটা আস্ত রয়েছে। দু'হাজার বছরের বিস্ময়কে নিজের বুকে ধরে রেখে অটুট রয়েছে।

চেয়ে থেকেছি অবাক বিস্ময়ে, আর মাথার মধ্যে ধ্বনিত হয়েছে বোসবাবুর মায়ের শেষ কথাটা, "কলসির মাঠে দৈত্যদের উনুন··· কলসির মাঠে দৈত্যদের উনুন!"

বিমূঢ়ভাবে নেমে এসে ইন্দ্রনাথের সামনে দাঁড়াতেই ও তাকাল বোসবাবুর দিকে, "কোথায় আছে গুপ্তধন?"

বোসবাবু তখন মাথা চুলকোচ্ছেন। অগুনতি কলসি দেখে ঘাবড়ে গেছেন বোঝাই যাচ্ছে। হাঁ করেছিলেন জবাবটা দেবেন বলে, তার আগেই দুম্ করে একটা আওয়াজ হল। প্রান্তরের ওপর দিয়ে দিকে-দিকে ছড়িয়ে গেল সেই আওয়াজ। চমকে আওয়াজের উৎসের দিকে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখলাম, দূরের একটা বিশাল জালার পেট ফেটে চৌচির। পাকসাট খেতে-খেতে কী একটা জিনিস তার ভেতর থেকেই ঠিকরে যাচ্ছে ওপর দিকে। অনেক উঁচুতে উঠেই আবার সেটাও ফেটে গেল দমাস্ করে। একতাল সাদা ধোঁয়া আর আগুনের ঝলক থেকে চারপাশে ছড়িয়ে গেল কুচো কাগজ।

জালার ভূত

"শেরপা থুঙ! শেরপা থুঙ!" কানের কাছে অকস্মাৎ বিকট চিৎকারে ভয়ানক চমকে উঠলাম। বোসবাবু তখনও উন্মাদের মতোই চোখ ঠেলে বের করে চেঁচিয়ে যাচ্ছেন, "শেরপা থুঙ! বদমাশ, এখানেও ঠিক এসেছে। লুটে নিয়ে গেল··· লুটে নিয়ে গেল আমার পান্না-বুদ্ধ!"

আমি তক্ষুনি ডাইনে-বাঁয়ে সামনে-পেছনে ঘুরে-ঘুরে চেয়ে ছিলাম শেরপা থুঙ নামক সেই বিভীষিকাময় প্রাণীটির সন্ধানে। যাকে আজ পর্যন্ত চোখে দেখিনি, কিন্তু যার অবর্ণনীয় পৈশাচিক কাণ্ডকারখানার অনেক বর্ণনা শুনেছি বোসবাবুর মুখে।

কিন্তু কোথায় সেই আপদ? নীল আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে কুচো কাগজ, উড়ে যাচ্ছে হাওয়ায় ধোঁয়ার সঙ্গে-সঙ্গে।

চোখ পড়ল ইন্দ্রনাথের চোখের ওপর। দু'হাত পেছনে মুঠি পাকিয়ে ধরে সে নির্নিমেষে চেয়ে রয়েছে ফেটেফুটে যাওয়া দানবাকার কলসিটার দিকে। হাওয়ায় তার কোঁচা লটপট করছে, পাঞ্জাবির কোণ উড়ছে, মাথার লম্বা চুল চোখে-মুখে-কপালে লেপটে যাচ্ছে। ইন্দ্রনাথ সুপুরুষ, ইন্দ্রনাথ নিখাদ বাঙালি, ইন্দ্রনাথ সুপ্ত বলিষ্ঠতার রহস্যময় আধার। কলসি-মাঠের খাঁ-খাঁ প্রান্তরে ওকে আজ আরও সুন্দর,

আরও ব্যক্তিত্বময় লাগছে।

আমি বললাম, "ইন্দ্র, ও কী ?"

"দো-বোমা, একটু বড় সংস্করণ," স্বপ্নিল চোখে তাকিয়ে থেকে বললে ইন্দ্রনাথ।

"কে ফাটাল ? শেরপা থুঙ ?"

চোখের স্বপ্ন কেটে গেল নিমেষে। ঘুরে দাঁড়িয়ে হাসল ইন্দ্রনাথ। বললে, "বোসবাবু এখন সর্বত্র শেরপা থুঙকে দেখছেন।"

অমনি তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে বললেন বোসবাবু, "বললেই হল ? বললেই হল ? বলুন, তবে কে ফাটাল দো-বোমা ? কে উড়িয়ে দিল কলসি ?"

কথা শেষ হতে-না-হতেই ডান দিকে আবার একটা বিস্ফোরণ ঘটল। থরথর করে কেঁপে উঠল পায়ের তলার মাটি। রাশিরাশি মাটি আর ঘাস ছিটকে গেল শূন্যে। ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি দূরে মিলিয়ে যেতে-না-যেতেই আবার একটা বিস্ফোরণ ঘটল ডান দিকে।

এবার আর কলসি ফাটছে না, মাটির মধ্যে বোমা ফাটছে !

ভয় পেলাম প্রচণ্ড। আমার চাইতেও বেশি ভয় পেয়েছেন বোসবাবু। কাঁপছেন ঠকঠক করে।

ঠিক এই সময়ে জিপের ড্রাইভার দৌড়ে এল ওপরে। তাকে নীচে অনেক দূরে রেখে এসেছিলাম। হাউমাউ করে সে যা বললে, বোসবাবুর তর্জমায় তার মানেটা এই গত যুদ্ধের অনেক বোমা এখানেও রয়েছে আ-ফাটা অবস্থায়। একটার পর একটা ফেটে চলেছে সেইগুলোই।

পায়ের চাপেই ফেটে যেতে পারে ...সুতরাং...সুতরাং আমরা পালিয়ে এলাম।

রাত নিশুতি। সারাদিনের অভিযানে জিপের নাচুনি আর ঝাঁকুনিতে জান কয়লা হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। গায়ে-গতরে ব্যথা। দুটো ট্যাবলেট খেয়ে শুয়ে পড়েছিলাম। মড়ার মতো ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তক্ষুনি।

ঠেলে তুলে দিয়েছিল ইন্দ্রনাথ। ঘর অন্ধকার। চোখ মেলে অন্ধকারেই বুঝলাম, ইন্দ্রনাথ ঝুঁকে পড়েছে আমার ওপর।

কানের কাছে বললে আস্তে-আস্তে, "উঠে পড়, বেরোতে হবে।"

আচমকা ঘুম ভাঙলেও এসব পরিস্থিতিতে চমকে না-ওঠাটা গা-সওয়া হয়ে গেছে। কম অ্যাডভেঞ্চার করিনি আমার এই পাগলা বন্ধুটির সঙ্গে। সহজভাবেই তাই বললাম, "কেন ? কোথায় ?"

ও বললে, "বোসবাবু এক্ষুনি বেরিয়ে গেলেন।"

এবার কিন্তু ধড়মড় করে উঠে বসলাম, "সে কী !"

"চলে আয়, চলে আয়, চটপট !"

একটা ঘরেই পাশাপাশি তিনটে খাটে শোবার ব্যবস্থা হয়েছিল এই হোটেলে, আগেই তা বলেছি। একটা খাট খালি, বোসবাবু উধাও হয়েছেন।

কোনওরকমে ধড়াচূড়া এঁটে দৌড়ে নেমে এলাম ইন্দ্রনাথের পেছন-পেছন। একতলার রিসেপশন কাউন্টারের ক্লার্ক একটা পেপারব্যাক উপন্যাস পড়ছিল। ইংরেজিতে শুধোল ইন্দ্রনাথ, "মিঃ বোস এক্ষুনি বেরোলেন ?"

"ও ইয়েস।"

"কোথায় ?"

"টুওয়ার্ডস দ্য প্লেন অব জার।" অর্থাৎ কলসি-মাঠের দিকে।

"কোনও গাড়ি নিয়ে গেলেন ?"

"হোটেল-জিপ।"

"আর একটা জিপ হবে ?"

"ও ইয়েস।"

আমরা রাত্রি-নিশীথে চলে এলাম কলসি-মাঠের নির্জনতায়।

কলসি-মাঠ জায়গাটা রাস্তা থেকে ভেতর দিকে পাহাড়ি উপত্যকার ওপর। বেশ খানিকটা হেঁটে যেতে হয়। তারপর পাথর টপকে-টপকে ওপরে উঠতে হয়। দিনের বেলাতেই কালঘাম ছুটে গেছিল। রাতের অন্ধকারে এ-কাজ করতে হবে ভেবেই হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল। কিন্তু ইন্দ্রনাথের শক্ত চোয়াল আর কঠোর চোখ দেখে ট্যাঁ-ফুঁ করিনি।

বিশাল একটা গোল পাথরের আড়ালে হোটেলের আগের জিপটা দাঁড়িয়ে ছিল। একগাল হেসে ড্রাইভার আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল কোন পথ দিয়ে গেছেন বোসবাবু।

আমরাই গেলাম সেই পথে।

জালার পর জালাগুলো অতিকায় দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে ছিল দিগন্ত পর্যন্ত। তারার আলোয় এ-মাঠের দৃশ্য যে এত স্পষ্ট দেখা যাবে, তা তো ভাবিনি। প্রত্যেকটা দানবিক কলসিকে এক-একটা জমাট নিরেট ছায়া বলেই মনে হচ্ছে। নিঝুম রাতে তাদের বিদঘুটে আকৃতিগুলোই গা কাঁপিয়ে তোলার পক্ষে যথেষ্ট।

জোর হাওয়া বইছে। মানুষ-সমান পেল্লায় ঘাসগুলো নুয়ে-নুয়ে পড়ছে। আর সেই সঙ্গে প্রান্তর জুড়ে অপার্থিব খসখস মড়মড় আওয়াজ হয়েই চলেছে। মাথার ওপরে কোটি-কোটি ঝকঝকে নক্ষত্র বোবা বিস্ময়ে যেন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে কলসি-মাঠের অজানা বিভীষিকাকে।

অজানা বিভীষিকা নিঃসন্দেহে। কেননা, আমরা দুই মূর্তি বেড়ালের মতো নিঃশব্দে পাথর টপকে-টপকে ওপরে উঠে আসতেই স্পষ্ট শুনলাম ডান দিকে একটা অমানুষিক অট্টহাসি। বুকটা ধড়াস করে উঠতেই অনেক দূরে প্রান্তরের শেষের দিকে একটা পৈশাচিক আকৃতি আলোর দেহ নিয়ে ভেসে উঠল শূন্যে। শূন্যেই একটু-একটু করে অন্ধকারে ভরে গেল তার আলোর দেহ।

আর তার ঠিক পরেই সামনের বড় কলসিটার মাথার ওপরে ঝলসে উঠল একটা আলো, উঁকি দিল একটা মুণ্ড। নরমুণ্ড নিঃসন্দেহে, আলোর আভায় সেটুকু দেখেছি স্পষ্ট, পরক্ষণেই তার পাশের জালার বিশাল পেট থেকে একটা প্রকাণ্ড দানো দুলে-দুলে উঠে এল বাইরে। তার বিশাল পেট, চর্বিঝোলা ইয়াব্বড় মুখ ও লিকলিকে হাত আর পা থেকে টস্‌টস্ করে ঝরে পড়ছে তরল আগুন !

আবার সেই অমানুষিক অট্টহাসি। প্রান্তরের দিকে-দিকে ছড়িয়ে গেল সেই রক্তজলকরা হাসি। হাসির দমকে-দমকে দুলে-দুলে ফুলে-ফুলে উঠল কলসির মাথায় পিশাচমূর্তি।

আর বুকফাটা আর্তনাদ করে এদিককার কলসির মাথা থেকে ঠিকরে এল নরমুণ্ডের মালিক !

আমাদের বোসবাবু ! হাতে তাঁর জ্বলন্ত টর্চ !

সাপের বিছানা

আবার আমরা উড়ে চলেছি আধুনিক পুষ্পকরথে চেপে। গোমড়া মুখে জানলার পাশেই বসে আছেন বোসবাবু। তাঁর দিকে খরনজর রেখেছি আমি। লোকটাকে আর বিশ্বাস নেই। উড়ন্ত প্লেন থেকেও লাফিয়ে পড়তে পারেন। মাথায় ছিট আছে, এ-বিশ্বাস আমার মাথায়

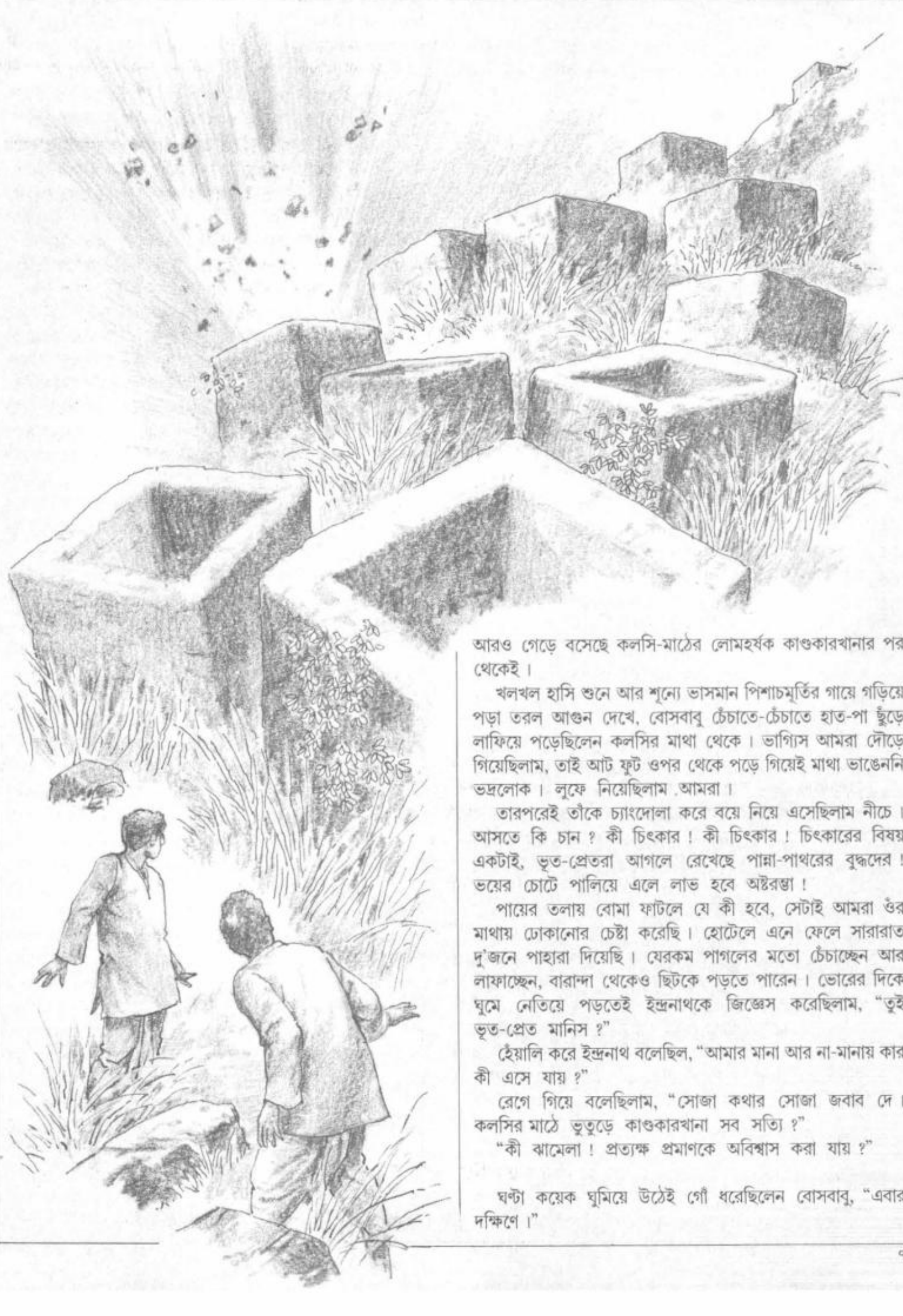

আরও গেড়ে বসেছে কলসি-মাঠের লোমহর্ষক কাণ্ডকারখানার পর থেকেই।

খলখল হাসি শুনে আর শূন্যে ভাসমান পিশাচমূর্তির গায়ে গড়িয়ে পড়া তরল আগুন দেখে, বোসবাবু চেঁচাতে-চেঁচাতে হাত-পা ছুঁড়ে লাফিয়ে পড়েছিলেন কলসির মাথা থেকে। ভাগ্যিস আমরা দৌড়ে গিয়েছিলাম, তাই আট ফুট ওপর থেকে পড়ে গিয়েই মাথা ভাঙেননি ভদ্রলোক। লুফে নিয়েছিলাম আমরা।

তারপরেই তাঁকে চ্যাংদোলা করে বয়ে নিয়ে এসেছিলাম নীচে। আসতে কি চান ? কী চিৎকার ! কী চিৎকার ! চিৎকারের বিষয় একটাই, ভূত-প্রেতরা আগলে রেখেছে পান্না-পাথরের বুদ্ধদের ! ভয়ের চোটে পালিয়ে এলে লাভ হবে অষ্টরম্ভা !

পায়ের তলায় বোমা ফাটলে যে কী হবে, সেটাই আমরা ওঁর মাথায় ঢোকানোর চেষ্টা করেছি। হোটেলে এনে ফেলে সারারাত দু'জনে পাহারা দিয়েছি। যেরকম পাগলের মতো চেঁচাচ্ছেন আর লাফাচ্ছেন, বারান্দা থেকেও ছিটকে পড়তে পারেন। ভোরের দিকে ঘুমে নেতিয়ে পড়তেই ইন্দ্রনাথকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "তুই ভূত-প্রেত মানিস ?"

হেঁয়ালি করে ইন্দ্রনাথ বলেছিল, "আমার মানা আর না-মানায় কার কী এসে যায় ?"

রেগে গিয়ে বলেছিলাম, "সোজা কথার সোজা জবাব দে। কলসির মাঠে ভুতুড়ে কাণ্ডকারখানা সব সত্যি ?"

"কী ঝামেলা ! প্রত্যক্ষ প্রমাণকে অবিশ্বাস করা যায় ?"

ঘণ্টা কয়েক ঘুমিয়ে উঠেই গোঁ ধরেছিলেন বোসবাবু, "এবার দক্ষিণে।"

"সেটা কোন চুলোয় ?" বলেছিলাম কাঠখোট্টা গলায়।

"কথার ধরন শুনলে গা জ্বলে যায়," খ্যাঁক করে উঠেছিলেন বোসবাবু, "দক্ষিণ মানে যমের দক্ষিণ দুয়ারে নয় মশাই, লাওসের দক্ষিণে।"

"কেন ?"

"আঃ গেল ! এসেছি কেন এখানে ? বুদ্ধ··· বুদ্ধ··· পান্না-বুদ্ধ রয়েছে দক্ষিণে··· পষ্ট টান অনুভব করছি মনের মধ্যে !"

"শিকেয় তুলে রাখুন আপনার মনের টানকে," তিড়বিড়িয়ে উঠেছিলাম আমি, "রাত-বিরেতে ভূতের মাঠে মরতে গেছিলেন কি মনের টানে ?"

"তা ছাড়া আবার কী ? কে যেন মনের মধ্যে বললে, 'ওরে আয় ! ওরে আয় ! ওরে আয় !' তাই তো ছুটলাম।"

"তারপর কলসির মাথা থেকে লাফিয়ে পড়লেন ?"

"লাফিয়ে তো পড়িনি !"

"তবে···"

"ঠেলে ফেলে দিল।"

"কে ?"

চোখ-মুখ কেমন যেন হয়ে গেল বোসবাবুর, "তাদের দেখা যায় না মৃগাঙ্কবাবু !"

আমরা এসে গেছি এখন লাওসের দক্ষিণ অঞ্চলে। কেন যে এই অঞ্চলকে নিয়ে কবিরা এত কলম চালনা করেন, আকাশ থেকেই তা মালুম হচ্ছে আমার। গোটা চাম্পাসাক প্রদেশটাকে প্রকৃতিদেবী যেন নিজের হাতে মনের মতো করে সাজিয়েছেন। এত সৌন্দর্য বাংলা ছাড়া আর কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। রুট থার্টিন সড়কের সেতুগুলো যে নতুন তৈরি, তা এত উঁচু থেকেও বেশ বোঝা যাচ্ছে। বোসবাবুর মনমরা ভাবটাও কমেছে। বিড়বিড় করে জ্ঞান দিয়ে গেলেন আমাকে, "সোভিয়েত দেশ আর পুব জার্মানির টাকায় তৈরি সেতু মশাই। এই গেল আপনার রুট থার্টিন। ওই দেখুন রুট নাইন। দুটো ভাগ হয়ে গেছে, দেখেছেন ?"

"দেখতেই তো পাচ্ছি," মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থেকে বলেছিলাম।

"একটা রাস্তা গেছে সোজা পুব দিকের ভিয়েতনামে, আর-একটা দক্ষিণ চিন সাগরে।"

"রাস্তায় পিচ ঢালাই চলছে এখনও ?"

"চলছে গত-বছর থেকেই, খুবই গুরুত্বপূর্ণ সড়ক মৃগাঙ্কবাবু। রাশিয়া থেকে পেট্রল আসছে এই রাস্তায়। লাও কাঠের গুঁড়ি যাচ্ছে রাশিয়ায়।"

"মেকং নদী এখানে এত চওড়া ?"

"পাক্কা এক মাইল চওড়া। ভাবতে পারেন ?"

ভাবাটা সত্যিই শক্ত। মেকং যেখান থেকে শুরু হয়েছে, সেখানে সোনার চড়া দেখে এসেছি। সেখানে তার এক রূপ, ক্ষীণ, কিন্তু বন্য। এখানে বিশাল এবং ঢলঢলে। চোখ জুড়িয়ে যায়।

এই মেকং নদীর বুকেই শুরু হল আমাদের শেষের অভিযান। এবং সেই অভিযানের শেষে যে এত পিলে চমকানো ব্যাপার ছিল, তা কল্পনাও করতে পারিনি।

নৌকোয় চাপার আগে থেকেই বোসবাবুর মাথার পোকা নতুন করে নড়ে উঠেছিল। প্লেন থেকে নেমেই চিংড়ি মাছের মতো লাফাতে লাগলেন, "জলদি ! জলদি ! শেরপা থুঙের আগেই পৌঁছতে হবে।"

"কোথায় আপনার শেরপা থুঙ ?" কড়া গলায় বলেছিলাম আমি, "প্লেনে কোনও শেরপাকে দেখিনি।"

"মৃগাঙ্কবাবু, আপনি কি মনে করেন, আপনাকে চেনা দেবার জন্য শেরপা থুঙ শেরপার চেহারা নিয়ে প্লেনে উঠেছিল ? সে ছদ্মবেশী বহুরূপী।"

"আপনি চিনেছেন ?"

"চিনতেই যদি পারব, তা হলে তাকে বহুরূপী বলব কেন ?"

বাধা দিয়ে ইন্দ্রনাথ বলেছিল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে। এখন কোথায় যাবেন ?"

"যাব যেখানে, সেখানে সোজা পথে যাব না।"

"মানে ?"

"মানে, একটু ঘুরে যাব।"

"তাই ঘুরুন না, কিন্তু দয়া করে বলুন, কিসে চাপবেন ?"

"হাতিতে।"

হ্যাঁ, হাতিতেই চেপেছি আমরা। মেকং নদীর দক্ষিণ তীরে যে বিশাল জঙ্গল, হাতি চলেছে সেই পথে। মাহুতকে বোসবাবুই বুঝিয়ে দিয়েছেন, কোথায় যেতে হবে। গদাইলশকরী চালে ঝোপঝাড় মাড়িয়ে হাতি মহাশয় চলেছে সেই দিকেই। একই হাওদায় পিঠে পিঠ দিয়ে বসে আছি তিনজনে। খুশিতে বোসবাবুর প্রাণ এখন গড়ের মাঠ। তিনি বলছেন, "জানেন মৃগাঙ্কবাবু, এই জঙ্গলে অনেক ভাল-ভাল খাবার পাওয়া যায়।"

"খিদে পেয়েছে মনে হচ্ছে ?" দাঁতে দাঁত চেপে বলেছিলাম। হাতি চললে যে এত দোলে, তা জানলে হাতির পিঠে আমাকে কেউ তুলতে পারত না। বমি না করে ফেলি !

"খিদে ? পেলেও সে খাবার আপনি-আমি খেতে পারব না।"

"আমি না পারলেও আপনার অখাদ্য কিছু আছে বলে তো মনে হয় না।"

"হাঃ হাঃ হাঃ ! তা যা বলেছেন ! হাজার হলেও এইসব অঞ্চলেই আমার মা বড় হয়েছেন। শূকর আর হরিণ তবুও গিলতে পারি ; পাইথন পেটে ঢোকে না।"

"পাইথন ?"

"এখানকার লোকের বড় প্রিয় খাদ্য, দেদার পাওয়া যায় এই জঙ্গলে। ওই এসে গেছে হাতিদের গ্রাম।"

"হাতিদের গ্রাম ?" দূর থেকে খানকয়েক পাতায় ছাওয়া কুঁড়েঘর দেখতে পেলাম। "হাতিদের তৈরি ঘর নাকি ?"

"দূর মশাই ! হাতি কি ঘর বানায় ? হাতি যারা ধরে, কাঠ বইতে ট্রেনিং দেয়, তারপর চড়া দামে বেচে দেয়, এ-ঘর তাদের তৈরি।"

"ও ! নাম কী গ্রামটার ?"

"ফাফো।"

"খাসা নাম। চলুন, হাতি-ধরিয়েদের মুখেই হাতি ধরার গল্প শোনা যাক। পিঠের শিরদাঁড়াটাকে একটু জিরেন দেওয়াও হবে।"

"আজ্ঞে না। দেরি হয়ে যাবে। তা ছাড়া, ওরা এখন জঙ্গলে। বাচ্চা হাতি ধরে এনে যখন বড় করবে, তখন আসবেন'খন। এই··· এই···" বলেই মাহুতকে গড়গড় করে লাও ভাষায় কীসব বলে গেলেন বোসবাবু। হাতি অমনি বাঁয়ে ঘুরে আরও গভীর জঙ্গলের মধ্যে মড়মড় করে ডালপালা ভেঙে ঢুকে পড়েই থমকে দাঁড়িয়ে গেল এক টুকরো খোলা জমির সামনে।

হাওদায় বসে আমরা দেখলাম, রোদ এসে পড়েছে মাটির ওপর। সেখানে চিত হয়ে শুয়ে রয়েছে বিশালকায় এক পাথরের বুদ্ধ। মূর্তির বুকে, হাতে, পায়ে, কপালে এবং চারপাশে কিলবিল করছে অসংখ্য সাপ।

সবই কিন্তু পাথরের সাপ !

"নামুন ! নামুন ! নেমে পড়ুন !"

চমকে উঠেছিলাম বোসবাবুর চিৎকারে। মাহুতও হাতিকে বসাচ্ছে মাথায় ডাঙস মেরে। তাল সামলাতে না পেরে আর একটু হলে ঠিকরে যাচ্ছিলাম।

শক্ত হাতে ইন্দ্রনাথ চেপে ধরল আমাকে পেছন থেকে। হাতি ততক্ষণে নাগরদোলা দুলুনি বন্ধ করে বসে পড়েছে।

সড়াত করে হড়কে নেমে গিয়ে পাথরের সাপেদের দিকে দৌড়তে দৌড়তে তারস্বরে চেঁচাতে লাগলেন বোসবাবু, "আছে··· আছে··· এখানেই আছে··· আমার মন বলছে এখানেই আছে !"

আমাকে ধরে হাতির গড়ানে পিঠ থেকে নেমে এসে ইন্দ্রনাথ বললে, "কোথায় আছে ?"

এই প্রথম শুনলাম জলদগম্ভীর গলায় কথা বলছে ইন্দ্রনাথ। ভোজবাজির মতো শুধু ওর কণ্ঠস্বরই পালটায়নি, পালটেছে চোখ-মুখের চেহারাও। চোখে যেন হিরে জ্বলছে, চোয়াল হয়েছে শক্ত।

নিস্তব্ধ জঙ্গল গমগমে গলার আওয়াজের অদ্ভুত ধ্বনি আর প্রতিধ্বনির রেশ তুলে যেন আরও নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন বোসবাবু। আস্তে-আস্তে ঘুরে দাঁড়ালেন। দুই চোখ আশ্চর্য প্রদীপ্ত। সুস্থ লোকের চোখে এমন চাহনি তো দেখা যায় না।

উনি এখন দাঁড়িয়ে আছেন ইয়া মোটা একটা সাপের পিঠে পা তুলে দিয়ে। সাপের পিঠে পা ঠুকতে-ঠুকতে বললেন দাঁত কিড়মিড় করে, "এর তলায়··· এদের তলায়··· মাটি খুঁড়লেই···"

অবিশ্বাস্য কাণ্ডটা ঘটে গেল সঙ্গে-সঙ্গে। নড়ে উঠল পাথরের সাপ।

তীব্রস্বরে চিৎকার করে উঠল ইন্দ্রনাথ, "পাইথন ! পালান, বোসবাবু।"

পাইথনই বটে। ময়লা পাথরের পাইথনদের সঙ্গে গা মিলিয়ে অসাড়ে পড়ে ছিল একটা জ্যান্ত পাইথন। বোসবাবুর পায়ের আঘাতে সে ক্ষুব্ধ হয়েছে।

পর-পর তিনবার গুলিবর্ষণের শব্দ শোনা গেল পরমুহূর্তেই। করাল ময়ালের মাথা উড়ে গেল তিন-তিনটে বুলেটে।

আচ্ছন্নের মতো শুধু দেখলাম, ধূমায়িত রিভলভার হাতে হরিণের বেগে বোসবাবুর দিকে ছুটে যাচ্ছে ইন্দ্রনাথ।

গুলতির দানো

তরতরিয়ে নৌকো ছুটছে তীরের দিকে। মেকং নদী এখানে আরও চওড়া। এপার থেকে ওপার ঠাহর করা যায় না। তাই ওপার থেকে নৌকোয় চেপে বুঝতে পারিনি এপারের রাজারাজড়ার কাণ্ডকারখানা।

জঙ্গল থেকে বেরিয়েছি অক্ষত দেহে। গুলিবর্ষণের পরেও মৃত পাইথনের পাকসাটের মধ্যে নির্ঘাত মারা যেতেন বোসবাবু। মরা সাপ যে এত আছাড় খায়, কুণ্ডলি পাকায়, তা না-দেখলে বিশ্বাস করা যেত না। ধুলো উড়ছে, ঘাস টুকরো-টুকরো হয়ে উড়ে যাচ্ছে, লেজের ঝাপটায় ঠিকরে পড়েছেন বোসবাবু। পাথরের বুদ্ধ তাঁর মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল বলেই রক্ষে। ঝপ করে জ্ঞানহীন দেহটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে এঁকেবেঁকে পালিয়ে এসেছিল ইন্দ্রনাথ।

তারপর হাতির পিঠে চেপে এলাম নদীর ধারে। ততক্ষণে জ্ঞান ফিরে পেয়েছেন বোসবাবু। বিড়বিড় করে বকে যাচ্ছেন, "শয়তানে টেনেছিল··· ওঃ ! পাথরের সাপও জ্যান্ত হয়ে গেল ?"

ঠাণ্ডা গলায় বলেছিল ইন্দ্রনাথ, "আপনার ছোঁয়া পেয়েই জ্যান্ত হয়ে গেল। পান্না-বুদ্ধদের পাহারাদার তো !"

"কচু পাহারাদার ! পান্না-বুদ্ধ ওখানে নেই।"

"তখন যে বললেন, ওখানেই আছে !"

"ভুল, ভুল, শয়তানে ভুল করিয়েছে। পেছনে ভূত লেগেছে মশাই।"

"তা হলে, এবার দেশে ফেরা যাক ?"

"পাগল !"

"মানে ?"

"ওয়াট ফু, ওয়াট ফু, নদী পেরোলেই ওয়াট ফু।"

"হুঁ ! সেখানে কী ?"

চোখ কপালে তুলে বললেন বোসবাবু, "সে কী মশাই ? ওয়াট ফু সম্বন্ধে এত গাওনা গাইলাম, সব ভুলে গেলেন ?"

বিচিত্র হেসে ইন্দ্রনাথ বলেছিল, "আপনার গাওনা কিনা— মনে রাখা কঠিন। ফুঁ যাবেন ?"

"ফুঁ নয়, ফুঁ নয়, ফু, মানে মঠ। ওয়াট ফু লাওসের সবচেয়ে নামী মঠ। রাজার তৈরি বৌদ্ধ মঠ, দেখলে মুণ্ডু ঘুরে যাবে মশাই।"

"তাই নাকি ? কোন রাজার তৈরি ?"

"খমির রাজা, খমির রাজা, এখান থেকে ১৬৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে রাজত্ব ছিল যাঁদের।"

"১৬৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে !" ভুরু কুঁচকোয় ইন্দ্রনাথ, সেখানে তো আঙ্কোর রাজ্য।"

"হ্যাঁ··· হ্যাঁ···হ্যাঁ ! ঠিক জানেন, কিন্তু জানেন না মৃগাঙ্কবাবু। বলেছিলাম না, ওইখান থেকেই যত গণ্ডগোল ? কী কুক্ষণে বলে ফেলেছিলাম, ব্যাঙ্ককের আসল পান্না-বুদ্ধ ব্যাঙ্ককে নেই, আছে ওয়াট ফু-তে। সেই থেকে লাইফটাকে হেল করে ছাড়ল ব্যাটা শেরপা থুঙ।"

"তা হলে তো সেখানে যেতেই হয়।"

ওয়াট ফু মঠের ভগ্নদশা দেখলাম নদীর বুক থেকে। রাজাদের নজর ছিল বটে। এলাহি কাণ্ড করে ছেড়েছেন পাথর দিয়ে। আঙ্কোরভাটের মন্দির এখন জগদ্বিখ্যাত। সেই দেশের রাজারাই নাকি রাশিরাশি পাথর এনে নদীর ধার থেকে গড়ে তুলেছিলেন প্রকাণ্ড এই মঠ। বৌদ্ধ মঠ। আঙ্কোরভাটের হিন্দু মন্দিরের বিশালত্বকে ম্লান করার জন্য কী ?

ভেঙে-ভেঙে পড়ছে অতীতের বিস্ময়, কিন্তু আজও তা বিপুল বিস্ময় হয়ে জেগে রয়েছে চোখের সামনে। সাতশো ফুট লম্বা পাথরের সিঁড়ি ধাপে-ধাপে উঠে গেছে জলের কিনারা থেকে। দু' পাশে সারবন্দী অজস্র রঙিন ফুলের গাছ। সিঁড়ি উঠে গেছে বিশাল মন্দিরের পাদদেশে। মাঝে পড়ছে পটমণ্ডপ। তাদের গঠন এত সুন্দর যে, মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকতে হয়। নদীর বুক থেকে বিরাট এই সৃষ্টি দেখে স্তম্ভিত হয়ে শুধু ভেবেছি, এত মেহনত করেও তো শেষরক্ষা করা গেল না। মহাকাশ কুটিল হাসি হেসে ভেঙেচুরে একশা করে দিচ্ছে প্রতিটি পাথরকে।

আচমকা আমার দিবাস্বপ্ন খানখান হয়ে গেল বোসবাবুর ভাঙা কাঁসি বাজনার মতো খ্যানখেনে চিৎকারে। কানের কাছে বিশ্রী বিকটভাবে চেঁচিয়ে চলেছেন তিনি, "না, না, না !"

গোটা ওয়াট ফু তখন যেন দুলছে। আসলে দুলছে আমাদের নৌকো। আমি আধবোজা চোখে তন্ময় হয়ে চেয়ে ছিলাম সেই অপরূপ শোভার দিকে। এমন সময়ে কানের পরদা যেন ফেটে চৌচির হয়ে গেল বিতিকিচ্ছিরি চিৎকারে।

হাত বাড়ালেই ভূত

ভূতেরা কোথায় থাকে ?
এর উত্তরে ভূত-বিশ্বাসীরা কী বলবে বলো তো ? বরং তারা উল্টো প্রশ্ন করবে, ভূতেরা কোথায় না থাকে ? সত্যি বলতে কী, তর্ক করে এর কোনো মীমাংসা হবে না ।
কিন্তু একটা কথা সকলে স্বীকার করবে—সে তারা ভূতে বিশ্বাসী হোক, কিংবা হোক ভূতে অবিশ্বাসী—যে, একটা জায়গায় হাত বাড়ালেই ভূতের দেখা পাওয়া যায় ।
কোন্ জায়গা জানো ?
জায়গাটা হল, বইয়ের তাক ।
হ্যাঁ, বইয়ের তাকেই ভূত রয়েছে । শুধু একটু কাছে ডেকে নেওয়া । তাহলেই দেখবে, কেমন সুড়সুড় করে নানা ধরনের ভূত এসে ঠিক হাজির হবে । কেউ-বা আলেয়াভূত, কেউ-বা পাখিভূত, কেউ-কেউ ব্রহ্মদত্যি । কেউ নিপাট ভালমানুষ, কেউ খুব দুষ্টু । কোনো ভূত যদি অঙ্ক কষে দেয়, কোনো ভূত খুঁজে দেয় গুপ্তধন । আর এইসব নানান ধরনের নানান চেহারার নানান চরিত্রের ভূতেরা যেসব বইতে রয়েছে সেইসব বইয়ের নামগুলো তোমাদের জানিয়ে দিচ্ছি ।

পাঁচমুণ্ডির আসর ॥ হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় । ১০·০০
গোসাঁইবাগানের ভূত ॥ শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় । ১২·০০
ভুতুড়ে ঘড়ি ॥ শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় । ১০·০০
রাতের প্রহরী ॥ হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় । ২৫·০০
টেনিদা ও ভুতুড়ে কামরা ॥ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় । ১০·০০
সব ভুতুড়ে ॥ লীলা মজুমদার । ২০·০০
হেতমগড়ের গুপ্তধন ॥ শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ॥ ১০·০০
ভূতগুলো সব গেল কোথায় ॥ রমাপদ চৌধুরী । ২০·০০
তারিণীখুড়োর কীর্তিকলাপ ॥ সত্যজিৎ রায় ।
আঁধার রাতের অতিথি ॥ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় । ৮·০০
শিমুলগড়ের খুনে ভূত ॥ সমরেশ বসু । ১০·০০
ভুতুড়ে দুপুর ॥ তপন বন্দ্যোপাধ্যায় । ৮·০০
চেনাশোনার বাইরে ॥ অশেষ চট্টোপাধ্যায় । ১২·০০
হিরের আংটি ॥ শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় । ১০·০০
ঝিলের ধারে বাড়ি ॥ শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় । ১২·০০
ভূতের নাম আক্কুশ ॥ শৈলেন ঘোষ । ১০·০০

আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, ফোন : ৩১-৪৩৫২

আরও 'আনন্দ'-উপহার

নানারকম ছড়া

বিমল ঘোষ (মৌমাছি)-এর
মৌ মিছরি মণ্ডা ১০·০০

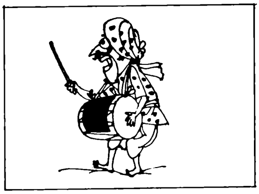

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
ছড়া যায় ছড়িয়ে ৫·০০

অন্নদাশংকর রায়ের
হৈ রে বাবুই হৈ ৮·০০

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের
মিউ-এর জন্যে ছড়ানো ছিটনো ৬·০০

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও বিমল দাশের
সাদা বাঘ ১০·০০

রমাপদ চৌধুরী ও সুধীর মৈত্রর
ভূতগুলো সব গেল কোথায় ২০·০০

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের
মিষ্টি কথায় বিষ্টিতে নয় ২০·০০

গৌরী ধর্মপাল-এর
ঘোড়া যায় ৬·০০

আদিনাথ নাগের
হিজঙ্গলের দেশে ৬·০০

অতুল্য ঘোষের
টুকটুক ও পুজোর ছুটি ৫·০০

যোগীন্দ্রনাথ সরকারের
মামার বাড়ি ৮·০০

কমলকুমার মজুমদারের
পানকৌড়ি ১০·০০

"না ! না ! না !"

এতক্ষণে এবং এতদিনে কড়া ধমক শুনলাম ইন্দ্রনাথের গলায়, "না মানে ?"

"ওখানে না ! ওখানে না ! ওখানে না !"

"ওয়াট ফু যাবেন না ?"

"না !"

"কেন যাবেন না ?"

"শেরপা থুঙ ! শেরপা থুঙ !"

"বাজে বকছেন কিন্তু !"

"অন্ধ নাকি আপনি ? দেখতে পাচ্ছেন না ? ওই দেখুন··· ওই, ওই, শেরপা থুঙ !"

সবিস্ময়ে আমি এবং আমার বন্ধুটি দু'জনেই চেয়ে ছিলাম বোসবাবুর আঙুলের নির্দেশ অনুসরণ করে। তর্জনী তুলে সাতশো ফুট লম্বা পাথরের সিঁড়ির ওপরের ধাপটিকে দেখাচ্ছিলেন। সাদা পাথরের বুকে লম্বমান কালো মূর্তিটাকে প্রথমে অতটা খেয়াল করিনি। বিশাল মঠের বিশালতায় তন্ময় হয়ে গেছিলাম বলে। এখন তাকে দেখতে পেলাম। অস্পষ্টভাবে হলেও বেশ বুঝলাম, সাদা সোপানে কালো আলখাল্লা মুড়ে দাঁড়িয়ে একজন বেঁটে মানুষ। তার মাথাতেও কালো টুপি, নেপালিদের মাথায় দেখা যায় এমনিই টুপি। দাড়ি-গোঁফের বালাই নেই। চোখে কালো চশমা। গায়ের রং ময়লা বলেই মনে হল।

সে চেয়ে আছে আমাদের দিকে। সাতশো ফুট লম্বা সাদা সোপানে আর কোনও প্রাণী নেই, শুধু সে। নড়ছে না একটুও, হাওয়ায় উড়ে-উড়ে যাচ্ছে কালো আলখাল্লার কোণগুলো।

হঠাৎ সে হাত দুটো টেনে আনল আলখাল্লার তলা থেকে। ডান হাতটা আকাশের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বাঁ হাতটা ভাঁজ করে টেনে আনল পেছন দিকে।

খুব মৃদু একটা আওয়াজ শুনলাম, ফট্ !

সঙ্গে-সঙ্গে বুঝলাম, গুলতি ছুঁড়ল কালো মূর্তি। নদীর বুকের ওপর দিয়ে আমাদের নৌকোর দিকে ধেয়ে আসতে-আসতে গুলতি-নিক্ষিপ্ত বস্তুটা আচমকা ফুলে-ফেঁপে উঠে ভাসতে লাগল শূন্যে। হাওয়ার ধাক্কায় উড়ে এল আমাদের দিকেই। একটা বিকটাকায় দানো-মুখ !

"আঁ··· আঁ··· আঁ !" অজ্ঞান হয়ে গেলেন বোসবাবু।

বিরক্তমুখে পকেট থেকে রিভলভার বের করে এক গুলিতেই ভাসমান দানো-মুখকে ফুটিফাটা করে দিয়ে বললে ইন্দ্রনাথ, "হাইড্রোজেন-ভর্তি বেলুন। কিন্তু শেরপা থুঙ গেল কোথায় ?" তাকে আর দেখা গেল না সিঁড়ির ওপর।

চার হাজার দ্বীপের গোলকধাঁধায়

বোসবাবু জ্ঞান ফিরে পেয়েছেন বটে, কিন্তু আর তো তাঁকে রোখা যাচ্ছে না। পাগলের মতো ছটফট করছেন, চোখ গুলি-গুলি করে দশ দিকে তাকাচ্ছেন। যেন শেরপা থুঙ ভূত-প্রেতদের পাঠিয়ে দেবেন যে-কোনও দিক থেকে।

আরও দক্ষিণে চলে এসেছি আমরা এই নৌকোয় চেপে। মোটরবোট বলেই এত তাড়াতাড়ি আসা গেল। তাও রাশিয়ার উপহার। জল তোলপাড় করে ছুটছে জলকন্যার মতো। বোসবাবুর উদ্বেগ আর আতঙ্ক যেন মোটরবোটকেও পেয়ে বসেছে।

মেকং নদী এখানে পাঁচ মাইল চওড়া। আশেপাশে অগুনতি পাথর মাথা উঁচিয়ে রয়েছে জলের ভেতর থেকে। এ দেশে আসবার আগে লাওস সম্বন্ধে একটা বই পড়ে নিয়েছিলাম। তাতে পড়েছিলাম একটা কবিতা— 'চার হাজার দ্বীপের গোলকধাঁধায় ঘুরে মরি হায় রে···।'

এই সেই চার হাজার দ্বীপের গোলকধাঁধা। জলে ডোবা পাথরগুলোর দৌরাত্ম্যে স্রোত দুর্বার হয়ে উঠেছে। ভয়ঙ্কর বেগে এঁকেবেঁকে অজস্র চোরাঘূর্ণি ছুটে চলেছে খ্যাপা ঘোড়ার মতো। মোটরবোট বলেই রক্ষে, নইলে স্রোতের টানে তলিয়ে যেতে হত কোনকালে।

কাম্পুচিয়ান বর্ডারের কাছাকাছি এসে গেছি আমরা। নদীর পাড়ে একটা কংক্রিটের মঞ্চ দেখতে পাচ্ছি। বেশ কিছু ট্যুরিস্ট সেখানে দাঁড়িয়ে দূরবিন চোখে কী যেন দেখছে।

বোসবাবুও দেখেছিলেন তাদের। দেখার সঙ্গে-সঙ্গে হঠাৎ একদম স্থির হয়ে গেলেন। চকচক করে উঠল দুই চোখ। বললেন নিজের মনেই, "ঠিক দিকেই যাচ্ছি। ওরাও দেখতে পেয়েছে।"

নরম গলায় বললে ইন্দ্রনাথ, "আপনি তো জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই খালি বলছেন, আরও আগে··· আরও আগে। খোনেফাফেঙ জলপ্রপাতের কাছে।"

"এসে গেছে খোনেফাফেঙ। ডান দিকে দেখুন না মশাই, অন্ধ নাকি !"

হাওয়া উলটো দিকে বইছিল বলে এতক্ষণ জলের গজরানি কানে ভেসে আসেনি। বোসবাবুর নাচানাচি নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম বলে সেদিকে খেয়ালও করিনি। এখন দেখলাম।

ভাষায় বর্ণনা করতে পারব না সেই দৃশ্যকে। ডান দিকে বেশ খানিকটা দূরে উঁচু-উঁচু পাথর আর পাহাড়ের মাথা টপকে টানা লম্বা লাফ মেরে ছিটকে আসছে সাত-সাতটা জলের ধারা। জলপ্রপাত অনেক দেখেছি, কিন্তু এরকম জলপ্রপাত তো কখনও দেখিনি। সপ্তপ্রপাতের এ-হেন মূর্তি স্বচক্ষে না দেখলে তো বিশ্বাসও করতে পারতাম না।

জলের টান সেদিকে বিপজ্জনক। পাক খেতে-খেতে ফুলে-ফুঁসে লক্ষ ফণা নাচিয়ে ধেয়ে চলেছে। ফেনা আর জলবাষ্পের মেঘে এর বেশি আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। আবছা কুহেলির আড়ালে মনে হচ্ছে যেন আরও বিস্ময়, আরও চমক লুকিয়ে রয়েছে যুগ-যুগ ধরে।

আপন মনে বলে চলেছেন বোসবাবু, "এইবার··· এইবার দেখতে পাচ্ছি স্পষ্ট।"

"কাদের দেখতে পাচ্ছেন, বোসবাবু ?" কোমল কণ্ঠে প্রশ্ন করল ইন্দ্রনাথ।

"দূরবিন দিয়েও ওরা যা দেখতে পাচ্ছে না, আমি তা দেখতে পাচ্ছি আমার মনের চোখ দিয়ে, ···মানিখোট ! মানিখোট !"

"মানিখোট ! কী বস্তু ?"

"একটা গাছ।"

"গাছ ?"

"ম্যাজিক-গাছ। দেখতে আহামরি কিছু নয়, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, প্যাকাটির মতো হাড় বের করা। পাতার বালাই নেই বললেই চলে। ওই তো, ওই তো ঝুলছে ফল, একটাই ফল।"

"ফল !"

"ম্যাজিক-মানিখোটের ফল। যে ফল খেলে বাঁদরও মানুষ হয়ে যায়। মানুষ খেলে কী হবে ? হাঃ হাঃ হাঃ ! ওই ফল এবার খাব আমি।"

"খাবেন··· খাবেন··· ? কিন্তু পান্না-বুদ্ধরা···"

"আছে, আছে। ম্যাজিক-মানিখোটের গোড়ায় একটা গর্ত, তার মধ্যে শোয়ানো রয়েছে রাশিরাশি পান্না-বুদ্ধ। দেখেছি, এবার দেখেছি তোমাদের। শেরপা থুঙকে এবার দেখিয়েছি কলা। জয়বাবা পান্না-বুদ্ধ !"

"মৃগাঙ্ক, ধর, ওঁকে..."
কাকে ধরব ? ইন্দ্রনাথের চিৎকার শুনে আমি খানিকটা হাওয়া খামচে ধরেছিলাম। বোসবাবু বানরের মতো বিরাট লম্ফ দিয়ে মোটরবোটের রেলিং টপকে গিয়ে পড়লেন পাকসাট খাওয়া জলের মধ্যে। দেখতে দেখতে ফেনা আর জলকণা-বাষ্পের মধ্যে হারিয়ে গেলেন।

পান্না-বুদ্ধর রহস্য

লোকটাকে যে এত ভালবেসে ফেলেছিলাম, তা যদি আগে বুঝতাম, তা হলে এত দুর্ব্যবহার করতাম না। অনেক মুখঝামটা দিয়েছি, অনেক কড়া কথা বলেছি, কে জানত মরীচিকার পেছনে ছুটে এইভাবে তিনি প্রাণটা খোয়াবেন ?
বোসবাবুর প্রাণহীন দেহটাও পাওয়া যাচ্ছে না। কোন্ চোরাপাহাড়ের খাঁজে আটকে রয়েছে, অতৃপ্ত আত্মা হয়তো এখনও পান্না-বুদ্ধদের স্বপ্ন দেখে চলেছে...।
খুবই মুষড়ে পড়েছিলাম এবং দেশে ফেরার জন্য বায়নাও ধরেছিলাম। কিন্তু বেঁকে বসেছিল ইন্দ্রনাথ। ওর নাকি এখনও কী কাজ বাকি আছে।
শেষকালে রেগেমেগে বলেছিলাম, "কিসের কাজ ? কার কাজ ? যিনি তোকে কাজে লাগিয়েছিলেন, তিনি তো সরে পড়লেন।"
"তুই কি বোসবাবুর কথা বলছিস ?"
"তবে কি কুইন ভিক্টোরিয়ার কথা বলছি ?"
"খুব রেগেছিস দেখছি। এখনও বুঝলি না কেন এসেছি এদেশে ?"
"এসেছিস তো পান্না-বুদ্ধদের উদ্ধারে।"
"উদ্ধারও করেছি।"
"অ্যাঁ !"
"অত লাফাসনি মৃগ, বারান্দার রেলিং নিচু, তিরিশ ফুট নীচে আছড়ে পড়লে..."
"ইন্দ্র ! ইন্দ্র ! পান্না-বুদ্ধদের ছায়াও দেখিনি আমি !"
"আমিও দেখিনি।"
"তবে যে বললি..."
"উদ্ধার করেছি তাঁদের। লুকনো জায়গা থেকে দলে-দলে বেরিয়ে এসেছেন তাঁরা !"
"ইন্দ্র ! আমার মাথা ঘুরছে, আর হেঁয়ালি সইতে পারছি না।"
"বন্ধু মৃগাঙ্ক, তুমি এখন রয়েছ কোথায় ?"
"হোটেলে।"
"হোটেলটা কোন শহরে ?"
"ভিয়েনতিয়ানে শহরে।"
"কিলোমিটার সিক্স এখান থেকে কি বেশি দূরে ?"
"কিলোমিটার সিক্স !"
"ছোটখাটো ক্যালিফোর্নিয়া শহর রে, আমেরিকানদের তৈরি। এখন ফেলে পালিয়েছে। এই তো সেদিন দেখে এলি।"
"তা দেখেছি। কিন্তু কিলোমিটার সিক্সে যাবি কেন ?"
পান্না-বুদ্ধরা সেখানে এসে উঠেছেন বলে।"
"ইন্দ্র ! ইন্দ্র ! আবার আমার মাথা ঘুরছে !"
"খবরদার ! অজ্ঞান হয়ে যাসনি। পান্না-বুদ্ধদের দেখতে হবে না ? ওই যে এসে গেছে গাড়ি।"
রেলিং-এ কনুই রেখে ঝুঁকে পড়ল ইন্দ্রনাথ। তিন তলার বারান্দা থেকে দেখলাম, হোটেলের ফটক পেরিয়ে কাঁকর বিছনো পথ মাড়িয়ে একটা ভীষণ দামি বিদেশী গাড়ি ঢুকল এবং ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল পোর্টিকোয় ঢুকে। দরজা খোলা এবং বন্ধ হওয়ার শব্দও শুনলাম। কিন্তু আরোহীকে দেখতে পেলাম না।
ইন্দ্রনাথ ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে রহস্যময় হাসি হেসে, "হে বন্ধু, এইবার দেখতে পাবে এই অ্যাডভেঞ্চারের সব থেকে রোমাঞ্চকর নায়ককে।" বলেই কাচের দরজা ঠেলে ঢুকে গেল লাউঞ্জে।
এখন যেসব ঘরকে কেতাদুরস্ত ভাষায় বলা হয় লাউঞ্জ, আগে তার নাম ছিল 'পারলার', ইংরেজি ভাষায়। আমরা বাঙালিরা সোজাসুজি যাকে বলি বৈঠকখানা, আসলে তাই। আমাদের এই লাউঞ্জখানা এমনই ঝকমকে কায়দায় সাজানো যে সেখানে দাঁড়িয়ে কেউ ভাবতেও পারবে না, এই হোটেলেই বোমা পড়েছিল মাত্র আট বছর আগে।
কাচের দরজার এপারে দাঁড়িয়ে আমি উৎকণ্ঠায় কাঠ হয়ে রয়েছি পা থেকে মাথা পর্যন্ত। ওপারে, অর্থাৎ ঘরের মধ্যে ইন্দ্রনাথ। পুরু কার্পেট মাড়িয়ে কোঁচা দুলিয়ে ওদিককার দরজার সামনে যেই পৌঁছেছে, অমনি দরজা গেল খুলে।
হাসিমুখে ঘরে ঢুকল একজন বেঁটে পুরুষ। তার পরনে কালো আলখাল্লা। মাথায় নেপালি টুপি। চোখে কালো চশমা!
শেরপা থুঙ ! এই মূর্তিকেই তো দেখেছিলাম ওয়াট ফু বৌদ্ধমঠের পাথরের সিঁড়িতে। বাচ্চাছেলের মতো গুলতি ছুঁড়ে ফানুস-দানো ছুঁড়ে দিয়ে পিলে চমকে দিয়েছিল বোসবাবু বেচারির !
শেরপা থুঙ ! এরই ভয়ে কাঁটা হয়ে থেকেছেন বোসবাবু। হিল্লি-দিল্লি পালিয়ে বেড়িয়েছেন। অপঘাতে মারা গেলেন শেষকালে।
শেরপা থুঙ ! পাজির পাঝাড়া শেরপা থুঙ ! কিন্তু ইন্দ্রনাথ ওর সঙ্গে অত হেসে-হেসে করমর্দন করছে কেন ? আবার হাত তুলে দেখাচ্ছে আমাকে !
মাথা ঝাঁ-ঝাঁ করছিল বলেই কাচের পাল্লা ঠেলে ঢুকতে পারিনি। তবে আমার টলায়মান অবস্থা দেখেই ছুটে এল ইন্দ্রনাথ। এক ঝটকায় পাল্লা খুলে আমাকে ভেতরে টেনে নিয়ে শুধু বললে স্নেহাক্ত গলায়, "বোকা।"
হাত বাড়িয়ে শেরপা থুঙ আমার মুঠো খামচে ধরে বললে খাঁটি ইংরেজিতে, "এতটা চমকে দিতে চাইনি, মিঃ রয়। দায়ী আপনার এই বন্ধু। উনিই বললেন একটা নাটক করা যাক। থ্রিলার-লেখক বন্ধুটাকে থ্রিল দিতে হবে শেষকালে। ভেরি সরি, ভেরি সরি..."
"বা-বা-বাট, হু আর ইউ ?" নাটকের ক্লাইম্যাক্সে এতটা কুপোকাত হব, ভাবতেই পারিনি।
"আই অ্যাম শেরপা থুঙ।"
"শেরপা থুঙ ! ভিলেন শেরপা থুঙ !"
এইবার অট্টহাসি হাসল ইন্দ্রনাথ। ওর সেই বিখ্যাত অট্টহাসি। দু'হাতে আমাকে আর শেরপা থুঙকে জড়িয়ে ধরে লম্বা ডিভানে বসতে-বসতে বললে, "তোর পিলে চমকে দেওয়ার জন্য আমিও ক্ষমা চাইছি। হ্যাঁ, ইনিই শেরপা থুঙ। এল·পি·আর·পি· মহলে ইনি এই নামেই বিখ্যাত। তবে ভিলেন হিসেবে নন, হিরো হিসেবে।"
মুচকি হেসে বললে শেরপা থুঙ, "রং চড়াবেন না, মিঃ রুদ্র।"
রঙের তাস আপনি, জ্যান্ত টেক্কা। মৃগাঙ্ক, ওরকম বোকার মতন তাকালে তোকে বিচ্ছিরি লাগে।"
ঢোক গিলে বললাম, "এল·পি·আর·পি· মানে ?"
"লাও পিপলস্ রিভোলিউশনারি পার্টি।"
"অ !"
"মৃগ, আদি কথা এবার খোলসা করা যাক। বোসবাবু যা কিছু

বলেছেন, সবই ঠিক। কিছু-কিছু বেঠিক কথা আছে, যা তিনি মনে-মনে কল্পনা করে নিয়েছেন এবং সত্যি বলেই ধরে নিয়েছেন। হ্যাঁ, ওঁর মামার বাড়ি ছিল শ্যামদেশে। ওঁর মা সত্যিকারের রাজকুমারী। দাদামশাই দেদার পান্না-বুদ্ধ সংগ্রহ করেছিলেন এবং সব ক'টাই লুকিয়ে রেখেছিলেন শ্যামদেশের বাইরে, এই লাওসে। কোথায়-কোথায় লুকনো আছে, তাও বোসবাবুর মা জানতেন এবং ঠিকানাগুলো বলে গিয়েছিলেন বোসবাবুর বাবাকে। বাবার মুখে সব শুনেছিলেন বোসবাবু। কিন্তু শেলশক্ খেয়ে সব ভুলে গিয়েছিলেন, শুধু কলসির মাঠের কথা ছাড়া।"

"শেলশক্ ?"

"বর্মায় যখন বোমা পড়ে, তখন ওঁর বাবা মারা যান। অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল বোসবাবুকে। লোকে বলে মাথা বিগড়ে গিয়েছিল তখন থেকেই। কিন্তু দূরের জিনিস চোখে দেখার ক্ষমতাটাও অর্জন করেন মাথায় চোট পাওয়ার পর থেকে।"

"সে কী !"

"মৃগ, বোসবাবু একটা চলমান বিস্ময়। মামাবাড়ির পান্না-বুদ্ধদের ঠিকানা ভুলে মেরে দিলেও তাই নিয়ে মুখ ফসকে কথা বলে ফেলতেন। দার্জিলিং থাকার সময়ে যাঁর কাছে বলেছিলেন, তিনিই এই শেরপা থুঙ। দেশের কাজে গিয়েছিলেন সেখানে। বোসবাবুর রকমসকম দেখে ওঁর সন্দেহ হয়, ওঁকে নিয়ে লাওস ঘুরলে হয়তো পান্না-বুদ্ধদের খুঁজে পাওয়া যাবে। অত টাকার জিনিস পেলে দেশের সম্পদ বাড়বে, এই আশায় ওঁকে নিয়ে আসেন এখানে। কিন্তু ব্যাঙ্কক থেকেই নিপাত্তা হয়ে যান বোসবাবু। সেই থেকেই উনি ওঁকে খুঁজছিলেন। কলকাতায় এসে আমাকে যেদিন ভার দিয়েছিলেন বোসবাবুকে খুঁজে বের করার, ঠিক সেইদিন বোসবাবু নিজেই এলেন আমার কাছে। একেই বলে কাকতালীয়, যা লাখে একবার ঘটে কি না সন্দেহ।"

দম বন্ধ করে শুনছিলাম। এবার বললাম, "সারা পৃথিবীতে এত জায়গা থাকতে শেরপা থুঙ কলকাতায় তোর কাছে এলেন কেন ?"

"কারণ উনি খবর পেয়েছিলেন বোসবাবু এখন কলকাতায়। তাই ছুটে এসেছিলেন নিজেই। বোসবাবুর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন সিনেমা মার্কা করোটি দেখলেই লোকে শনাক্ত করে ফেলতে পারবে এই আশায় কাগজে-টিভিতে-রেডিওতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার ভারও দিতেন আমাকে। কিন্তু তার আর দরকার হল না। বোসবাবু নিজেই হেঁটে ঢুকেছিলেন আমার ঘরে। উনি আসার ঠিক আগেই। তাই কথা বলতে বলতে ভূত দেখার মতো আঁতকে উঠে পালিয়েছিলেন বোসবাবু। ওঁর মনে শেরপা থুঙ-এর ছবিই ভেসে উঠেছিল।"

"বোসবাবু তা হলে বুজরুক নন ?"

"একেবারেই নন ! শুধু যা মাথার স্ক্রুগুলো ঢিলে হয়ে গেছে। বোমাফাটার সাঙ্ঘাতিক আওয়াজে। তাই ওঁকে বারবার বোমা ফাটার আওয়াজ শোনানো হয়েছে, যাতে পালটা শক্ খেয়ে স্মৃতিশক্তি সব ফিরে আসে।"

"খুলে বল, ইন্দ্র, খুলে বল।"

"মৃগ, ওঁর মাকড়সা-ভীতি আছে ছেলেবেলা থেকেই। তাই ওঁকে মাকড়সার ভয় দেখিয়ে ধাতস্থ করতে চেয়েছিলেন শেরপা থুঙ, যদিও ওঁর এই ভয় দেখানো ট্রিটমেন্টের বিরোধী আমি। কিন্তু উনি মনে করেন, বিষে বিষক্ষয় নীতি মানসিক রোগেও কাজ দেয়।"

"আলবত দেয়," বলে উঠলেন শেরপা থুঙ।

"ঠিক আছে, ঠিক আছে। তাই বলে বর্জিয়ার মতো ধেড়ে মাকড়সাকে ঘরে ঢুকিয়ে বোসবাবুর আত্মারাম খাঁচাছাড়া করে দেওয়ার মানে হয় না।"

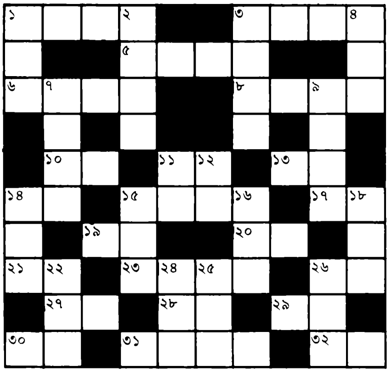

সংকেত পাশাপাশি : (১) মরুভূমির সবুজ। (৩) নবরত্নের অন্যতম। (৫) খামখেয়ালি সম্রাট। (৬) বিজ্ঞানের একটি শাখা। (৮) পদাতিক সৈন্য। জাহাজের খালাসি। (১০) '— ভাবে আমি দেব, পথ ভাবে আমি'। (১১) 'কে দেখেছে কে দেখেছে — দেখেছে'। (১৩) যে-রাজধানী খোলা নয়। (১৪) যা শোধ না-করা অন্যায়, অনুচিত। (১৫) দাদু। (১৭) পৃথিবী। (১৯) স্বাদযুক্ত। (২০) শূন্য, খালি। (২১) এই ব্যবহারই তো কাম্য। (২৩) যার কথায় এটা নেই সে অরসিক। (২৬) চালের ভগ্নাংশ। (২৭) আট গণদেবতা। (২৮) '—গণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে'। (২৯) 'চিরস্থির কবে — হায় রে জীবননদে ?' (৩০) প্রতিজ্ঞা। (৩১) একসঙ্গে কাজ করে যারা। (৩২) কোকিল।

উপর-নীচ (১) নূপুর। (২) 'শ্রীকান্ত'র এক বিখ্যাত দাদা। (৩) অন্যের বদলে যে সই করে। (৪) একসময় রাজপুতানার গর্ব ছিল। (৭) নির্বিশেষ। (৯) সোঁদাল ফুল বা গাছ। (১১) দান করে যে। (১২) মূল্য। (১৪) বৃষ। (১৫) পেতে বসি বা শুই। (১৬) এতে বিষাদ এলে সব আনন্দই মাটি। (১৮) প্রমাণ। (২২) গলন। (২৪) সম্ভ্রম প্রদর্শন। (২৫) সোনা। (২৬) মাটি খোঁড়ার অস্ত্র।

গত সংখ্যার সমাধান

ম	হা	কা	শ	যা	ন		পা	লা	ম
জ	ট	লা		যা			না		হা
লি			ধ্রু	ব		আ	মা	জ	ন
স	ন্তা	ন		র	গ	ড়		ন	দী
		ল	ব			স্ব		ক	
	মা		হ			র	শি		
পা	কা		মা	লি	কা		খা	স্বা	জ
ক	ল	তা	ন		লি	চু			ল
শা		লু			স্প		বা	তা	স
লা	জু	ক		স	ং	বা	দ	প	ত্র

রঞ্জন

“ওরকম দামি মাকড়সাটাকে আপনিই বা গুলি করে উড়িয়ে দিলেন কী হিসেবে ?”

“কী আশ্চর্য ! যমদূতকে গুলি করব না তো কি রাবড়ি খাওয়াব ?”

“আরে মশাই, ওর ঠ্যাং-এ সুতো বাঁধা ছিল । যথাসময়ে টেনে বের করে নিতাম । কিন্তু এমন গুলি করলেন…”

“লাশটা টেনে নিয়ে গেছেন ?”

“অগত্যা,” ঘাড় নাচিয়ে বললেন শেরপা থুঙ ।

শুনছিলাম আর মনের মধ্যে লিস্ট তৈরি করছিলাম পরের পর ঘটে যাওয়া রহস্যগুলোর । দুই মক্কেল নিস্তব্ধ হতেই ছুঁড়ে দিলাম প্রশ্নগুলো ? ফটাফট জবাব দিয়ে গেল ইন্দ্রনাথ ।

আমি: মাছের পুকুরে বোমা ফাটল কি আপনা হতেই ?

ইন্দ্রনাথ: না। ইলেকট্রিক ডিটোনেটর দিয়ে ফাটানো হয়েছিল দূর থেকে । শেরপা থুঙ ছায়ার মতো ছিলেন আমাদের সঙ্গে । ওঁর লোকজন কলকাঠি নেড়ে গেছে আগে থেকেই ।

আমি সোনা-চড়ায় জালার মধ্যে অত মাকড়সা এল কীভাবে ?

ইন্দ্রনাথ : রেখে দেওয়া হয়েছিল আগে থেকেই । বোসবাবু মনের মধ্যে ঠিক ছবিই দেখেছিলেন, বিশেষ ওই জালার মধ্যে লুকনো ছিল সাতটা পান্না-বুদ্ধ । চড়ায় আমরা পৌঁছনোর আগেই তন্নতন্ন করে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল জালাটা । সোনা খুঁজছিল যে ছেলে আর মেয়েটি, ওরা শেরপা থুঙ-এর চর ।

আমি বটে ! বটে কিন্তু কলসির মাঠে দো-বোমা ফাটল কেন ?

ইন্দ্রনাথ মাঠ জুড়ে তখন তল্লাসি চলছে প্রতিটি কলসির মধ্যে । বোসবাবু যাতে বাগড়া দিতে না পারেন, তাই ভয় দেখানো হয়েছিল দো-বোমা ফাটিয়ে । কিন্তু তা সত্ত্বেও উনি মনের টানে ফের গেলেন রাতে । তখন হাইড্রোজেন গ্যাসভর্তি বেলুন ওড়ানো হয়েছে শূন্যে । তাতে ফসফরাস রং দিয়ে আঁকা ছিল দানো-মূর্তি । নীচ থেকে আলো ফেলায় তা অত ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছিল । বিকট হাসি হেসেছেন শেরপা থুঙ নিজে ।

আমি বিটকেল বুদ্ধির আধার উনি । ওয়াট ফু মঠে গুলতি ছুঁড়ে দানো ভাসানোর প্রয়োজন ছিল কি ?

ইন্দ্রনাথ ওখানে বোসবাবুর নামবার আর দরকার ছিল না । ব্যাঙ্ককের আসল পান্না-বুদ্ধকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল মঠের পাতালঘরে । তাই গুলতি করে হাইড্রোজেন ক্যাপসুল ছুঁড়েছিলেন উনি । বেলুন ফুলে উঠতেই…

আমি তুই বিরক্ত হয়ে গুলি করেছিলি । ওইভাবে বোসবাবুকে অজ্ঞান করাটা ঠিক হয়নি । ম্যাজিক-গাছের তলায় নাকি পান্না-বুদ্ধ আছে, বোসবাবুর এই কথাও কি সত্যি ?

ইন্দ্রনাথ নির্জলা সত্যি । বিষে বিষক্ষয় ঘটেছিল নিশ্চয় । আঘাতের পর আঘাতে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল ওঁর মনের ছবি । ম্যাজিক-গাছের ফল সম্পর্কে গল্পটা লাওসের কিংবদন্তি । ইচ্ছে করলেও কেউ ও দ্বীপে যেতে পারে না । তাই বোসবাবুর দাদামশাই বারোটা পান্না-বুদ্ধ পুঁতে রেখেছিলেন গাছের গোড়ায় ।

আমি মাই গড ! সাপের বিছানায় শোয়া বুদ্ধর তলাতেও কি পাওয়া গেছে পান্না-বুদ্ধ ?

ইন্দ্রনাথ নিশ্চয় । মোট কুড়িটা ।

আমি পাইথনের মাথা উড়ে গেল কার বুলেটে ? তোর, না, শেরপা থুঙের ?

ইন্দ্রনাথ তিনটের দুটো বুলেট আমার, একটা শেরপা থুঙের ।

আমি কোথায় আছেন তাঁরা ?

ইন্দ্রনাথ পান্না-বুদ্ধরা তো ? সেখানে তোকে নিয়ে যেতেই এসেছেন শেরপা থুঙ । চলুন…

উঠে দাঁড়ালেন শেরপা থুঙ, “হ্যাঁ চলুন ।”

শেরপা থুঙ-এর শেষ কৌশল

ক্যালিফোর্নিয়া শহর জীবনে দেখিনি । তবে হ্যাঁ, কিলোমিটার সিক্স শহর দেখে মাথা ঘুরে গেল । এশিয়ার বুকে আমেরিকান ঐশ্বর্য আর ঐতিহ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে সেখানকার পথেঘাটে, মাঠে-বাড়িতে । তাক লেগে যায় ।

সব ফেলে রেখেই দেশে ফিরেছে আমেরিকানরা । এখন তাকে কাজে লাগিয়েছে এল·পি·আর·পি· । সদর ঘাঁটি সেখানেই, সশস্ত্র রক্ষী মোতায়েন পথের মোড়ে-মোড়ে, বাড়িতে-বাড়িতে ।

পরিত্যক্ত একটা হাই স্কুল জিমনাশিয়ামের সামনে এসে দাঁড়াল আমাদের ঝলমলে গাড়ি ।

শেরপা থুঙের খাতির দেখলাম বটে সেখানে । গাড়িতে বসেই কালো আলখাল্লা আর মাথার টুপি খুলে ফেলেছিলেন । গাড়ি থেকে নেমে এলেন খাঁটি বিলিতি পোশাকে ।

তারপর শেষ ম্যাজিক দেখালেন রহস্যময় এই ভদ্রলোক ।

কত গলিঘুঁজি পেরিয়ে যে সেখানে পৌঁছেছিলাম, তা বলা সম্ভব নয় । ঘুরতে-ঘুরতে যখন মাথা ঘুরছে, তখন আমরা থমকে দাঁড়ালাম একটা সোনালি দরজার সামনে ।

বিশাল পাল্লা । দু'মানুষ সমান উঁচু । দু'পাশে অটোমেটিক রাইফেল নিয়ে দাঁড়িয়ে রক্ষী ।

পকেট থেকে চাবি বের করে তালার ফুটোয় লাগালেন শেরপা থুঙ । মোচড় মেরে পাল্লায় আলতো চাপ দিতেই ফাঁক হয়ে গেল এক ইঞ্চির মতো ।

ফাঁক দিয়ে ঠিকরে এল নীলাভ আলোর ছটা । অপূর্ব সেই নীলদ্যুতির বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয় । চোখ ধাঁধায় না, চোখ জুড়িয়ে যায় । ঘরের মধ্যে নীল আলো জ্বলছে ঠিকই, কিন্তু এ-শুধু বৈদ্যুতিক দ্যুতি নয়… এর সঙ্গে মিশে রয়েছে পান্নার আভা । মুহ্যমানের মতো চেয়েছিলাম এক ইঞ্চি ফাঁক দিয়ে ঠিকরে আসা আলোর ঢেউ-এর দিকে । পেছন থেকে আলতো ঠেলা মেরে মৃদু কোমল স্বরে বললেন শেরপা থুঙ, “ভেতরে যান ।”

যেন স্বপ্নের ঘোরে ঢুকলাম নীলাভ দ্যুতির মধ্যে দিয়ে । দরজা বন্ধ হয়ে গেল পেছনে । আমি দেখলাম তাঁদের ।

বড় ঘর । কড়িকাঠ থেকে ঝুলছে নীলাভ ঝাড়বাতি । ঘরের তিন দিকে গ্যালারি । তিনটে তাক । প্রতিটি তাকে সারিসারি পান্না-বুদ্ধ । রকমারি তাঁদের সাইজ । হরেকরকম তাঁদের ভঙ্গি । কিন্তু প্রতিটিই অনন্য, অপূর্ব, শিল্পীর অসামান্য ক্ষমতার নিদর্শন ।

আমি বিহ্বল চোখে যখন দেখছি এঁদের, এই পান্না-বুদ্ধদের, এমন সময়ে কে যেন হাত রাখল আমার কাঁধে । বললে ফিসফিস করে, “আমি ভাল হয়ে গেছি মৃগাঙ্কবাবু ।”

চেনা গলা । তাই বিদ্যুৎবেগে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলাম ।

ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের হাতে গড়া দৈত্যর মতো ঘাড় কাত করে হা-হা হেসে বলেছিলেন তিনি, “আরে ! আরে ! চোখ কপালে তুলছেন কেন ? আমি ভূত নই, ভূত নই, জ্যান্ত বোসবাবু । মরিনি মেকং-এর জলে । শেরপা থুঙ-এর চরগুলো এত ওস্তাদ আগে যদি জানতাম । যাচ্চলে !”

তারপর আর কিছু মনে নেই ! (সমাপ্ত)

ছবি : বিমল দাস

রোভার্সের রয়
কারমোডিস ক্যাভেলিয়ার্সের সঙ্গে ফিরতি খেলার ব্যাপারে রয় সিদ্ধান্ত নিয়েছে !
একটি দুস্থ ফুটবল ক্লাবকে সাহায্য করতে রোভার্স শক্তিশালী কারমোডিস ক্যাভেলিয়ার্স দলের সঙ্গে একদিনের ক্রিকেট খেলছিল। প্রথম খেলায় রোভার্স লড়েও হেরে গিয়েছে। রয় এখন পরাজয়ের মূল্য খতিয়ে দেখছে…
কণ্টার হাড় ভাঙা জীবনে অনেক দেখেছি, রয়, কিন্তু চার্লি কার্টারের জখম গুরুতর মরসুম শুরু হওয়ার আগে সারতে পারে না !
মারভিন ওয়ালেসও সময়ে সেরে উঠবে কি না সন্দেহজনক, যদিও ওর হাত ভেঙেছে…
ব্যস, সিদ্ধান্ত পাকা ! রোভার্স আর ক্রিকেট খেলবে না ! অন্তত ক্যাভেলিয়ার্সের বিরুদ্ধে নয়। ফিরতি খেলার জন্য পেশাদার খেলোয়াড় জোগাড় করব !
রয় যখন বাড়ি ফিরছে…
ছেলেরা দুঃখ পাবে, কিন্তু আর জখমের ঝুঁকি নিতে পারব না ! দু'জন প্রধান খেলোয়াড়কে এর মধ্যেই হারিয়েছি…
STER
ঘরে, পেনি তখন পরিবারের নতুন সদস্যকে চান করাচ্ছিল…
জখমের খবর খারাপ, তাই না, রয় ?
সেই ভয়ই পাচ্ছি, পেনি ! তবে ঠিক সময়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি…
…ওই ক্রিকেট-নেকড়েদের মুখে আমি আর আমার ছেলেদের ঠেলে দিচ্ছি না ! দিলে আমাদের প্রথম বিভাগে ফিরে আসার উৎসবটা শোক হয়ে যাবে। তাই না রে, ডায়ানা ?
তখন…
বাবা ! সেই বাজে ফাস্ট বোলারটা, যে মারভিনকে জখম করেছিল !
র‍্যালফ মিকার !
র‍্যালফ, শোনা যাচ্ছে আপনার সঙ্গে রোভার্সের একটা… ইয়ে…গোলমাল হয়েছে !
যদি বলতে চান হার ওদের অপছন্দ তবে কথাটা ঠিক…

…যেমন ওদের বলেছি আধুনিক ক্রিকেট অত্যন্ত শক্ত খেলা ! সুশিক্ষিত ফুটবল খেলোয়াড়ের পক্ষেও খেলাটা অত্যন্ত দ্রুত…
…বিশেষ করে মেলচেস্টার রোভার্সের পক্ষে ! হে ! হে !
লোকটার আস্পর্ধা শোনো !
ও বলতে চাইছে রোভার্স অপদার্থ…
দু'একদিন পরে, রয় যখন ফুটবল নিয়ে লেখা তার শেষ বইগুলিতে সই দিচ্ছিল…
রয়, এই অপমানের পরে মিকারকে ছেড়ে দিতে পারবে না !
রোভার্সকে আর একটা সুযোগ দাও !
ঠিক কথা !
আচ্ছা, আমি…
রয়ের টেলিফোন বেজেই যাচ্ছে !
রয়, ওর কথা ওকে গিলিয়ে ছাড়ো ! রোভার্স ঠিক পারবে !
শোনো… !
ব্ল্যাকি গ্রে আর ডানকান ম্যাককে যখন এল…
আচ্ছা, তাই হবে । চার্লি আর মারভিনকে বাদ দিয়ে ফিরতি খেলায় রোভার্সের একই দল খেলবে !
হুররেএএ !
তবে এবার আমরা তৈরি থাকব…কাল সকালে সবাই 'ঘাম-ঝরানো ঘরে' আসবে !
সবাইকে খবর দেব, রয়…
'ঘাম-ঝরানো ঘর' এক বিশেষ প্রশিক্ষণের জায়গা…
ভাবছি, রয় বিশেষ কী ব্যবস্থা করেছে ?
বলাই বাহুল্য, সাবিক অনুশীলন । ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং…
কিন্তু রোভার্স যখন হাজির হল…
সবাই ভিতরে গিয়ে পোশাক বদলে নাও ! ক্রিকেটের সরঞ্জাম লাগবে না !
সে কী ?
ফুটবলের পরিচিত সরঞ্জাম দেখে সবাই অবাক হয়ে গেল…
জায়গাটা সাজানো হয়েছে ফুটবল প্রশিক্ষণের জন্য !
এক আন্তর্জাতিক ক্রিকেট-দলকে হারাতে সাহায্য করতে ? রয় পাগল হয়েছে ?
(ক্রমশ)
পরের সংখ্যায় : এমন প্রশিক্ষণ আগে কেউ দ্যাখেনি

জীবাণুর সাহায্যে কয়লার গন্ধকমুক্তি

শৌর্যেন্দ্রনাথ সরকার

বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন আধুনিক সভ্যতার একটি মাপকাঠি। কয়লাই আবার সেই শক্তির অন্যতম প্রধান উৎস। কিন্তু কয়লামাত্রই কি ব্যবহারের উপযোগী ? বোধ হয় না। আমাদের দেশে এবং সারা বিশ্বে গন্ধকযুক্ত প্রচুর পরিমাণে যে কয়লা রয়েছে, তা কিন্তু ব্যবহারের উপযোগী নয়। কারণ, কোনও কয়লার মধ্যে শতকরা এক ভাগের বেশি গন্ধক থাকলে তা মান-নির্ধারণ সংস্থার বিবেচনায় ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। আমাদের দেশে গন্ধকযুক্ত কয়লার প্রচুর খনি আছে অসম ও জম্মুতে। ভাল ও উচ্চ মানের কয়লার অর্থই হল গন্ধকমুক্ত কয়লা।

কয়লায় গন্ধক থাকে দুটি আলাদা চেহারায়। লোহা ও গন্ধক মিলে একটি যৌগ 'পাইরাইট্স' নামের একটি খনিজ পদার্থ ছাড়াও গন্ধক জৈবভাবে কয়লার সঙ্গে মিশে থাকে। যেভাবে থাক, কয়লা পোড়াবার সময় এই গন্ধক বাতাসকে দূষিত করে। বিষাক্ত সালফার-ডাই-অক্সাইড গ্যাস এই দূষণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি আবার অ্যাসিড-বৃষ্টিরও কারণ হতে পারে।

কলকাতার বসু বিজ্ঞান মন্দির এবং ধানবাদের ইন্ডিয়ান স্কুল অব মাইনস যুগ্মভাবে গত বারো বছর ধরে এককোষী জীবাণুর সাহায্যে কয়লাকে গন্ধকমুক্ত করার এক পদ্ধতি উদ্ভাবনের চেষ্টা চালিয়ে সফল হয়েছেন।

এককোষী এই জীবাণুর নাম 'থায়োব্যাসিলাস ফেরোঅক্সিডেন্স'। 'থায়ো' কথার অর্থ গন্ধক বা সালফার, আর 'ব্যাসিলাস' কথার অর্থ ছোট-ছোট দণ্ড। এসব জীবাণুর দেহের আকৃতি হল লম্বা। আবার 'ফেরো' কথার অর্থ লোহা, আর 'অক্সিডেন্স' কথার অর্থ জারণ ক্রিয়া। এককথায় বলা যায়, লোহা ও গন্ধককে যেসব জীবাণু জারিত করতে পারে এরা হল সেই সব জীবাণু। খালি চোখে এসব জীবাণুকে দেখা যায় না। কারণ, আকৃতিতে এরা এক সেন্টিমিটারের দশ হাজার ভাগের এক ভাগ। এদের প্রধান খাদ্য গন্ধক এবং লোহা, যা থেকে এরা এদের প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছুই তৈরি করে নিতে পারে। কয়লা শোধন ছাড়াও তামা, ইউরেনিয়াম ইত্যাদি ধাতু নিষ্কাশনের কাজেও এই জীবাণুকে ব্যবহারের চেষ্টা চলছে সারা পৃথিবীতে।

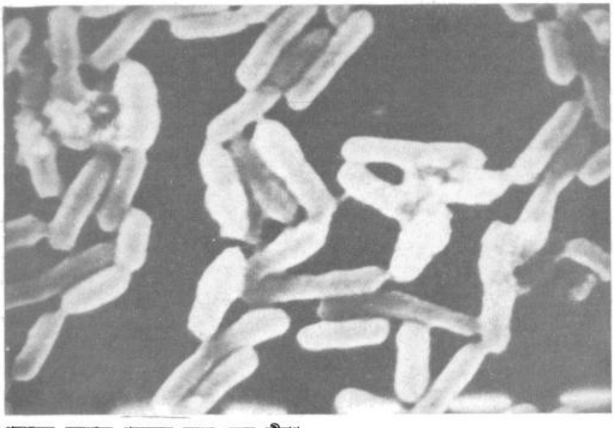

গন্ধকযুক্ত কয়লাকে গন্ধকমুক্ত করছে যেসব জীবাণু

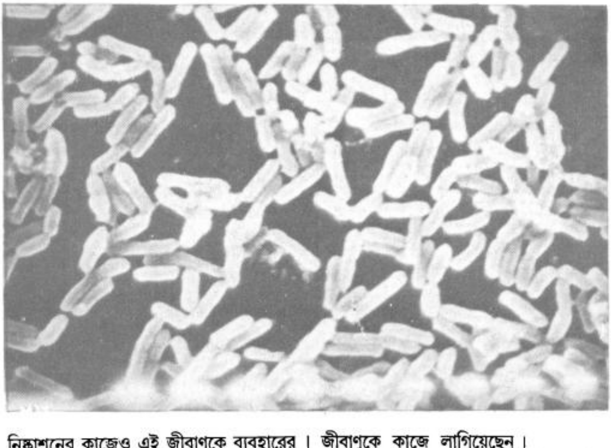

রাসায়নিক কিছু পদ্ধতিতে কয়লা থেকে গন্ধক তাড়াবার চেষ্টা হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। কিন্তু কোনও পদ্ধতিই ব্যবসায়িক দিক থেকে সফল হয়নি। বিজ্ঞানীরা আবার বিভিন্ন রকম জীবাণুকে মানুষের নানা কাজে ব্যবহার করে চলেছেন। গন্ধকযুক্ত কয়লাকেও গন্ধকমুক্ত করবার জন্য তাঁরা জীবাণুকে কাজে লাগিয়েছেন।

কোল ইন্ডিয়ার অন্তর্গত সেন্ট্রাল মাইন প্ল্যানিং অ্যান্ড ডিজাইন ইনস্টিটিউট ১৯৭৬ সালে চার বছরের জন্য এই প্রকল্পে আর্থিক অনুদান দিয়েছিল। এর পর থেকে বসু বিজ্ঞান মন্দির এবং ভারত সরকারের বিভিন্ন সংস্থা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীদের অর্থ দিচ্ছে, যদিও প্রয়োজনের তুলনায় কম।

প্রকল্পটির প্রধান উপদেষ্টা জীবাণুবিজ্ঞানী অধ্যাপক অজিতকুমার মিশ্র। তাঁর ছাত্র ডঃ প্রদোষ রায় প্রকল্পটি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন। বসু বিজ্ঞান মন্দির এবং ইন্ডিয়ান স্কুল অব মাইনস-এর কয়েকজন বিজ্ঞানীও এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত আছেন।

বিশেষ ধরনের এই জীবাণু কয়লার গন্ধক বা তার যৌগকে এমনভাবে পরিবর্তিত করতে পারে, যা সহজেই জলে দ্রবীভূত হয়ে কয়লা থেকে আলাদা হয়ে আসে। এই প্রক্রিয়ায় কয়লা শুধুমাত্র গন্ধকমুক্তই হবে না, কয়লার ছাইয়ের পরিমাণও কমবে। কারণ, লোহা যা গন্ধকের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত আছে, তা দ্রবীভূত হওয়ার জন্য রূপান্তরিত হয়ে যাবে। কয়লাতে ছাইয়ের পরিমাণ কমে যাওয়ার ফলে কয়লার গুণগত মানও বেড়ে যাবে।

এই পদ্ধতিকে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কাজে লাগানোর একটা বাধা আছে। জীবাণুর বংশবৃদ্ধি হয় ধীর গতিতে। জীবের বৈশিষ্ট্য নির্দিষ্ট থাকে যেখানে, অর্থাৎ ক্রোমোজোম-এর মধ্যে, সেখানে বিজ্ঞানীদের মতে বিশেষ এই জীবাণুকে এমনভাবে পরিবর্তন করা সম্ভব যার ফলে এই জীবাণুর বংশ বৃদ্ধি অনেক দ্রুত হবে এবং একে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কয়লা শোধন এবং ধাতু নিষ্কাশনের কাজে লাগানো যাবে।

আমরা যেমন ভাত খাই এবং তা জারিত হয়ে গ্লুকোজ হিসেবে আমাদের শরীরে যেমন শক্তি জোগায় ঠিক তেমনই এই জীবাণুর খাদ্য হল লোহা ও গন্ধক। এদের জারিত করেই এই জীবাণুরা বেঁচে থাকার শক্তি পায়। এরা সরাসরি বাতাসের কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে নিজেদের বংশবৃদ্ধি করে। অন্য কোনও খাবার এদের প্রয়োজন হয় না। এই প্রক্রিয়ায় জীবাণুমিশ্রিত যে জলীয় দ্রবণ নিষ্কাশিত হয় তাতে প্রচুর পরিমাণে দ্রবীভূত লোহা আর অ্যাসিড থাকার জন্য অন্য কোনও জীবাণু সেখানে বাঁচতে পারে না। আবার এই পদ্ধতি জীবাণুজনিত কোনও সমস্যার (প্যাথোজেনিক প্রবলেম) সৃষ্টি করে মানুষেরও ক্ষতি করবে না। যেহেতু এই প্রক্রিয়ার মধ্যেই থায়োব্যাসিলাস জীবাণু বংশবৃদ্ধি করে, তাই একবার কাজ শুরু হয়ে যাওয়ার পর নতুন করে আর গবেষণাগারে এই জীবাণুর বংশবৃদ্ধি করানোর প্রয়োজন হবে না।

গবেষণাগারে কয়লা, লোহা ও গন্ধকের বিশেষ লবণকে (ফেরাস সালফেট) জলে মিশিয়ে তার মধ্যে সামান্য পরিমাণে অ্যামোনিয়াম সালফেট মিশিয়ে ঘরের তাপমাত্রায় বিজ্ঞানীরা রেখে দেন। এক্ষেত্রে নাড়াবার ব্যবস্থা রাখা হয় (রোটারি সেকার)। উদ্দেশ্য, জীবাণুর প্রয়োজনীয় অক্সিজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইডের জোগান দেওয়া। এর ফলে জীবাণুরা দিব্যি বেঁচে থেকে বংশবৃদ্ধি করবে। এভাবেই কিছু সময়ের পর গন্ধকযুক্ত কয়লা গন্ধকমুক্ত কয়লায় পরিণত হবে।

বিজ্ঞানীদের গবেষণার ফসল এখন গবেষণাগারের চৌকাঠ পেরিয়ে পাইলট প্লান্ট স্তরে পৌঁছেছে। কিন্তু মুশকিলটা অন্য জায়গায়। বড় আকারে কাজ করতে যে প্রচুর পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, এখনও তার খুবই অভাব। জীবাণুর বিশেষ এই ধর্মকে আরও উন্নত করার জন্য আধুনিক পর্যায়ের গবেষণার প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীদের অভিজ্ঞতা যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে তাঁদের চিন্তাভাবনা ব্যাপকভাবে বাস্তবে রূপ পাচ্ছে না। আশা করা যাক, তাঁদের প্রচেষ্টায় নতুন যুগের সূচনা হবে।

কে প্রথম

অতলান্তিকের ওপারে বেতারসঙ্কেত

অতলান্তিকের এপার থেকে ওপারে প্রথম বেতারসঙ্কেত প্রেরণ সম্ভব করেন ইতালীয় উদ্ভাবক গুগলিএলমো মার্কনি, ১৯০১ সালের ১২ ডিসেম্বর। মার্কনির বয়েস তখন ২৭ বছর। ইংল্যান্ডে কর্নওয়ালের পলডুতে তাঁর একটি ট্রান্সমিটার ছিল এবং ১৯০১ সালের প্রথম দিকে ম্যাসাচুসেট্স-এর কেপ কড-এ তিনি আর-একটি বেতারকেন্দ্র তৈরি করতে শুরু করেন। প্রচেষ্টা শুরু হওয়ার মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে এক বিধ্বংসী ঝড়ে কেপ কড-এর খুঁটিগুলি ভেঙে যায়। নির্ভীক মার্কনি কেপ কড ছেড়ে সমস্ত প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নিয়ে ৬ ডিসেম্বর নিউফাউন্ডল্যান্ডের সেন্ট জনস-এ গিয়ে পৌঁছলেন। এরিয়েল ঝোলাবার জন্য খুঁটির বদলে এবার তিনি বেলুন ব্যবহার করলেন। কিন্তু বেতারকেন্দ্র স্থাপিত হলে আর-একটি ঝড় এসে বেলুন উড়িয়ে নিয়ে গেল। তবু হার না মেনে ৬০০ ফুট এরিয়েলের তার ঝুলিয়ে ঝোড়ো বাতাসে একটি ঘুড়ি উড়িয়ে দিলেন মার্কনি। এবার শান্তভাবে কোকো পান করতে-করতে ইংল্যান্ড থেকে বেতারসঙ্কেত আসবার অপেক্ষায় বসে রইলেন। দুপুর ১২-৩০ মিনিটে সেই সঙ্কেত এসে গেল…তিনটি তীক্ষ্ণ টিক-টিক ধ্বনি, মর্সের 'এস' অক্ষর। অতলান্তিকের এপার থেকে ওপার পর্যন্ত ২১৭০ মাইল দীর্ঘ এক অদৃশ্য সেতু নির্মাণ করলেন ইতালীয় উদ্ভাবক মার্কনি।

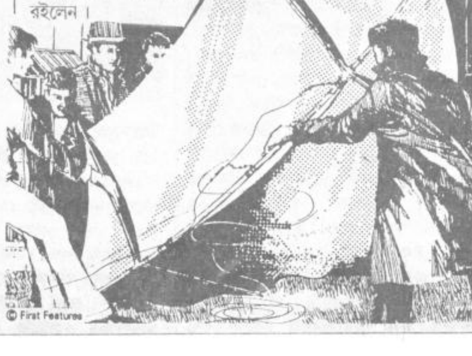
© First Features

স্লিম ! ট্রেন আসছে···জলদি ! ফিউজ জ্বালাও, নইলে ট্রেনটা পাথরে ধাক্কা খাবে···
বাঁ ও ! সর্বনাশ !···ট্র্যাকের ওপর পেল্লায় একটা পাথরের চাঁই !
ফুস্‌স্‌স্
বুউউউম্
জোর বেঁচে গেছে, বুঝলে ! শেষ মুহূর্তে ডিনামাইট ফেটেছে ! আর দু' সেকেন্ড দেরি হলেই ট্রেনটা উড়ে যেত !
সর্বনাশ, জেম ! আমাদের যন্ত্রপাতি আর বাড়তি ডিনামাইটের কাঠি যে-ট্রলিতে রয়েছে সেটা আধ মাইল দূরে ট্র্যাকের ওপর ছিল···ওটা উড়ে গেছে !
কুট্টুস, আজকের দিনটা আমাদের কাছে নির্ঘাত পয়া···
ডিনামাইট
ডিনামাইট
বুউউউম্

আমেরিকায় টিনটিন

সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড !···সাঙ্ঘাতিক !
কী মারাত্মক দুর্ঘটনা ! ড্রাইভার নিশ্চয় টুকরো টুকরো হয়ে গেছে !
এই জেম ! শুধু এটাই পড়ে আছে ! ভয়ানক ব্যাপার !
যাচ্ছেতাই ব্যাপার !
ভয়ানক !
এই !
এই !
?
?
এই !
আমার কুকুরটা কোথায় ?
তোমার কুকুর ? বলতে পারছি না, বাছা । কিছুই দেখতে পাইনি···
মাফ করবেন, সার । আমার গাড়িটা কোথায় বলতে পারেন ?
খুঁজে দেখতেই হবে । কুট্টুস নিশ্চয় হাওয়া হয়ে যায়নি··· যেতেই পারে না···
আমি এর মধ্যেই সব খুঁজে দেখেছি···
কুট্টুস ! যাক, পেয়েছি ! ভেবেছিলাম এবার তোকে সত্যিই চিরকালের মতো হারিয়েছি···
টিনটিন, আমি জানি কয়লার গামলার নীচে তোর সময়টা আরামে কাটেনি···
এই, তুমি কি চলে যাবার মতলব করছ নাকি ? এভাবে পালানো চলবে না···
দুঃখিত, আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে··· জরুরি কাজ···এক বিপজ্জনক অপরাধীর পিছনে ছুটছি···

এনিড ব্লাইটন অবলম্বনে **পঞ্চরত্ন** সোনার তরী মূল কাহিনী : ক্লদ ভয়লার লেখা : সার্জ রোজেনজাইগ আঁকা : বার্নার্ড দুফোসে

এনিড ব্লাইটন অবলম্বনে **পঞ্চরত্ন** সোনার তরী মূল কাহিনী : ক্লদ ভয়লার লেখা : সার্জ রোজেনজাইগ আঁকা : বার্নার্ড দুফোসে

ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে আছে অনেক মন্দির। এইসব মন্দিরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কত শিল্পীর কল্পনা, কত স্থপতির বিস্ময়কর স্থাপত্যের নিদর্শন। এক অঞ্চলের মন্দিরের গঠনশৈলী অন্য অঞ্চল থেকে আলাদা। এবারে কয়েকটি মন্দিরের ছবি দেওয়া হল। ছবি দেখে বলতে হবে কোনটি কোন মন্দিরের ছবি।

ক...

খ...

গ।...

ঘ...

ঙ...

চ...

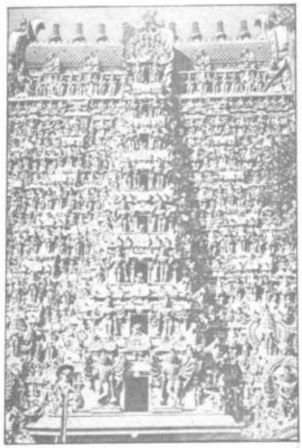

ছ...

গত সংখ্যায় ছিল কয়েকটি পাখির ছবি। (ক) আটলান্টিক পাফিন। (খ) ডোডো। (গ) হামিংবার্ড। (ঘ) ধনেশ। (ঙ) তুষার-চড়াই। (চ) পাহাড়ি ময়না।

রত্নাকর

কুইজ

নিল ও' ব্রায়েন

বিড়ালের কথা

মানুষ যখন থেকে কুকুর পুষতে শুরু করেছিল, তার পরেও কয়েক হাজার বছর বিড়াল মানুষের স্নেহদৃষ্টি পায়নি। প্রাগৈতিহাসিক ছবিতে কিংবা গুহাচিত্রে গৃহপালিত বিড়ালকে আমরা দেখতে পাই না। মিশরীয় ছবিতে প্রথম যে বিড়াল দেখা যায়, তাও খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ২০০০ অব্দের আগে নয়। প্রায় চার হাজার বছর আগে মিশরীয়রা আফ্রিকার একটি বুনো বিড়ালকে পোষ মানিয়েছিল। বিড়ালের মাথাঅলা দেবী হলেন বাস্ট। আবার তখন বিড়ালকে দেবদেবীর মতো ভক্তি করা হত। এইসব বিড়াল খামার থেকে ইঁদুরদের খেয়ে ফেলে শস্য রক্ষা করত। বিড়াল এমনই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, মিশরে দুর্ভিক্ষ ও রোগ-ব্যাধির বিরুদ্ধে বিড়ালকে বেশ শক্তিমান গণ্য করা হত। বিড়াল মারলে, এমনকী আকস্মিকভাবেও কেউ যদি হঠাৎ বিড়ালের প্রাণহানির কারণ হত, তা হলে তার শাস্তি ছিল মৃত্যু।
মিশরীয় বিড়াল বাইরে চালান করাও অবৈধ বলে গণ্য হত। তা সত্ত্বেও, খ্রিস্টপূর্ব ৯০০ অব্দে ইউরোপের সমস্ত অংশে চোরাচালানের মাধ্যমে বিড়াল ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে স্থানীয় বনবেড়ালের সংস্পর্শে এসে দু' ধরনের বেড়ালের সৃষ্টি হয়। একটা হল, ছোট লোমঅলা বিড়াল, যাদের দেখা যেত ইংল্যান্ডে; আর অন্য জাতের বেড়ালটির নাক চ্যাপটা।
চতুর্দশ শতকে বিড়াল খুব খাতির পেয়েছিল। সেইসময় সারা ইউরোপে প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, মধ্যযুগে ডাইনিদের হত্যার সময় বিড়ালদেরও নৃশংসভাবে মেরে ফেলা হত। ভাসমান জাহাজের ক্যাপ্টেনরা বিড়ালকে সৌভাগ্যের প্রতীক বলে মনে করতেন। 'মে ফ্লাওয়ার' জাহাজে তো কর্মীদের সঙ্গী হয়েছিল একটি বিড়াল। মার্কিন উপনিবেশিকদের কাছে আমদানি-করা বিড়াল ছিল খুবই মূল্যবান। তারা বিড়াল পুষত, আবার ইঁদুরের উৎপাত বন্ধ করার জন্যও বিড়ালকে কাজে লাগাত।

এখনও অনেক বিড়াল মূলত ইঁদুর ধ্বংসকারী হিসেবেই বেঁচে আছে। তবে আধুনিক বিড়ালের প্রাথমিক ভূমিকাটা হল, মানুষের ভাল সঙ্গী হিসেবেই তাকে গ্রহণ করা হয়।
নানা জাতের বিড়াল থাকলেও তাদের গঠন প্রায় এক। তবে গায়ের লোম ও চোখের রং আলাদা। পুরুষ-বিড়ালের ওজন ৯ পাউন্ড থেকে ১৪ পাউন্ড, লম্বায় তারা গড়ে ২৮ ইঞ্চি। স্ত্রী-বিড়ালের ওজন ৬ থেকে ১০ পাউন্ড। তারা লম্বায় গড়ে ২০ ইঞ্চি। বিড়ালের গড় আয়ু ১৪ থেকে ১৭ বছর। তবে ইংল্যান্ডের একটি পোষা বিড়াল ৩৪ বছর বেঁচে ছিল।
বিড়ালের দৃষ্টিশক্তি খুবই প্রখর। বিশেষ করে রাত্রে। এটাই তার বড় শক্তি। তা ছাড়াও বিড়ালের শ্রবণশক্তিও খুব ভাল। ↩

কুইজ

প্রশ্ন

(১) গ্রেগ চ্যাপেলের ক্রিকেট-জীবনের প্রথম ও শেষ টেস্টে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা কী ? **অমিতকুমার গুপ্ত,** গরিফা ।

(২) মাদাগাস্কারের রাজধানীর নাম কী ? **অনিমেষ রায়,** বসিরহাট হাইস্কুল ।
(৩) 'জগত্তারিণী' স্বর্ণপদক' কার নামে দেওয়া হয় ? **কৌশিক দাস,** এ ভি বি হাই স্কুল, দুর্গাপুর ।
(৪) কারটোগ্রাফি কী ? **অভিজিৎ দাশ,** কল-১০ ।
(৫) কোন মেলাতে টুপি পরা আবশ্যক ? **অনিক রায়,** কল-৪৬ ।
(৬) নেপালের সর্বোচ্চ আইনসভার নাম কী ? **অরুণ ঘোষ,** কল-৪৬ ।
(৭) 'মত্তবিলাস প্রহসন'-এর রচয়িতা কে ? **কালিদাস গোস্বামী,** হিন্দু স্কুল ।
(৮) স্ট্যাচু অব লিবার্টি কোন দ্বীপে অবস্থিত ? **বরুণ মণ্ডল,** অঃ কুঃ মা জিলা স্কুল ।
(৯) পৃথিবীর পরিধি কত ? **অঙ্কুর সাহা,** মেদিনীপুর ।
(১০) পৃথিবীর ওজন কত ? **অশোক মাহাতো,** পুরুলিয়া ।
(১১) কোন ভারতীয় ক্রিকেটার ব্রাজিলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ? **বাসব ও দেবেশ সিমলান্দী,** আসানসোল ।
(১২) মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম কী ? **রঞ্জিত মণ্ডল,** কল-১৯ ।
(১৩) পরবর্তী বিশ্বকাপ ফুটবল কোথায় অনুষ্ঠিত হবে ? **রথীন্দ্রনাথ দে,** কোন্নগর ।
(১৪) 'Father of science' কাকে বলা হয় ? **জয় দত্ত,** মালদা ।
(১৫) টেলিফোন কে আবিষ্কার করেছিলেন ? **সুমিত্রা দে,** বেহালা ।
(১৬) বিশ্বের একমাত্র ক্রিকেটারের নাম কী, যাঁর টেস্ট-এ সিঙ্গল সেঞ্চুরির চেয়ে ডাবল সেঞ্চুরির সংখ্যা বেশি ? **ডোডো দাশগুপ্ত,** কল-১৪ ।
(১৭) মারুতি গাড়ির নতুন মডেলের নাম কী ? **মিতা দে,** চেতলা ।
(১৮) কপিলদেব-এর ৩০০তম

টেস্ট-শিকার কে ? **নাম নেই ।**
(১৯) কোন বিশ্ববিখ্যাত চিত্র পরিচালক 'মানিকদা' নামেও পরিচিত ? **অমল সরকার,** বসিরহাট ।

(২০) রোনাল্ড রেগন-এর আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট কে ছিলেন ? **অশোক বসু,** শিলিগুড়ি ।

(২১) পুরুষদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ গ্রান্ড স্লাম বিজয়ী কে ? **শর্মিষ্ঠা বিশ্বাস,** হাওড়া-৯ ।

(উত্তর আগামী সংখ্যায়)

গত সংখ্যার উত্তর

(১) নমপেন ।
(২) মুসোলিনি ।
(৩) লিভারপুল ।
(৪) পিপলস্ কাউন্সিল ।
(৫) বিজয় অমৃতরাজের ।

সন্দীপ পাটিল

বিমল মিত্র

অমৃতা শেরগিল

(৬) তক্ষ ও পুষ্কর ।
(৭) রক্তসংক্রান্ত বিজ্ঞান ।
(৮) অমৃতা শেরগিল ।
(৯) জ্যাক হবস ।
(১০) ল্যু ওয়ালেস ।
(১১) এনিমি অব দ্য পিপ্‌ল ।
(১২) মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ।
(১৩) তাম্রের ।
(১৪) রংধনু
(১৫) সন্দীপ পাটিল ।
(১৬) অস্ট্রেলিয়া ।
(১৭) কেরলে ।
(১৮) বিমল মিত্র ।
(১৯) অমৃতকুম্ভের সন্ধানে ।
(২০) প্রোফেসর ক্যাথবার্ট ক্যালকুলাস ।
(২১) দাবা ।

কুইজ

বিষয় : ঘোড়া ও ঘোড়সওয়ার

(১) রানা প্রতাপের ঘোড়ার নাম কী ?
(২) সূর্যের রথে ক'টি ঘোড়া থাকে ?
(৩) গ্রিক পুরাণের উড়ন্ত ঘোড়ার নাম কী ?
(৪) হিন্দু পুরাণে আকাশের যমজ ঘোড়া কারা ?
(৫) গ্রিক পুরাণে একটি প্রাণীর ওপরের অংশ মানুষের, নীচের অংশ ঘোড়ার । ওই প্রাণীর নাম কী ?
(৬) হিন্দু পুরাণে ঘোড়ার মাথাঅলা সুরশিল্পী কারা ?
(৭) গ্রিক পুরাণে কে প্রথম ঘোড়ার সৃষ্টি করেন ?
(৮) বিষ্ণুর শেষ অবতার যে ঘোড়ায় চেপে আবির্ভূত হবেন সেই ঘোড়ার রং কী ?
(৯) বাইবেলে কে একটি বিবর্ণ ঘোড়ায় চেপে আসত ?
(১০) আলেকজান্ডার তাঁর 'বুসফালাস' ঘোড়াটিকে কীভাবে বশ মানিয়েছিলেন ?
(১১) বিখ্যাত এক কাল্পনিক চরিত্রের 'রজিনান্ত' নামে একটি ঘোড়া ছিল ? কে সেই চরিত্র ?
(১২) স্ক্যান্ডিনেভিয়ান পুরাণে অন্যতম প্রধান দেবতা ওদিন-এর ঘোড়ার নাম ছিল 'স্লিপনির' । এই ঘোড়ার বৈশিষ্ট্য কী ?
(১৩) শেক্সপিয়র-এর নাটকের এক চরিত্র বলেছিলেন, "A horse! A horse! My kingdom for a horse!" চরিত্রটির নাম কী ?
(১৪) ওয়াটারলুর যুদ্ধে নেপোলিয়ন যে ঘোড়ায় চড়েছিলেন তার নাম কী ?
(১৫) ট্রয়ের বিখ্যাত কাঠের ঘোড়া কে তৈরি করেছিলেন ?
(১৬) রোমের কোন সম্রাট তাঁর ঘোড়াকে পুরোহিত ও পরামর্শদাতা করেছিলেন ?
(১৭) ১০০ অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে পারলে রাজা এক দুর্লভ সম্মানের অধিকারী হবেন । কী সেই সম্মান ?
(১৮) থ্রেস-এর শয়তান ডায়োমিডিস তাঁর অতিথিদের ঘোড়ার খাদ্য হিসেবে নিক্ষেপ করতেন । কে তাকে হত্যা করেছিল ?
(১৯) কার সাদা ঘোড়ার নাম 'কন্টক' ?
(২০) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঘোড়সওয়ারের মূর্তির ঘোড়ার পা বিশেষ কী কী অর্থ বোঝায় ?

অশ্বিনীকুমারদ্বয়

মাদ্রিদে ডন কুইকজোট ও শাঙ্কো পাঞ্জা-র মূর্তি । পিছনে সারভান্তেস

সাতটি ঘোড়ার রথে সূর্য

উত্তর : (১) চৈতক ।
(২) সাতটি ঘোড়ায় টানা রথে, অথবা সাত মাথাঅলা ঘোড়ায় ।
(৩) পেগাসাস ।
(৪) অশ্বিনীকুমারদ্বয় ।
(৫) সেন্টর
(৬) কিন্নরদল ।
(৭) সমুদ্রের দেবতা পসিডন ।
(৮) কল্কি অবতার ।
(৯) মৃত্যু ।
(১০) তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, ঘোড়াটি তার ছায়াকে ভয় পায় । তাই তিনি ওর মাথা সূর্যের দিক থেকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন ।
(১১) ডন কুইকজোট ।
(১২) ওর ছিল আটটি পা, জলে-স্থলে সে চলতে পারত ।
(১৩) তৃতীয় রিচার্ড ।
(১৪) মারেঙ্গো । একটি যুদ্ধজয়ের স্মৃতি হিসেবে তিনি ওই নাম রেখেছিলেন ।
(১৫) এপিয়স ।
(১৬) ক্যালিগুলা । ঘোড়াটির নাম ছিল ইনসিটেটাস ।
(১৭) বিশ্বসম্রাটের সম্মান ।
(১৮) হারকিউলিস ।
(১৯) যুবরাজ গৌতমের । গৌতম পরে হয়েছিলেন বুদ্ধদেব ।
(২০) মাটিতে সব পা থাকলে বুঝতে হবে ঘোড়সওয়ার যুদ্ধে অক্ষত ছিলেন ; একটি পা মাটি থেকে উঠে থাকার অর্থ ঘোড়সওয়ার যুদ্ধে আহত হয়েছেন, আর সামনের দু'টি পা মাটি থেকে উঠে থাকলে বুঝতে হবে অশ্বারোহী যুদ্ধে নিহত হয়েছেন ।

উড়ন্ত চাকা

প্রথমে একটা শক্ত কাগজে কম্পাস দিয়ে ৬ সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধের একটি বৃত্ত আঁকো। তারপর একই কেন্দ্র-বিন্দু থেকে ৪·৫ সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধের আর-একটি বৃত্ত আঁকো। এবার কেন্দ্র-বিন্দুর উপর দিয়ে একটা রেখা টেনে বৃত্তটিকে সমান দু'ভাগে ভাগ করে নাও। ১নং ছবির মতো।

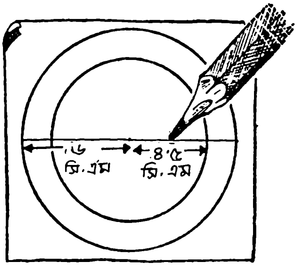

১নং ছবি

এবার লম্বালম্বি এবং কোনাকুনিভাবে ভাগ করো যাতে বৃত্তটি আটটি সমান ভাগে ভাগ হয়। প্রতিটি কোণ তখন ৪৫° হবে। ২নং ছবি দ্যাখো।

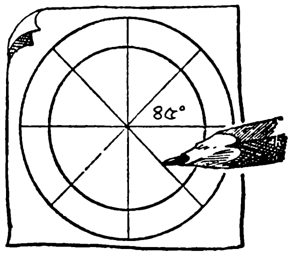

২নং ছবি

এখন কাঁচি দিয়ে বড় বৃত্তের পরিধির লাইন বরাবর সুন্দরভাবে কেটে ফ্যালো এবং ছোট বৃত্তের পরিধি এবং ব্যাসার্ধের লাইনগুলোর ছেদবিন্দু পেনসিল দিয়ে পর-পর লাইন টেনে যোগ করো। ৩নং ছবিতে যেমন দেখানো আছে।

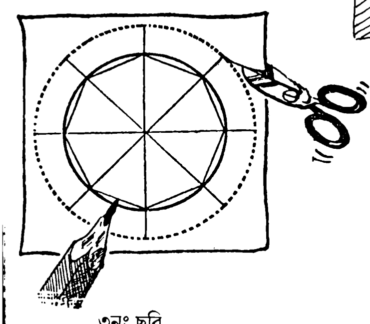

৩নং ছবি

এবার বড় বৃত্ত থেকে ভেতরের ছোট বৃত্ত পর্যন্ত যে আটটা দাগ দেওয়া লাইন আছে ৪নং ছবিটি দেখলে বুঝতে পারবে, ঠিক সেইভাবে কাঁচি দিয়ে পর-পর কেটে যাও।

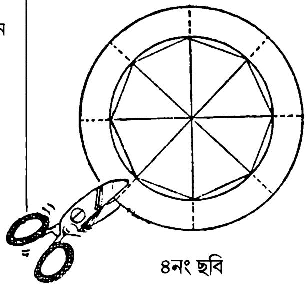

৪নং ছবি

এখন একটা উপরের দিকে এবং পরেরটা নীচের দিকে এইভাবে পর-পর ভাঁজ করে ফ্যালো। ৫নং ছবিতে তীরচিহ্ন দিয়ে দেখানো আছে।

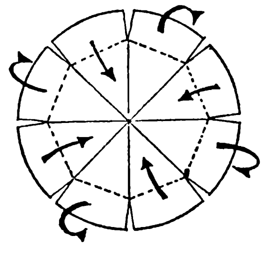

৫নং ছবি

৬নং ছবিতে যেমন দেখানো আছে ঠিক সেইভাবে দুটো আঙুলের মাঝখানে একটা ফ্ল্যাপ চেপে ধরে কবজিতে জোর দিয়ে ছুঁড়ে দাও। ব্যস, এবার দ্যাখো তোমার নিজের হাতের তৈরি উড়ন্ত চাকার কী মজা।

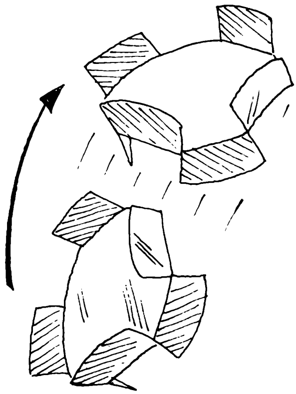

৬নং ছবি

কবির

ধাঁধা

পুজো এসে গেল। মহালয়ার দিন ভোররাত্রি থেকেই এসে গেছে পুজো-পুজো আবহাওয়া। কেন জানি না, ভোররাতে উঠে রেডিওতে মহিষাসুরমর্দিনী না-শোনা পর্যন্ত কিছুতেই পুজো এসে গেল মনে হয় না। তা সে পুজোর নতুন জামা-কাপড় হাতে এলেও মনে হয় না।
এবার অবশ্য আমাদের পাড়ায় পুজো নিয়ে আলাদারকমের হইচই। ঠিক আলাদারকম ততটা নয়, বলা ভাল, বড়রকমের হইচই। আমাদের সামনেই যে-বিশাল সরকারি আবাসন, তাদের পুজোর পঁচিশ বছর পূর্ণ হল। ফলে, মাইক চলছে তিনদিন আগে থেকে, আলো জ্বলছে সাতদিন আগে থেকে। আলোর বাহারও বেড়েছে এবার।
আলোতে অবশ্য আপত্তি করার কিছু থাকে না। কিন্তু মাইকের শব্দটা বিরক্তিকর। এ-নিয়ে কে

বলবে! ছোট্কা এখনও কোথাও যায়নি এবার। যাওয়া নিয়ে কিছু সমস্যা আছে। অফিসের জরুরি মিটিং পঞ্চমীর দিন। বিজয়ার পর দিনেও কীসব জরুরি কাজ। তাই বাড়িতে থেকেও ছোট্কা পুজোর মেজাজে নেই। নিজেই গজগজ করছিল। একে সারাদিন অফিসের ঝামেলা, তায় অষ্টপ্রহর মাইকের কান-ফাটানো শব্দ। কোথাও ঘুরে এলে শান্তি পাওয়া যেত।
এর মধ্যে দু' দিন ছোট্কা ধাঁধা দেব বলে দিতে পারেনি। আমার হয়েছে জ্বালা। কিন্তু তাগাদা না দিলে তো চলবে না। তাই তাগাদায় এসেছি। আমার কাচুমাচু মুখ দেখে বোধ হয় মায়া হয়েছে। তাই ছোট্কা বলল, "এবার আর বড় ধাঁধা মাথায় আসছে না। সহজ কিছু মৌখিক ধাঁধা জিজ্ঞেস করি বরং।" ছোট্কার সেই ধাঁধাই বলছি এবার। দ্যাখো তো, কেমন লাগে!
প্রথম ধাঁধা ॥ কোন্ প্রশ্নের উত্তরে কিছুতেই কেউ হ্যাঁ বলতে পারে না?
দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ ১০০ কে $\frac{১}{২}$ অর্ধেক দিয়ে ভাগ করলে কত হয়?
তৃতীয় ধাঁধা ॥ কোন্ শব্দটি সবাই ভুল উচ্চারণ করে?
গতবারের উত্তর ॥ (১) বাঁ দিক থেকে ডান দিকে পর-পর যেভাবে রয়েছে তাসগুলো, তা হল—হরতনের বিবি, রুহিতনের সাহেব এবং ইশকাপনের টেক্কা। শর্তের সঙ্গে এবার মিলিয়ে দ্যাখো। (২) বনফুল। (৩) অলাতচক্র। মানে—চক্রাকার আগুন।

সত্যসন্ধ

কত কথা

অক্ষর উলটে-পালটে এক শব্দকে আর-এক শব্দ বানানোর কাজটা তো ভালই রপ্ত করেছ তোমরা। এবার সেরকম আরও চারটি শব্দ দেওয়া হল। অক্ষর উলটে-পালটে এগুলোর ভোল পালটাও তো। (ক) বদল। (খ) কলস। (গ) গমন। (ঘ) মনন।

২। ব্যাকরণে সমাস পড়ে জেনেছ লাঠালাঠি, হাতাহাতি, ঘুসোঘুসি ইত্যাদি শব্দগুলি ব্যতিহার বহুব্রীহি। এরকম আর-একটি শব্দ হচ্ছে বদলাবদলি। এই শব্দটির মধ্যে

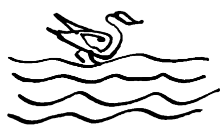

এ-ধরনের আরও দুটি শব্দ পাওয়া যাবে। সে-দুটি কী কী বলো দেখি।
৩। (ক) কোন্ শাল এত গরম যে গায়ে ছোঁয়ালেই গা পুড়ে যাবে? (খ) কোন্ নদী নামেও নদী?

উত্তর : ১। (ক) বলদ। (খ) সকল। (গ) মগন। (ঘ) নমন। ২। বলাবলি, দলাদলি। ৩। (ক) মশাল। (খ) মহানদী।

কথক

মজার খেলা

এবারের মজার খেলাটা যেমন সহজ, তেমনই সুন্দর। বলা যেতে পারে যে, পুজো-স্পেশ্যাল মজার খেলা। এর জন্য সামান্য একটু প্রস্তুতি দরকার। অনেক সাদা কাগজ নাও। ছোট-ছোট টুকরো করে ফেলো। এবার প্রত্যেকটা টুকরোর উপর বড়-বড় করে লেখো, "তোমার উত্তর আমি আগে থেকেই জানি। উত্তর হবে—৩৭।" এবার কাগজগুলোকে বিভিন্ন খামের মধ্যে একটা-একটা করে চালান করে দাও। একটা খামে যেন একটা কাগজই থাকে, খেয়াল রেখো। খামের মুখ আঠা দিয়ে সেঁটে দাও। এবার খামের তাড়া পকেটে রেখে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াও।
এবার যখনই কোনও বন্ধুর সঙ্গে দেখা হবে, তার পকেটে তোমার এই 'ভবিষ্যদ্‌বাণী' লেখা একটা খাম আগেভাগে গুঁজে দাও। তারপর বলো, "এটা রইল। পরে দেখবে কী এটা। এবার আমি যা-যা বলব, পর-পর করে যাও।"
বন্ধুকে বলো, "আমাকে না দেখিয়ে যে-কোনও একটা সংখ্যা পছন্দ করো—১ থেকে ৯ এর মধ্যে। যে-সংখ্যাটা পছন্দ হল, সেটাই তিনবার লেখো। লিখেছ? এর পর সংখ্যা তিনটেকে যোগ করো। যোগফল যা হল, সেটা দিয়ে মূল সংখ্যাটাকে, অর্থাৎ তিনবার লেখা সংখ্যাটাকে, ভাগ করো। করেছ? বেশ, এবার তোমার পকেটে গুঁজে দেওয়া খামটা বার করে দ্যাখো, এই উত্তরই আমি আগেভাগে লিখে রেখেছি।

দেখবে বন্ধু কেমন থ।
আসল কথা কি বুঝতে পারলে? উত্তর সব-সময়ই হবে ৩৭, তা বন্ধু যে-সংখ্যাই পছন্দ করুক না কেন। একটা সংখ্যা বলে দ্যাখোই না। কী বললে, ৬। বেশ ৬৬৬কে ভাগ করো ৬+৬+৬ বা ১৮ দিয়ে। দ্যাখো, ৩৭ হচ্ছে।
৮ দিয়ে দেখবে? বেশ ৮৮৮ কে ভাগ করো ৮+৮+৮ বা ২৪ দিয়ে। সেই ৩৭।
দারুণ ব্যাপার। তাই না?

মজারু

ধাঁধানো ছবি

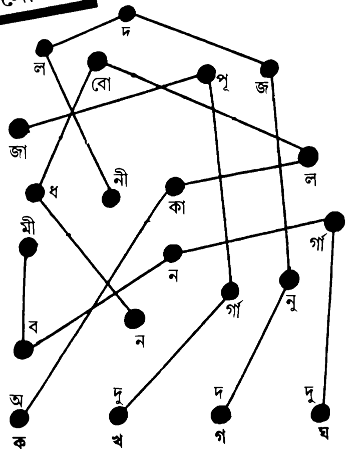

এবারের ধাঁধানো ছবি একদম অন্যরকমের। কেননা, এখন তো আকাশ একদম নীল, চারপাশে সাদা কাশ ফুটেছে, শিউলিতলায় শিশির মেখে ঝরে পড়ে আছে কত শিউলি। আর ক'দিন পরেই তো বেজে উঠবে পুজোর ঢাক। এখন চলছে দুর্গাপ্রতিমার চোখে শেষ তুলির টান। তাই দুর্গাপুজো নিয়েই এবারের ছবির মজা। ক, খ, গ, ঘ—এই চারটি কালো বৃত্ত থেকে টানা হয়েছে এলোমেলো চারটি লাইন, এই লাইনের মাঝে-মাঝে রয়েছে কালো বৃত্ত এবং বৃত্তের পাশে রয়েছে নানারকম অক্ষর। প্রত্যেকটি লাইনের অক্ষরগুলো থেকে পেয়ে যাবে এক-একটি শব্দ। এখন বলো তো কোন্ শব্দটি বেমানান।

উত্তর : ঘ।

চিত্রক

হাসিখুশি

বাবু বাড়ি ফিরল ফোলা চোখ নিয়ে।

"আবার মারামারি করেছ ? তোমাকে না বলেছিলাম রাগ হলে একশো গুনবে, তার আগে কিছু করবে না ?"

বললেন তার মা।

বাবুর উত্তর, "তা তো জানি মা, কিন্তু মিন্টুর মা যে তাকে পঞ্চাশ গুনতে বলেছিলেন।"

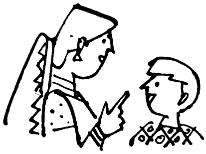

সারাদিন ধরে রাজুর বাবা মা রাজুকে 'অ' অক্ষরটি লেখাতে ব্যর্থ হয়ে হাল ছেড়ে দিলেন। রাত্রে রাজুর মা রাজুকে আদর করে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "রাজু, তুমি কিছুতেই 'অ' লিখতে শিখলে না কেন ?" রাজুর উত্তর মা আমি জানতাম যে 'অ' লেখা শেখা হয়ে গেলেই তোমরা আমাকে 'আ' লেখাতে চেষ্টা করবে।

কিসের ফোটো

গত সংখ্যায় ছিল সুতোর গুলির ফোটো

ট্যানগ্রাম

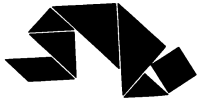

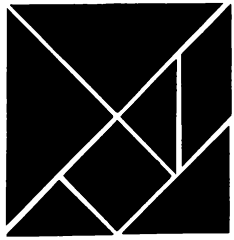

গত সংখ্যার সমাধান দেওয়া হল। আরও রইল নতুন কিছু মানুষের ভঙ্গিমা। চেষ্টা করলে ট্যানগ্রাম-এর সাতটা টুকরো দিয়ে এরকম নতুন কিছু বানাতে পারো। এবারে রইল মানুষের মুখের প্রতিকৃতি। দেখে

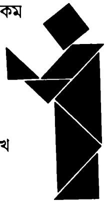

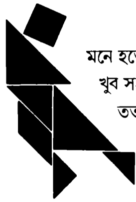

মনে হতে পারে খুব সহজ, কিন্তু ততটা সহজ নয়।

যদি পারো তা হলে চেষ্টা করে দ্যাখো, আরও

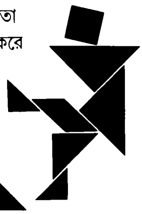

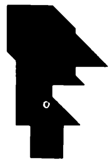

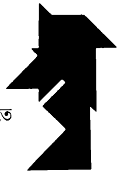

কোনও নতুন মুখ তৈরি করতে পারো কি না।

প্রবীর

আঁকিবুকি

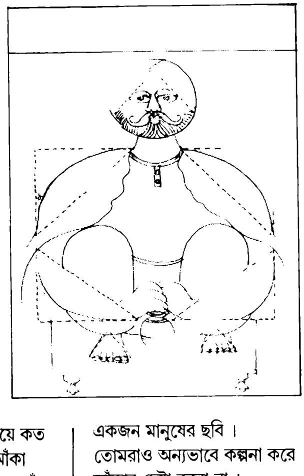

আঁকার চেষ্টা করো

বৃত্ত এবং ত্রিভুজ দিয়ে কত রকম ছবিই তো আঁকা যায়। এবারের আমাদের আঁকার পাতায় ফুটে উঠেছে বসে থাকা একজন মানুষের ছবি। তোমরাও অন্যভাবে কল্পনা করে আঁকার চেষ্টা করো না !

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

অপরূপ রূপকথা

রূপকথার ঝুড়ি
সুভাষ মুখোপাধ্যায়
ওরিয়েন্ট লংম্যান
১৫ টাকা

রূপকথা মানেই হাজার মজা। রাজা-রানি, ভূত-পেত্নি-দত্যি-দানো, সবমিলিয়ে একেবারে দারুণ কাণ্ড-কারখানা। অপার্থিব স্বপ্নের জগতে রোমাঞ্চকর ঘোরাফেরা।

এবং তার সঙ্গে যদি মেশে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সুললিত গদ্য, স্বাদু গল্প বলার ভঙ্গি, তা হলে তো কথাই নেই। চোখের পলকটুকু ফেলার পর্যন্ত সময় পাওয়া যায় না।

রূপকথার ঝুড়িতে আছে দেড় ডজন গল্প। ভারতসহ চিন, স্পেন, আফ্রিকা, ভিয়েতনাম, হাওয়াই প্রভৃতি দেশের হরেক রূপকথা। দেশ-বিদেশের প্রচলিত-অপ্রচলিত রূপকথাগুলিকে নিজস্ব ভাষায় ও ভঙ্গিতে মনোগ্রাহী করে উপহার দিয়েছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। তাঁর গল্প বলার ভঙ্গি এবং ভাষা এমনই যে, সম্পূর্ণ নতুন গল্প পড়ার স্বাদ পাওয়া যায়। চরিত্রই বা কত! রাজা, রানি, রাজকন্যা, রাজপুত্র, ভূত, দত্যি, রাক্ষস...রূপকথার পরিচিত সাবেকি চরিত্রগুলির সঙ্গে রয়েছে বাঘ, গোরু, ড্রাগন, ছারপোকা, পতঙ্গ, পাখি, গাছগাছালি থেকে একদম সাধারণ মানুষের কথা। আধুনিক কালের রূপকথাও স্থান পেয়েছে। প্রতিটি গল্পের মধ্যে লুকিয়ে আছে এক-একটি শিক্ষণীয় দিক। টানটান আকর্ষক লেখা। সাবলীল গতি। ঝরঝরে সুন্দর ভাষা। এ একেবারে নতুনতর রূপকথা। অন্য ধাঁচে লেখা। যাতে একইসঙ্গে রূপকথা, তার আধুনিক রূপ, গল্প এবং শিক্ষার স্বাদ পাওয়া যায়। পড়তে আরম্ভ করলে শেষ না হওয়া পর্যন্ত থামা যায় না। সুন্দর রঙিন প্রচ্ছদ, পাতায়-পাতায় দারুণ-দারুণ ছবি, ভাল ছাপা। এত সুন্দর প্রচ্ছদ এবং ছবিগুলি যিনি এঁকেছেন, তাঁর নাম নেই কেন? এইটুকু বাদ দিলে, রূপকথার ঝুড়ির সবকিছুই হইচই ফেলে দেওয়ার মতো। ছোটরা তো বটেই, বড়রাও এ-বই পেলে দারুণ খুশি হবেন।

অঞ্জন সিকদার

ভাল লাগা গল্প

নদীর ওপারে
আশিস সান্যাল
পূর্বা পাবলিকেশন
কলকাতা-১২
১০ টাকা।

ছোটরা আজ যতই অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় হোক না কেন, রূপকথার গল্পের প্রতিও তাদের সমান আকর্ষণ। নীল পরি, লাল পরিদের টগবগে সংলাপ এখনও শিশুদের অজানা অচেনা রহস্যের জগতে নিয়ে যায়। আশিস সান্যালের 'নদীর ওপারে' সেইরকম ছোট-ছোট ভিন্নস্বাদের আটটি গল্পের সঙ্কলন। গল্পগুলি যথার্থই ছোটদের। তরতরে ভাষা আর ঝরঝরে গদ্য। স্বচ্ছন্দ গতিতে গল্প বলেছেন লেখক। বিশ্লেষণী দক্ষতার গুণে ও বুদ্ধিদীপ্ত কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে আলোচ্য গ্রন্থের সবক'টি গল্পই

বিশিষ্ট মাত্রা পেয়েছে। 'কালোপাথর'-এ গদাই যখন ছড়াছন্দে বলে ওঠে, 'কেউ রবে না ছোট-বড়—সবাই সমান হবে, আমার এই শেষ বাসনা, পূরণ করো তবে'—ঠিক তখনই লেখক সার্থক। কিংবা 'চরণবিল'-এ যিনি ঋষিকুমারের কথা শোনান, আর 'রাজন'-এ লেখেন, 'রাজনকে দেখে সবাই খল্‌খল্ করে হেসে উঠল। তারপর ডেকে নিয়ে এল রাজনকে তাদের কাছে। সবাই মিলে ফুলে-ফুলে সাজিয়ে দিল রাজনকে।' ঠিক সেইমুহূর্তে তিনি ছোটদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় হয়ে যান। অনুপ রায়ের প্রচ্ছদ বইটির অন্যতম আকর্ষণ। আটটি গল্পের জন্য আটটি পুরো পাতা ছবি, চমৎকার পরিকল্পনা। গল্পকার হিসেবে এই গ্রন্থে নিজেকে আরও একবার প্রতিষ্ঠিত করলেন আশিসবাবু।

সমীর ঘোষ

প্রেমচন্দের গল্প

জঙ্গলের গল্প
মুন্সি প্রেমচন্দ
নবসাহিত্য প্রকাশনী
কলকাতা-৯
১২ টাকা

হিন্দি কথাসাহিত্যে প্রেমচন্দের ধ্রুপদী কীর্তিগুলি নিয়ে নতুন করে কিছু বলার থাকে না। থাকে না এই জন্য যে, মৃত্যুর পর পেরিয়ে গেছে অনেক বছর, অথচ আজও তাঁর রচনা আমাদের পুরনো মনে হয় না। গোদান, রঙ্গভূমি, কর্মভূমি, সেবাসদন ইত্যাদি বিখ্যাত উপন্যাস বা কফন, শতরঞ্জ কি খিলাড়ি, সেরা গেহুঁ, নমক কা দারোগা ইত্যাদি গল্পগুচ্ছ আজও আমাদের ভীষণভাবে সমকালীন মনে হয়।

প্রেমচন্দের বিখ্যাত গল্প-উপন্যাসগুলি সবই বড়দের জন্য লেখা। কিন্তু তিনি যে খুদে পাঠকদের জন্যও অসামান্য কিছু

গল্প রেখে গেছেন, তা তপন চক্রবর্তীর অনুবাদ এবং সম্পাদনায় প্রকাশিত 'জঙ্গলের গল্প' না পড়লে বোঝা যেত না। সেজন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে হয়। মোট ১৩টি গল্পে আমরা অন্য এক নতুন প্রেমচন্দকে আবিষ্কার করি। নির্মল আনন্দে অভিভূত হই। বাঘ, হাতি, কুমির, বনমানুষ, ভালুক, সাপ নিয়ে লেখা গল্পগুলি মজায়, খুশিতে আদ্যোপান্ত ভাসিয়ে নিয়ে যায়। অনুবাদ এবং গল্প-নির্বাচন সুন্দর। ছবিগুলিও খারাপ নয়। মানুষের প্রতি ভালবাসাই প্রেমচন্দের লেখার মূল সুর। সেই অতল ভালবাসা থেকে জীবজন্তুরাও বঞ্চিত হয়নি।

গৌতম ঘোষদস্তিদার

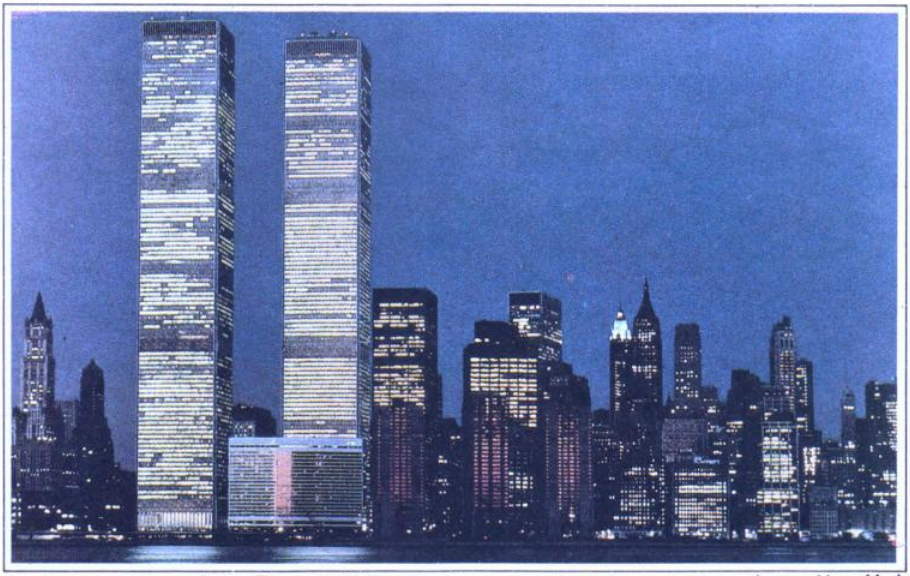

Any Bengali living here probably reads Prabasi Anandabazar every week.

New York

Prabasi Anandabazar was created exclusively
for the Bengalis living abroad.
Every week, we lead our readers to places of great interest.
We give them a complete package of news and features.
With topics ranging from politics to recipes; from
beauty-tips and fashion to literature and sport.
Thirty two pages with offset-printing clarity—
including eight pages in sparkling colour.
We sell the kind of quality that's tried and true.
We give advertisers an exclusive, affluent clientele
and a perfect environment.

Prabasi Anandabazar: The international weekly from The Ananda Bazar Group of Publications.

প্রবাসী আনন্দবাজার

ত্য নতুন ডিজাইনে
র্ষা বৈচিত্র্য।
ারো হাত শাড়ি

কঙ্কন
াউজ পিস সহ
ন্দনবালা
ক প্রিন্ট
ায়মন্ড প্লাজা
আম্রপালি
হোয়াইট রোজ
াদা পাড় ছাপা।
বিশ্বভারতী
াটিক ও বাঁধনি প্রিন্ট
ইত্যাদি

এগারো হাত শাড়ি

চিত্রলেখা ডিলাকস্
গোপী
রূপালী
সাদা পাড় ছাপা
ইত্যাদি

VARSHA PRINTS
BOMBAY

নতুন দিনের নতুন শাড়ী

Varsha

বর্ষা কটন শাড়ী

ব্লক, বাটিক, বাঁধ্‌নী এবং বাংলার তাঁত ও
সিল্ক ডিজাইনে প্রিন্ট্। সাদা পাড় ছাপা।

অন্যান্য অত্যাধুনিক ডিজাইন।
অধিকাংশ শাড়িতে আছে ম্যাচিং ব্লাউজ পিস্।

Varsha a Class Creation.

ANANDAMELA 4 OCTOBER
WB CC-264 MH-BY-SOUTH 683 TN MS(C) 731